তিন গোয়েন্দা
রকিব হাসান
ভলিউম ১৩
Banglapdf.net
কিশোর থ্রিলার
সেবা
প্রকাশনী
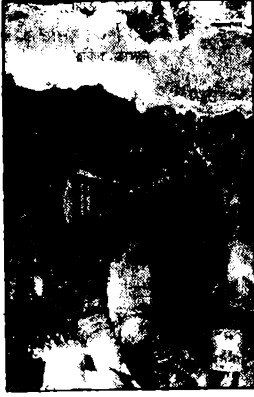
ঢাকায় তিন গোয়েন্দা

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৯১

'বেশ রহস্যজনক তো!' শোনা গেল আরিফ সাহেবের কণ্ঠ।

বাগানে বসে মামার কথাটা কানে গেল কিশোর পাশার। বাংলাদেশী শীতের আমেজ উপভোগ করছে সে। টকটকে লাল গোলাপের ওপর উড়ছে একটা মৌমাছি। তাকিয়ে ছিল সেদিকে, খাড়া হয়ে গেল কান। ঘরের ভেতর থেকে কথা আসছে।

'আমার তা মনে হয় না,' বললো আরেকটা কণ্ঠ। 'সব ওর শয়তানী।'

হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে যাচ্ছে কিশোরের। বাংলাদেশে এসেই একটা রহস্য পেয়ে যাচ্ছে না তো?

'একবার দুবার হলে না হয় ধরে নিতাম অ্যাকসিডেন্ট,' বলে যাচ্ছে কণ্ঠটা। 'কিন্তু চার-চারবার একই ঘটনা। বলছে মাল দেয়ার জন্যে কাস্টোমারের বাড়ি ঢুকেছে, বেরিয়ে এসে দেখে উইণ্ডশীল্ড ভাঙা।'

'হ্যাঁ, তাই দেখেছি,' বললো আরেকটা তরুণ কণ্ঠ। 'মিথ্যে কথা বলিনি।'

'মিথ্যে বলছিস, সেটা তো বলছি না আমি,' বললো লোকটা। 'আমি বলতে চাইছি, দোষটা তোর। কারও সাথে ঝগড়া করেছিস, এখন সে শোধ তুলছে...'

'বিশ্বাস করো, আব্বা, ওরকম কিছুই করিনি আমি!'

'ঠিক আছে,' শান্তকণ্ঠে বললো লোকটা, 'করিসনি যে প্রমাণ কর। নইলে আমার যা বলার, বলে দিয়েছি। গাড়ি চালানো তোর বন্ধ। সত্যি সত্যি কি হয়েছে, জেনে এসে বলবি, যদি দেখি তোর দোষ নেই, তাহলেই চাবি পাবি।'

'মাল দিতে অসুবিধে হবে না? সকাল সাতটার মধ্যেই তো মাখন না পেলে রেগে যায় লোকে, ডিম আর দুধের কথা নাহয় বাদই দিলাম...রাতে একবার, সকালে একবার; কবার যাবে তুমি মাল ডেলিভারি দিতে?'

'সেটা তোর ভাবনা নয়। ঠিক সময়েই মাল পাবে কাস্টোমার। তোর এখন কাজ পিকআপে মাল বোঝাই করা আর কাস্টোমারের ঘরে রেখে আসা, ব্যস। দুই বেলা গাড়ি আমিই চালাতে পারবো।'

'এনায়েত,' আবার শোনা গেল আরিফ সাহেবের কণ্ঠ, 'আমার এখনও মনে হচ্ছে, রহস্য একটা আছে এর মধ্যে।'

'তা তো আছেই, স্যার,' হেসে বললো ছেলেটার বাবা। 'আর সেটা কি আমি খুব ভালোই জানি। কারও সঙ্গে নিশ্চয় গোলমাল বাধিয়েছে কচি, সে এখন শোধ তুলছে।...আজ উঠি, স্যার।'

'বসো, টাকা নিয়ে যাও। আর হ্যাঁ, দুধ-ডিম-মাখন, তিনটেই ডবল করে দিয়ে যেও কদিন। আমার ভাগ্নে এসেছে তার বন্ধুদের নিয়ে, আমেরিকা থেকে। দেখি, বিলটা দেখি, কতো হলো?'

খানিক পরে সামনের দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল মাঝারি উচ্চতার একজন মানুষকে। গায়ের রঙ কালো। ভোঁতা নাক। খাটো করে ছাঁটা চুল। দেখেই কিশোরের মনে হলো, এই লোকটাও একসময় পুলিশে চাকরি করেছে। বাগানের পাশের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা পুরানো একটা টয়োটা পিকআপের দিকে এগিয়ে গেল। গাড়িটার গায়ে সাদা রঙে বড় বড় করে লেখা রয়েছে ঃ

এনায়েত উল্লাহ ডেয়ারি ফার্ম
আমরা সুলভ মূল্যে ডিম, মাখন, দুধ
সরবরাহ করিয়া থাকি

এনায়েত উল্লাহর পেছনে বেরোলো সতেরো-আঠারো বছরের একটা ছেলে। বাবার মতো কালো না হলেও ফর্সা নয়। গায়ে-গতরে প্রায় মুসার সমান, ভালো স্বাস্থ্য।

গাড়িতে গিয়ে উঠলো লোকটা। ড্রাইভিং সীট থেকে মুখ বের করে বললো, 'কি হলো, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ওঠ।'

গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে রইলো ছেলে। রাগ করে বললো, 'না, আমি বাসেই যেতে পারবো।'

'তোর খুশি। তবে যতো যা-ই করিস, চাবি আমি দিচ্ছি না তোকে।' আর একটিবারও ছেলেকে উঠতে সাধলো না এনায়েত উল্লাহ। স্টার্ট দিয়ে চলে গেল।

কিশোরের ওপর চোখ পড়ল ছেলেটার। হাত নেড়ে তাকে ডাকলো কিশোর। এগিয়ে এলো কচি। 'কি?'

'আপনার নাম কচি, না?'

অবাক হলো ছেলেটা। 'কি করে জানলে?'

'ঘরে আপনারা কথা বলছিলেন, সব শুনেছি।' হাত বাড়িয়ে দিলো কিশোর, 'আমি কিশোর পাশা।'

'ও, তুমিই চৌধুরী আংকেলের ভাগ্নে।' খুব আগ্রহ নিয়ে হাত মেলালো কচি। 'আর কে কে এসেছে তোমার সঙ্গে?'

'রবিন আর মুসা। আমার বন্ধু।'

এদিক ওদিক তাকালো কচি। নাম তিনটে তাকে অবাক করেছে বোঝা গেল। 'কোথায় ওরা?'

'মামার স্টাডিতে পড়ছে রবিন। মুসা হাতুড়ি-বাটাল নিয়ে খুটুর-খাটুর করছে। ঘুঘুপাখি ধরার ফাঁদ বানাচ্ছে। মামা বলেছেন মধুপুরের গড়ে নিয়ে যাবেন। ফাঁদ পেতে সেখানে ঘুঘু ধরবে সে। হাহ্ হাহ্!...তা দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।'

'আমাকে আপনি আপনি করছো কেন? কতো আর বড় হবো তোমার চেয়ে? তুমি করেই বলো। কচি ভাই-টাইয়েরও দরকার নেই। শুধু কচি।' একটা চেয়ারে বসলো সে। 'কবে এসেছো?'

'এই তো, পরশু রাতে।'

'ও। তা থাকবে তো কিছুদিন?'

'থাকবো। এসেছি যখন দেখেই যাবো বাংলাদেশটা।' একটা আঙুল মটকালো কিশোর। 'আচ্ছা, তোমার আব্বা রাগারাগি করলেন শুনলাম। কি হয়েছে?...বেশি কৌতূহল দেখাচ্ছি না তো?'

'না না!' বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো কচি। 'আর বলো না ভাই। বয়েসে হয় না, বাড়িয়ে দেখিয়ে কত কষ্টে লাইসেন্সটা বাগালাম, অথচ চালাতেই পারলাম না। দুদিন চালাতে না চালাতেই বন্ধ। সহ্য হয়?'

'হুঁ, বুঝতে পারছি তোমার দুঃখ,' সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা দোলালো কিশোর। 'কিন্তু ব্যাপারটা কি, বলতে আপত্তি আছে?'

চুপ করে রইলো কচি।

'বেশি উৎসাহ দেখাচ্ছি মনে হচ্ছে তো? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি, তাহলেই বুঝতে পারবে।' পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বের করে দিলো কিশোর।

পড়ে প্রথমে স্তব্ধ হয়ে গেল কচি। ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হলো মুখ। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে কিশোরের একটা হাত খপ করে চেপে ধরে বললো, 'তোমরা! সত্যি তোমরা এসেছ বাংলাদেশে! উফ, কি যে ভালো লাগছে! নাম শুনেই সন্দেহ হয়েছিলো! ভাগ্যটা ভালোই বলতে হবে আমার, একেবারে সময়মতো পেয়ে গেছি তোমাদের! ইস্, বিশ্বাসই করতে পারছি না...'

'ওই যে, রবিন আর মুসা আসছে,' দরজার দিকে হাত তুললো কিশোর।

ওদের কাছে আরেক দফা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলো কচি। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কথা বলতে যাচ্ছিল ওদের সঙ্গে। হেসে জানিয়ে দিলো কিশোর, ওরা দুজনে বাংলা বোঝে। বলতেও পারে মোটামুটি।

আলাপ পরিচয়ের পালা শেষ হলো।

'অদ্ভুত কাণ্ড, বুঝলে,' কচি বললো। 'গভীর রহস্য!'

'বলেই ফেলো না,' হেসে বললো কিশোর। 'কখন থেকেই তো জানতে চাইছি।'

'কতোখানি শুনেছো?'

'ঘরে বসে তোমরা বাপ-বেটায় যতোখানি ঝগড়া করেছো।'

'আমাদের গাড়ির কাঁচ, বুঝলে, পিকআপটার উইণ্ডশীল্ড,' কচি জানালো, 'কি করে জানি ভেঙে যায়! একবার না দু'বার না, চার চারবার ভাঙলো। কাস্টোমারের বাড়িতে মাল দিতে ঢুকি, বেরিয়ে এসে দেখি ভেঙে রয়েছে।'

'কি করে ভাঙে কিছুই আন্দাজ করতে পারো না?'

'নাহ্,' এপাশ ওপাশ মাথা নাড়লো কচি। 'শেষবার অবশ্য কাঁচ ভাঙার শব্দ কানে এসেছিলো। ছুটে বেরোলাম। কিন্তু গাড়ির কাছে কাউকে দেখতে পেলাম না।' এক এক করে তিন গোয়েন্দার মুখের দিকে তাকালো সে। 'খুব অবাক লেগেছে আমার। মনে হলো যেন আপনাআপনি ভেঙে গেল কাঁচটা।'

'হয় এরকম,' আনমনে বললো কিশোর। 'একে বলে কাঁচের ফ্যাটিগ। আপনাআপনি চুরমার হয়ে যায় কাঁচ। তবে সেটা একআধবার হতে পারে। একই গাড়ির বেলায় চারবার? উঁহু, সেটা সম্ভব না।'

'আমিও তাই বলি,' চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা শব্দ করে ছাড়লো কচি। 'আপনাআপনি ভাঙেনি ওই কাঁচ।'

'মনে হয় রহস্য একটা পেয়েই গেলাম,' বিড়বিড় করলো গোয়েন্দাপ্রধান।

রবিন আর মুসা চুপ করে শুনছে। কিছু বলছে না।

'গোড়া থেকে সব খুলে বলো তো,' কিশোর বললো। 'কখন, কোথায় ঘটেছে এই ঘটনা?'

নাক চুলকালো কচি। তারপর শুরু করলো, 'গুলশানের সাত নম্বর রোডের একটা বাড়ির সামনে। রাতের বেলা। পথের পাশে সব সময় যেখানে গাড়ি রাখে আব্বা, সেখানেই রেখেছিলাম। ডিম আর দুধ সাধারণত রাতে দিয়ে আসি আমরা, মাখন সকাল বেলা। অনেককে দুধও সকালেই দিই। যা-ই হোক, গত দুমাসে রাতের বেলা, সাত নম্বর রোডে কাঁচ ভেঙেছে মোট চারবার।'

'অন্য একটা প্রশ্ন করি। তুমি আর তোমার আব্বাই কি মাল সাপ্লাই দাও? কোন কর্মচারী-টর্মচারী নেই?'

'কারখানায় আছে। আমাদের ফার্মটা খুব ছোট। বেশি লোক রাখতে পারি না। ভীষণ খাটতে হয় আব্বাকে। পড়ালেখার ফাঁকে ফাঁকে আমি আর আমার ছোট ভাই যত্তোটা পারি সাহায্য করি।'

'হুঁ,' বলে চুপ করে কি ভাবতে লাগল কিশোর।

মুসার দিকে তাকালো কচি। 'আচ্ছা, তোমার না একটা কুকুর আছে, সিমবা? শুনলাম, ওকেও নিয়ে আসবে। কই?'

'আনিনি। হঠাৎ শরীর খারাপ হয়ে গেল। হাসপাতালে।'

'ওটাকে এখানে এনেও কোন লাভ হতো না,' কিশোর বললো। 'বুনো কুকুরের রক্ত শরীরে, কিছুতেই হিংস্রতা ভুলতে পারে না। কখন কার ওপর লাফিয়ে পড়ে টুঁটি ছিঁড়ে দেবে...শহরের রাস্তায় ওটাকে নিয়ে বেরোনোই মুশকিল। ওর জায়গা

আফ্রিকা, কিংবা অন্য কোন জঙ্গল-টঙ্গল...'

'তারমানে জঙ্গল ছাড়া ওকে সঙ্গে রাখে না?' হেসে জিজ্ঞেস করলো কচি।

'না রাখাই উচিত। মুসাদের বাসার কাছেই বের করেছিলো একদিন। দিলো এক ছোকরাকে কামড়ে। অনেক কষ্টে পুলিশের ঝামেলা এড়ানো গেছে।' এক মুহূর্ত চুপ থেকে আবার আগের কথা তুললো কিশোর, 'শেষ বার কবে ভাঙলো তোমাদের গাড়ির কাঁচ?'

'গত বুধবার রাতে। আর কপালটা কি দেখো, চার দিন ভাঙলো, চার দিনই আমি বেরিয়েছিলাম গাড়ি নিয়ে। ফলে আব্বাকেও কিছু বোঝাতে পারছি না।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে কচির দিকে তাকালো কিশোর। 'ওভাবে আর কোন গাড়ির উইণ্ডশীল্ড ভেঙেছে, জানো?'

'কি জানি!'

কিছু ভাবছে কিশোর, বুঝতে পেরে জিজ্ঞেস করলো রবিন, 'কেন?'

'যদি খালি কচিদেরটাই ভাঙে,' জবাব দিলো কিশোর, 'তাহলে বুঝবো ফ্রেমে দোষ আছে, কিংবা শত্রুতা করে কেউ ভাঙছে। কিন্তু আরও গাড়ির যদি ভেঙে থাকে, তাহলে নিশ্চয় অন্য কারণ।'

'তা ঠিক,' ঘাড় দোলালো মুসা।

'এই দাঁড়াও, দাঁড়াও!' হাত তুললো কচি। 'মনে পড়েছে! গুলশানে আমার এক বন্ধু আছে। আমাদেরটা ভাঙার কিছুদিন আগে ওদের গাড়ির কাঁচ ভাঙার কথা কি যেন বলেছিলো। তখন খেয়াল করিনি। এখন মনে পড়ছে। কি করে ভেঙেছিলো, বুঝতে পারছিলো না সে-ও।'

'হুঁ,' মাথা দোলালো কিশোর, 'তাহলে তো মনে হচ্ছে...'

থেমে গেল সে। দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন তার মামী। মহিলার বয়েস বোঝা যায় না। অনেক কম মনে হয়। খুব সুন্দরী। এক ছেলে আর এক মেয়ে, দুজনেই থাকে আমেরিকায়।

হাত নেড়ে হেসে বললেন তিনি, 'এই, আর কতো গল্প করবি? সেই কোন সকালে নাস্তা করেছিস। খিদে পায়নি?'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো মুসা। একান ওকান হয়ে গেল হাসি। 'পায়নি মানে, কি যে বলো তুমি, আন্টি। পেটের মধ্যে কখন থেকেই তো ছুঁচো নাচছে, শুধু ভাঙা কাঁচই এতোক্ষণ আটকে রেখেছিলো।' নানারকম বাংলাদেশী খাবার খাইয়ে দুদিনেই মুসাকে একেবারে ভক্ত বানিয়ে ছেড়েছেন মামী। ইতিমধ্যেই বহুবার বলে ফেলেছে তাঁকে মুসা, 'দুনিয়ায় শুধু দুজন মানুষ ঠিকমতো রাঁধতে জানে। একজন তুমি, আরেকজন আমাদের মেরিচাচী।'

আবার হাসলেন মহিলা। 'আয়, খেতে আয়। কচি, তুমি যাওনি তোমার আব্বার সঙ্গে?'

'না,' রাগ করে বললো রুচি। 'ওই গাড়িতে আর উঠবো না। বাসে যাবো বলে রয়ে গিয়েছিলাম,ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল...'

'ভালো হয়েছে। এসো, তুমিও এসো খেতে।'

এই পরিবারের সঙ্গে মোটামুটি ভালোই খাতির জমিয়ে ফেলেছে রুচি। মহিলার ছেলেমেয়ে এখানে কেউ নেই। এতো বড় বাড়িতে একা একা থাকেন শুধু স্বামীকে নিয়ে। ছেলেমেয়ের বয়েসী কাউকে পেলেই দ্রুত আপন করে নেন।

বিনা প্রতিবাদে উঠে দাঁড়ালো রুচি। জানে খাবো না বলে লাভ হবে না, তাকে না খাইয়ে ছাড়বেন না নাদিরা খালাম্মা।

মামী যেমন দিলখোলা, হাসিখুশি, মামা তেমনি গম্ভীর। চাকরি করতেন পুলিশে, বড় অফিসার ছিলেন, অবসর নিয়েছেন। সময় কাটানোর জন্যে সারাক্ষণই কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত থাকেন। প্রচুর বই পড়েন, বিশেষ করে গোয়েন্দা গল্প। কিশোরকে তাঁর খুব পছন্দ। সুযোগ পেলেই বলে দেন, 'দেখ ইয়াং ম্যান , চাকরিই যদি করো, তাহলে পুলিশের। এর বাড়া চাকরি নেই। আর যেহেতু তুমি গোয়েন্দা, রহস্য পছন্দ করো, পুলিশ না হয়ে আর কি হবে? কোথায় গিয়ে আর গোয়েন্দাগিরি করার এমন সুযোগ পাবে?

কথাটা তিনি ঠিকই বলেন, মেনে না নিয়ে পারে না কিশোর। গোয়ন্দাগিরি করতে হলে পুলিশ হওয়াই উচিত। আমেরিকায় অবশ্য শখের গোয়েন্দা সে হতে পারে, তবে পুলিশের চাকরিতে থেকে এই কাজ করার সুযোগ সুবিধে অনেক বেশি।

খাবার টেবিলে খেতে বসলো সবাই। মাথার কাছে বসেছেন চৌধুরী সাহেব। পুরু পুলিশী গোঁফ। চোখের দৃষ্টি এতো তীক্ষ্ণ, সরাসরি তাকাতে অস্বস্তি বোধ করে মুসা, মনে হয় ধারালো ছুরির ফলা তার মনের ভেতরে ঢুকে গিয়ে ফালাফালা করে চিরে দেখছে কিছু লুকানো রয়েছে কিনা।

রুচিকে তিন গোয়েন্দার সঙ্গে দেখে মুচকি হেসেছেন পুলিশের ভূতপূর্ব ডি আই জি। মামী প্লেটে খাবার বেড়ে দেয়াতক অপেক্ষা করলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হে গোয়েন্দারা, রহস্য পেয়ে গেছো মনে হচ্ছে?'

'মনে হয়,' জবাব দিলো কিশোর।

'কাঁচ ভাঙার রহস্য তো? আমার কাছেও কিন্তু ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে।'

'লাগছে, না? পর পর চারবার একই গাড়ির কাঁচ ভাঙলো। কাউকে গাড়ির কাছে দেখা গেল না। কি করে ভাঙলো, কিছু বোঝা গেল না। অদ্ভুত ব্যাপার!'

'আলাপটা পরেও করতে পারবি,' মুসার প্লেটে চিঙড়ির বিশাল দুটো কাটলেট তুলে দিয়ে বললেন মামী, 'আগে খেয়ে নে।'

হাসিঠাট্টার মধ্যে দিয়ে শেষ হয়ে এলো খাওয়া।

ইয়া বড় পুডিঙের অর্ধেকটাই মুসার পাতে দিয়ে দিলেন মামী। ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা পানির বোতল আনতে গেলেন।

'হ্যাঁ, কাঁচ ভাঙার কথা হচ্ছিলো,' কথাটা আবার তুললেন মামা। 'একই গাড়ির কাঁচ...'

'আলট্রাসোনিক ওয়েভস!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। 'শব্দ কাঁচ ভাঙতে পারে।'

'ঠিক!' পুডিঙের চামচ মাঝপথেই থেমে গেল মুসার। 'জেট প্লেনের শব্দে জানালার কাঁচ ভেঙে যেতে দেখেছি আমি!'

'এদেশে ওরকম প্লেন আসে না,' বললেন চৌধুরী সাহেব। গাড়ি রেখেছিলে যেখানে, তার কাছাকাছি এমন কোনো কারখানা আছে, যেটার যন্ত্রপাতি থেকে আলট্রোসোনিক ওয়েভ বেরোতে পারে?'

'না,' মাথা নাড়লো কচি।

'ভূমিকম্প নয় তো?' মুসার প্রশ্ন।

'এটা ক্যালিফোর্নিয়া নয়,' মনে করিয়ে দিলো কিশোর। 'এখানে এতো জোরে ভূমিকম্প হয় না যে গাড়ির কাঁচ ভাঙবে।'

'বাতাস?' রবিন বললো। 'ঝড়টর তো হয় এদেশেও। ঘূর্ণিঝড়?'

'নাহ্, ওসব না।'

'কোনো ধরনের রশ্মি?' মুসা বললো। 'বুঝেছি বুঝেছি, ডেথ রে!'

'স্টার ওয়ারস ছবিতে যেমন দেখায়?' কচি বললো। 'হীট রে কিংবা ফোর্স রে?'

'অসুবিধে কি? রবিন বললো। 'বাংলাদেশে কি স্পেস শিপ নামতে পারে না?'

'নিশ্চয়ই!' চামচ রেখে দিয়ে টেবিলে চাপড় মারলো মুসা। 'ভিনগ্রহ থেকে আসা!'

'অতি বুদ্ধিমান কোনো প্রাণীর কাজ বলে ভাবছো?' কচি বললো।

'কিংবা...কিংবা...' ভয়ে ভয়ে উজ্জ্বল রোদে আলোকিত জানালার দিকে তাকালো মুসা, 'ভূত-টুত!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, একেবারে জার্মান ভূত, পোলাটারগাইস্ট।' বিরক্ত হয়ে বললো কিশোর। হাত নেড়ে বললো, 'কি সব ফালতু বকবকানি শুরু করেছো! থামো!' মামার দিকে তাকিয়ে দেখলো, তাঁর সদাগম্ভীর মুখেও এখন যেন চিরস্থায়ী হাসি ফুটেছে, খুব উপভোগ করছেন তিনি। 'ভূত, স্পেস শিপ...ভিসিআর সবার মাথা খারাপ করে দিয়েছে!'

'তাহলে তোমার কি ধারণা?' কিশোরের কথার ধরন পছন্দ হলো না কচির। রবিন আর মুসার মতো কিশোরের কড়া কথার সাথে অভ্যস্ত নয় সে।

'হ্যাঁ, স্পেস শিপ না হলে কি?' রবিনের প্রশ্ন।

'আমি বলে দিয়েছি, ভূত, ব্যস,' হাত নাড়লো মুসা।

'তোমার মাথা,' কিশোর বললো। 'অবাস্তব সব কথাবার্তা। যুক্তিতে এসো।

সহজ কোনো ব্যাখ্যা আছে এই কাঁচ ভাঙার। যেটা এখনও জানি না আমরা। জানতে হলে এখন দুটো কাজ করতে হবে।'

'কী?' আগ্রহের সঙ্গে মুখ তুললো কচি।

আড়চোখে কিশোর দেখলো, মামার তীক্ষ্ণ চোখ দুটোও এখন তার ওপর নিবদ্ধ, সে চোখে কৌতূহল।

'মামা, তোমার গাড়িটা ধার দেবে?' কিশোর জিজ্ঞেস করলো। 'রাতের বেলা?'

'কেন?'

'ওটা দিয়ে ফাঁদ পাতবো। পথের মোড়ে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখবো...'

'কেউ কাঁচ ভাঙে কিনা দেখার জন্যে?' কিশোরের কথাটা শেষ করে দিলেন মামা। 'বুদ্ধিটা মন্দ না। দেবো। যদিও রিস্কি হয়ে যায় ব্যাপারটা। আর দ্বিতীয় কাজ কি?'

'ভূত-থেকে-ভূতে।'

টেবিলে পানির বোতল রেখে কি কাজে রান্নাঘরে গিয়েছিলেন মামী। বেরিয়ে আসতেই কানে গেল কথাটা। মামা তিন গোয়েন্দা পড়েন, তিনি পড়েন না। একথার মানেও জানেন না। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী?'

'ভূত-থেকে-ভূতে,' বললেন মামা। বুঝিয়ে দিলেন, 'এটা আমাদের তিন গোয়েন্দার একটা অসাধারণ আবিষ্কার। কোন জিনিস খুঁজতে হলে এর জুড়ি নেই। আমি চাকরি করার সময় এই পদ্ধতিটা যদি জানতাম, কতো যে সুবিধে হতো কি বলবো!'

'কিছুই বুঝতে পারছি না তোমার কথা!'

'বেশ, বুঝিয়ে দিচ্ছি,' বললেন চৌধুরী সাহেব। 'শুনলে হাঁ হয়ে যাবে। ধরো, তোমার গাড়িটা খুঁজে পাচ্ছো না। যতো পরিচিত বাড়ি আছে তোমার, ফোন করে ওসব বাড়ির ছেলেমেয়েদের জানিয়ে দাও খবরটা। বলবে, গাড়ির খোঁজ দিতে পারলে ভালো পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। আরও বলবে, ওদের বন্ধুদের যেন খবরটা জানায় ওরা। সবাইকে জানানোর দরকার নেই। ওদের পাঁচজন পাঁচজন করে বন্ধুকে জানালেই চলবে। কি ঘটবে, বুঝতে পারছো?'

'কি আর এমন...' বলতে বলতে সত্যিই হাঁ হয়ে গেলেন মামী। বুঝে ফেলেছেন। 'সর্বনাশ! কয়েক ঘন্টার মধ্যেই শহরের সমস্ত ছেলেমেয়ে জেনে যাবে, যাদের টেলিফোন আছে!'

'ঠিক!' তুড়ি বাজালেন চোধুরী সাহেব। 'ওরা ছুটবে তখন গাড়ি খুঁজতে। ওদের আরও অনেক বন্ধু আছে, যাদের টেলিফোন নেই। মুখে মুখে তাদের কানেও খবরটা চলে যাবে। ঢাকা শহরে থাকলে তখন গাড়িটা আর লুকিয়ে রাখা যাবে বেশিক্ষণ?'

'না, যাবে না।' ছেলেদের দিকে তাকিয়ে স্নেহের হাসি হাসলেন। 'সাহ্, বুদ্ধি আছে তোদের। সত্যি...'

'কিন্তু ভূত-থেকে-ভূতে ব্যবহার করে এখন কি লাভ?' রুচি জিজ্ঞেস করলো। 'কি খুঁজবে ওরা?'

'আর কোনো গাড়ির কাঁচ ওভাবে ভেঙেছে কিনা,' জবাব দিলো কিশোর।

'হুঁ। তা জবাবটা দেবে কার ঠিকানায়? তোমরা এখানে এসেছো জানলে ঢাকা শহরের ছেলেমেয়ে আর থাকবে না। সব এসে ভেঙে পড়বে এই উত্তরায়। তোমাদের দেখার জন্যে। পাগল হয়ে যাবে সবাই।'

'এতোই পপুলার আমরা?' গর্ব হচ্ছে মুসার।

'টেলিফোন করেই দেখো না,' হাসলো রুচি।

'হোক না পাগল,' কিশোর বললো, 'অসুবিধে কি? ওদের সঙ্গে দেখা করতেই তো এসেছি আমরা। তবে একটা কাজ করা যায়। এখানে এসে ভিড় করার দরকার নেই। শিডিউল করে নিয়ে একেক দিন একেক পাড়ায় আমরাই দেখা করতে যাবো, জানিয়ে দিলেই হবে।' রুচির দিকে তাকালো সে, 'তোমাদের ফোন আছে?'

'আছে।'

'সারাক্ষণ ওটা ধরার কেউ আছে? মানে, বললে ধরতে পারবে?'

'পারবে, আমার ভাই, রচি। ইস্কুল এখন ছুটি। সারাদিন বাড়িতেই থাকে।'

'তাহলে ওর ওপরই দায়িত্বটা চাপানো যাক, কি বলো? এখানে তো সারাদিন আমরা থাকবো না। নানা জায়গায় যাবো। অনেক ফোন আসবে, বুঝতে পারছি। ধরবে কে?'

'অসুবিধে হবে না,' আশ্বাস দিলো রুচি। 'রচিকে বলে দেবো। খুশি হয়েই কাজটা করবে ও।'

দুই

রাত্রে মামা বললেন, তিনিও যাবেন সঙ্গে। গাড়ি বের করলেন। খাওয়া-দাওয়া শেষ। কিশোর বললো, নটার মধ্যে জায়গামতো পৌঁছে যাওয়া চাই। মামা আশ্বাস দিলেন, তাতে অসুবিধে হবে না।

বিকেলেই রুচির সঙ্গে গিয়ে জায়গাটা দেখে এসেছে তিন গোয়েন্দা।

গাড়ি রাস্তায় বেরিয়ে এলে কিশোর তার পরিকল্পনার কথা বললো। সাত নম্বর রাস্তার মোড়ে গাড়ি থেকে নেমে যাবে ওরা তিনজন। রুচিকে নিয়ে মামা চলে যাবেন সেই জায়গাটায়, যেখানে রোজ পিকআপ পার্ক করে রুচি। গাড়ি থেকে বেরিয়ে মামাকে জোরে জোরে বলবে সে, বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে, কাজেই ঘন্টাখানেক দেরি হবে। মামা বলবেন, তিনিও গাড়ি রেখে কাছের চা-দোকানে চা

খেতে যাচ্ছেন। তারপর কচি চলে যাবে বাড়ির দিকে, মামা চলে যাবেন রেস্টুরেন্টের দিকে। যে বাড়িতে মাল সরবরাহ করে কচিরা সেখানে ঢুকে ঘন্টাখানেক বসে থাকার দরকার হলেও অসুবিধে হবে না তার। বাড়ির গিন্নির সঙ্গে ভালো খাতির। কিন্তু সে দিকে গেলেও আসলে বাড়িতে ঢুকবে না সে, অন্ধকারে কোথাও ঘাপটি মেরে থেকে চোখ রাখবে গাড়িটার ওপর। ততোক্ষণে পা টিপে টিপে রাস্তার অন্যপাশে চলে আসবে তিন গোয়েন্দা। লুকিয়ে থেকে ওরাও চোখ রাখবে গাড়ির ওপর।

সাত নম্বর রাস্তার মোড়ে পৌঁছে গাড়ি থামালেন মামা। নেমে পড়লো তিন গোয়েন্দা। আবার এগিয়ে গেল গাড়ি, মোড় নিয়ে ঢুকে পড়লো গলিতে।

হেঁটে চললো তিন গোয়েন্দা। বিকেলেই দেখে গেছে লুকানোর অনেক জায়গা আছে এখানে। পথের একপাশে বাড়িঘর খুব পাতলা, ঝোপঝাড় আছে বেশ, খাদও আছে। একটা ঝোপের আড়ালে এসে বসে পড়লো ওরা। গাড়িটার দিকে চোখ।

দেখলো, একটা বাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কচি। মামা চলে যাচ্ছেন মোড়ের দিকে, চায়ের দোকানে গিয়ে বসে থাকবেন।

ছায়ায় মিলিয়ে গেল কচি।

ওই পথ ধরে প্রথম একজন মহিলাকে আসতে দেখলো ওরা।

'আসছে,' ফিসফিসিয়ে বললো মুসা।

বিদেশী মহিলা। মনে হয় হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলো। বেশ লম্বা। পরনে জিনস, গায়ে গলাবন্ধ সোয়েটার। হাতে একটা চকচকে কালো লাঠি, হাতলটা রুপোয় বাঁধানো। সঙ্গে সঙ্গে আসছে বিশাল একটা কুকুর। জানোয়ারটা খুব অস্থির। এটা শুঁকছে, ওটা শুঁকছে, এদিকে চলে যাচ্ছে, ওদিকে চলে যাচ্ছে। কাছাকাছি রাখার জন্যে ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে যাচ্ছে মহিলা।

গাড়িটার কাছে এসে টায়ার শুঁকতে লাগলো কুকুরটা। মহিলাও দাঁড়িয়ে গেল।

সামনের টায়ার শুঁকে হঠাৎ লাফ দিয়ে জানালার কাঁচে দুই পা তুলে দিলো কুকুরটা। ওকে নামতে বললো মহিলা। নামলো না দেখে হাতের লাঠিটা তুলে শাঁই করে বাড়ি মারলো, তবে গায়ে লাগানোর জন্যে নয়, ভয় দেখানোর জন্যে। সেই সঙ্গে দিলো কড়া ধমক।

পা নামিয়ে নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলো কুকুরটা। মহিলা লাঠি হাতে চললো পেছনে।

'মহা হারামী কুত্তা!' মুসা মন্তব্য করলো।

'আচ্ছা,' রবিন বললো, 'কুকুরটাকে মারতে গিয়েই জানালার কাঁচে বাড়ি লাগিয়ে দেয়নি তো মহিলা?'

মাথা নাড়লো কিশোর। 'না।'

মহিলা চলে যাওয়ার পর পরই এলো দুটো ছেলে। একজনের হাতে একটা

ক্রিকেট ব্যাট, আরেকজনের হাতে বল। বলটা বার বার ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিচ্ছে। এগোচ্ছে ওভাবেই। গাড়ির কাছে পৌঁছে হাত ঘুরিয়ে ক্রিকেট বল যে ভাবে ছোঁড়ে তেমনি ভাবে জানালার কাঁচ সই করে ছুঁড়ে মারার ভঙ্গি করলো ছেলেটা। কিন্তু মারলো না।

ছেলে দুটো পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার পর মুসা বললো, 'কিশোর, ওরা শয়তানী করে ভাঙেনি তো? বল ছুঁড়ে, কিংবা ব্যাট দিয়ে বাড়ি মেরে?'

'না,' আবার মাথা নাড়লো কিশোর, 'তা-ও মনে হয় না।'

ছেলেগুলো চলে যাওয়ার পর আবার নীরব হয়ে গেল গলি। সময় যাচ্ছে। বাড়িঘরের অনেক জানালার আলোই নিভে যাচ্ছে একে একে। এক ঘণ্টা পেরোলো। এই সময়টায় একেবারে নির্জন রইলো গলিটা। তারপর এলো লোকটা। লম্বা। মোড়ের দিক থেকে শাঁ শাঁ করে ছুটে এলো একটা টেন-স্পীড সাইকেলে চড়ে।

সতর্ক হয়ে উঠলো গোয়েন্দারা। সাইকেলের আলোটা বেশ উজ্জ্বল, টর্চের আলোর মতো এসে পড়েছে সামনের পথে। আঁটোসাঁটো পোশাক পরেছে লোকটা, সাইকেল চালানোর সময় স্পোর্টসম্যানেরা যে রকম পরে। বিচিত্র আরও কিছু জিনিস রয়েছে তার শরীরে। পিঠে বাঁধা ব্যাকপ্যাক, মাথায় টুপি—ক্রিকেট খেলোয়াড়েরা যে রকম পরে, চোখে বিচিত্র গগলস—গোল গোল কাঁচ, কানে হেডফোন—ওয়াকম্যান কিংবা রেডিওটা দেখা যাচ্ছে না, নিশ্চয় পিঠের ব্যাগের ভেতরে ভরে রেখেছে।

'খাইছে!' হেসে ফেললো মুসা। 'ব্যাটাকে দেখে তো মনে হয় ভিনগ্রহ থেকেই নেমেছে। হাহ্ হাহ্! স্টার ট্রেক ছবির দৃশ্য। টুপির বদলে মাথায় হেলমেট থাকলেই হয়ে যেতো···'

গাড়িটার কাছে এসে গতি ধীর করলো লোকটা। দম বন্ধ করে ফেললো ছেলেরা। মুখ এদিকে, যেন ওদের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। মনে হলো, এখুনি কিছু ঘটবে। কিন্তু ঘটলো না। ওদেরকে নিরাশ করে আবার গতি বাড়িয়ে দিলো লোকটা। ঢুকে পড়লো গিয়ে সামনের আরেকটা উপ-গলিতে।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে মুসা বললো, 'আমি তো মনে করেছিলাম···'

'এই ব্যাটাই কাঁচ ভাঙবে,' বাক্যটা শেষ করে দিলো রবিন। 'অন্তত কিছু একটা করবে বলে মনে হচ্ছিলো আমার।'

অন্ধকারে বসে ভ্রূকুটি করলো কিশোর, সেটা দেখতে পেলো না কেউ। 'আসলে সবাইকেই সন্দেহ করছি তো আমরা, ফলে নিরাশ হতে হচ্ছে। ধৈর্য ধরতে হবে।'

বসে থাকতে থাকতে হাত-পায়ে খিল ধরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। ঝাড়া দিয়ে আবার স্বাভাবিক করে নিলো ওরা। অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসলো কিশোর। এক

ঘন্টা থাকার কথা, যে কোনো মুহূর্তে এখন বেরিয়ে আসতে পারে কচি।

হঠাৎ একটা নড়াচড়া চোখে পড়লো কিশোরের। দূরের একটা কোণ থেকে ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে আসছে একজন মানুষ।

আরও কাছে এলে দেখা গেল মানুষটা ছোটখাটো, হাতে কি যেন রয়েছে।

'হাতে কি?' ফিসফিসিয়ে বললো মূসা।

এগিয়েই আসছে লোকটা, গাড়ির দিকে। মাঝে মাঝে পেছনে আর এদিক ওদিক ফিরে তাকাচ্ছে। যেন ভয় পাচ্ছে কোনো কারণে। হাতে একটা ছড়ি।

'লাঠি!' বেশ জোরেই বলে ফেললো রবিন, উত্তেজনায় আস্তে বলার কথা ভুলে গেছে।

ছড়ি দোলাতে দোলাতে গাড়ির দিকে আসছে লোকটা। ওটার একটা মাত্র বাড়ি লাগলেই চুরমার হয়ে যাবে জানালার কাঁচ।

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে ছেলেরা।

এগিয়ে আসছে লোকটা...আসছে পৌছে গেল গাড়ির কাছে...এবার একটামাত্র বাড়ি...কিন্তু না, পাশ কাটাচ্ছে সে, দ্রুত এগিয়ে চলেছে যেন তাড়া খেয়ে। দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল মোড়ের অন্ধকারে।

হতাশায় গুঙিয়ে উঠলো মূসা।

হতাশ অন্য দুজনও হয়েছে। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সামনের নির্জন, নীরব পথের দিকে। আর কেউ আসছে না। কোনো গাড়িও না। এগারোটা বাজলো, তার পরেও কিছু ঘটলো না।

'এগারোটায় কচির বাড়ি ফেরার কথা,' মনে করিয়ে দিলো মূসা।

'সে-ও নিশ্চয় আমাদেরই মতো অপেক্ষা করছে,' রবিন বললো, 'কাঁচ ভাঙার। বেরোচ্ছে না সেজন্যেই।'

'কিন্তু আর দেরি করে লাভ নেই,' উঠে দাঁড়ালো কিশোর। 'আজ আর ভাঙবে বলে মনে হয় না। চলো।'

ঝোপের আড়াল থেকে পথে বেরিয়ে এলো ওরা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা বাড়ির ছায়া থেকে বেরিয়ে এলো কচি। সবাই জড়ো হলো গাড়ির কাছে।

বিষণ্ণ কণ্ঠে কিশোর বললো, 'হয়তো আমার ধারণা ভুল।'

'ভুল? কি ভুল?' জানতে চাইলো রবিন।

'ভেবেছিলাম, কচির বন্ধুর গাড়িরও যখন একটা কাঁচ ভেঙেছে, তারমানে শুধু কচিদেরটাই নয়, অন্য গাড়ির ওপরও চোখ আছে লোকটার, কাঁচ যে ভাঙে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, কোনো কারণে শুধু পিকআপটার ওপরই নজর। দেখা যাক আরও খোঁজ নিয়ে।'

'তাহলে আবার কাল এসে পিকআপের ফাঁদ পাতলেই পারি,' মূসা পরামর্শ দিলো।

'ভূত-থেকে-ভূতে কোনো কাজ দিচ্ছে না,' রবিন বললো। 'অন্য গাড়ির কাঁচই যদি না ভাঙা হয়, কি খবর আসবে?'

'হুঁ,' গম্ভীর হয়ে মাথা দোলালো কিশোর, 'এখনও কিছু বোঝা যাচ্ছে না। দেখা যাক, কি হয়!'

তিন

পরদিন সকালে বাগানে বসে রোদ পোহাচ্ছে তিন গোয়েন্দা, এই সময় ছুটতে ছুটতে এলো কচি। ভীষণ উত্তেজিত। এসেই ধপ করে বসে পড়লো একটা চেয়ারে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'একশো বেয়াল্লিশটা!'

'কি একশো বেয়াল্লিশটা?' মুসা অবাক।

'গাড়ি!'

'গাড়ি?'

'একশো বেয়াল্লিশটা গাড়ির কাঁচ ভেঙেছে! রাত একটা পর্যন্ত টেলিফোন এসেছে। ভোর থেকে শুরু হয়েছে আবার!'

'একশো বেয়াল্লিশটা!' বিড়বিড় করলো কিশোর।

'হ্যাঁ,' কচি বললো। 'প্রথমটা ভেঙেছে দুই মাস আগে। আমাদেরটা ভাঙারও আগে।'

'তাহলে কিশোরের ধারণাই ঠিক,' রবিন বললো। 'শুধু তোমাদের গাড়ির পেছনেই লাগেনি লোকটা।'

'সব কি ঢাকা শহরেই ভেঙেছে?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালো কচি।

'কোন কোন এলাকার গাড়ি জিজ্ঞেস করেছিলে?'

'করেছি। ঠিকানাও লিখে নিয়েছি,' বলে পকেট থেকে নোটবুক বের করলো কচি।

সেটা নিয়ে পাতা উল্টে দেখতে লাগলো কিশোর। অনেকক্ষণ পর মুখ তুলে বললো, 'চলো ঘরে যাই। দেখি, মামার কাছে ঢাকা শহরের কোনও ম্যাপ আছে কিনা।'

'না থাকলেও অসুবিধে নেই। জোগাড় করে নেয়া যাবে।'

স্টাডিতে পাওয়া গেল চৌধুরী সাহেবকে। একটা গোয়েন্দা গল্পের পেপারব্যাক পড়ছেন। মুখ তুলে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই যে গোয়েন্দারা, কি খবর?'

বললো কিশোর।

ম্যাপ পাওয়া গেল। বেশ বড় একটা। সেটা নিয়ে শোবার ঘরে চলে এলো কিশোর, বন্ধুদেরকে সঙ্গে নিয়ে।

আরিফ সাহেব জানতে চেয়েছেন ম্যাপ দিয়ে কি করবে কিশোর। বলেনি সে।

শুধু বলেছে, আগে কাজটা শেষ হোক, তারপর সব জানাবে। তিনিও আর জানার জন্যে চাপাচাপি করেননি। মুচকি হেসে শুধু বলেছেন, 'একেবারে এরকুল পোয়ারো।'

তাঁর সঙ্গে একমত রবিন। আগাথা ক্রিস্টির গোয়েন্দা গল্পের নায়ক এরকুল পোয়ারোর সঙ্গে স্বভাবের অনেক মিল আছে কিশোর পাশার।

ঘরে এসে ম্যাপটা টেবিলে বিছাতে বিছাতে কিশোর বললো, 'কচি, ধারে কাছে ভালো স্টেশনারি দোকান আছে?'

'কেন?'

'কয়েক বাক্স পিন দরকার। ওই যে, যেগুলোর পেছনে রঙিন প্ল্যাস্টিকের বোতাম লাগানো থাকে। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, যে কটা রঙে পাওয়া যায়, সব লাগবে।'

'এখানে এই উত্তরায় তেমন দোকান···আচ্ছা, ঠিক আছে, না পেলে টঙ্গি থেকে নিয়ে আসবো। এখুনি লাগবে?'

'হ্যাঁ, এখুনি।'

'নিয়ে আসছি আমি।'

'আমরা আসবো?'

'দরকার নেই।' দরজার দিকে এগোলো কচি।

'টাকা নিয়ে যাও।'

'আছে আমার কাছে,' বলে বেরিয়ে গেল কচি। ফিরতে অনেক দেরি করে ফেললো। জানালো, 'এখানে পাইনি। টঙ্গি যেতে হয়েছে।' পিনের বাক্সটা টেবিলে নামিয়ে রাখলো সে।

সবাইকে নিয়ে কাজে বসলো কিশোর। কচি যখন দোকানে গেছে, বসে থাকেনি সে। চৌধুরী সাহেবের নানা বিচিত্র জিনিসের গুদাম থেকে বড় একটুকরো চারকোণা প্লাই উড জোগাড় করে এনেছে। সেটার ওপর ম্যাপটা ছড়িয়ে টেপ দিয়ে আটকে নিয়েছে।

চার রঙের পিন এনেছে কচি। সবগুলো খুলে বসলো কিশোর। কচিকে বললো, 'তুমি নোটবুক দেখে এক এক করে ঠিকানা বলো।'

বলতে লাগলো কচি। বাক্স থেকে পিন তুলে নিয়ে ঠিকানা মোতাবেক ম্যাপের গায়ে গাঁথতে লাগলো কিশোর। তাকে সাহায্য করলো রবিন আর মুসা।

সময় যে কোনদিকে দিয়ে কেটে গেল, খেয়ালই রইলো না ওদের। দুপুরের খাবার জন্যে যখন ডাকতে এলেন মামী, তখন টনক নড়লো মুসার। প্রচণ্ড খিদে টের পেলো। এই খিদে ভুলে এতোক্ষণ থাকলো কি করে ভেবে নিজেই অবাক হলো।

উত্তেজিত হয়ে আছে চারজনেই। খাবার টেবিলে খুব একটা কথা বললো না ওরা। তাড়াতাড়ি খেয়ে এসে আবার পিন গাঁথতে বসলো। আরও ঘণ্টাখানেকের

খাটুনির পর শেষ হলো কাজ। 'হউফ' করে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো কিশোর। বললো, 'দেখো তো, এবার কিছু বোঝা যায় কিনা?'

ম্যাপের দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা ঝাঁকালো মুসা, 'পারছি। ঢাকা শহরের কোন কোন এলাকায় ভাঙছে, স্পষ্ট করে বোঝা যাচ্ছে এখন।'

'হ্যাঁ। আরেকটা ব্যাপার লক্ষ করেছো? কচি যখন ঠিকানাগুলো বলে যাচ্ছিলো, তারিখও বলতে বলেছিলাম। কোন তারিখে কোন দিন ভেঙেছে কাঁচগুলো। শুধু সোম আর বুধবারে। অন্য কোনো বারে একটা কাঁচও ভাঙেনি।'

'ঠিক ঠিক!' বলে উঠলো রবিন। 'আর কোনো বারের কথা লেখেনি কচি।'

'আরও একটা ব্যাপার,' ম্যাপের দিকে তাকিয়ে বললো কিশোর, 'যে রাস্তায়ই ভাঙে, মাঝের দু-তিনটে করে গলি বাদ দিয়ে নেয়।'

'কেন দেয়?' জানতে চাইলো মুসা

'সেটা এখনও বলতে পারবো না। তবে জেনে যাবো।'

'গাড়ি নিয়ে আবার কি ফাঁদ পাততে যাচ্ছি আমরা?' রবিন জিজ্ঞেস করলো।

'নিশ্চয়ই। তবে আজ বিকেলে বেড়াতে যাচ্ছি,' কিশোর বললো। 'তুরাগ নদীর ধার ধরে হেঁটে চলে যাবো গ্রামের ভেতর। যতদূর যেতে পারি। দূর থেকে দেখে মনে হয়, গ্রামগুলো সুন্দর। ভেতরে ঢুকে দেখতে চাই সত্যি কেমন।'

নদীর ধার দিয়ে হেঁটে চলেছে ওরা। তিন গোয়েন্দা আর কচি। শীতকাল। শুকনো মৌসুম। অনেক নিচে নেমে গেছে পানি। খুব ধীরে ধীরে বয়ে চলেছে এঁকেবেঁকে যাওয়া পানির স্রোত। রেললাইন পেরিয়ে হেঁটে চললো ওরা।

একপাশে ছড়ানো ফসলের খেত। ফসল কাটা হয়ে গেছে সেই কবে, এখন খেত জুড়ে শুধু সাদা মাটির ঢেলা।

নদীর পাড়ে সাদা বালি, পানির ধার পর্যন্ত নেমে গেছে। জায়গায় জায়গায় অসংখ্য শালিক বসে আছে। ঝগড়া বাধিয়েছে কোনো কোনোটা, কিচির মিচিরে কান ঝালাপালা। একখানে দেখা গেল পানির কিনারে এক পা তুলে ধ্যানমগ্ন হয়ে আছে সাদা বক। ওদের এগোতে দেখে ধ্যান ভঙ্গ হয়ে গেল তার। চোখের পলকে ডানার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো আরেকটা পা। সতর্ক দৃষ্টিতে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে লাগলো ওদেরকে। বোধ হয় লক্ষ করছে হাতে এয়ারগান আছে কিনা। ইদানীং এই বয়েসী ছেলেরা বড় বেশি বিরক্ত করে। এই তো, দিন কয়েক আগেই মেরে নিয়ে গেছে তার সঙ্গিনীকে।

ওদের হাতে কিছু নেই দেখে আশ্বস্ত হলো পাখিটা, তবে সতর্কতা কমলো না। ব্যাপারটা লক্ষ করলো মুসা। বকটা ওরকম করছে কেন জিজ্ঞেস করলো। এয়ারগানের কথা জানালো কচি।

আরও খানিক দূর গিয়ে একটা বড় মাছরাঙা দেখা গেল। পানিতে পড়ে থাকা মরা পচা ডালের ওপর বসে আছে। ওদেরকে দেখে ওটাও সতর্ক হয়ে গেল। ওরা

আরও খানিকটা এগোতেই চিড়ড়িক ডাক ছেড়ে উড়ে চলে গেল।

'এটারও কি এয়ারগানের ভয়?'

'চড়ুই থেকে শুরু করে কিছুই তো বাদ দেয় না ছেলেগুলো।'

এগিয়ে চলেছে ওরা। পায়ে চলা পথের কিনারে এখন খানিক পর পরই খেজুর গাছ। পথের পাশে খেত আছে এখানেও। তবে ফসলের খেতের মতো শূন্য নয়। শীতকালীন শাকসজিতে সবুজ হয়ে আছে। কোথাও সরষে খেতের হলদে ফুলের শোভা। তার ওপর এসে পড়েছে বিকেলের পড়ন্ত সোনালি রোদ।

সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেই ফেললো মুসা, 'কিশোর, তোমাদের দেশটা সত্যিই সুন্দর। এতোদিন তো শুধু শুনেছি, আজ দেখলাম...'

জবাব দিলো না কিশোর। শুধু মাথা ঝাঁকালো। স্বপ্নিল হয়ে উঠেছে তার মায়াময় দুই চোখ। গুনগুন করে বেসুরো গলায় গেয়ে উঠলো, 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা...'

পেছনে সূর্য ডুবছে। খেজুর গাছে শালিক আর শ্যামার ভিড়। বেশির ভাগই ডাকছে নানান সুরে। কোন কোনটা এসে বসেছে রসের কলসের কানায়। রস বেয়ে পড়ার কাঠিতে ঠোঁট ডুবিয়ে রস খাচ্ছে। দূরে কোথায় যেন আপনমনে শিস দিয়ে চলেছে একটা দোয়েল। এক জায়গায় এসে দেখলো, খেজুর গাছে কলসি পাতছে ওদেরই বয়েসী একটা ছেলে।

কলসিতে যে মিষ্টি রস পড়ে, ইতিমধ্যে তা জেনে গেছে মুসা। কচিকে জিজ্ঞেস করলো, 'কখন খাওয়া যাবে?'

'সকালে,' জানালো কচি।

'সকালে কেন?'

'সারারাত ধরে কুয়াশা পড়বে। কুয়াশা আর রস গিয়ে জমা হবে কলসিতে। সকালে ওগুলো নামিয়ে বেচতে নিয়ে যাবে কৃষক।'

'ও। সকালে আসাই ভালো ছিলো তাহলে।'

'কেন, রস খাওয়ার জন্যে?' হাসলো কচি। 'বেশ, আসবো একদিন সকালে।'

গাছের ওপর থেকে ওদের কথাবার্তা সবই শুনেছে কৃষকের ছেলেটা। মুসার ভাঙা বাংলা বুঝতেও অসুবিধে হয়নি। স্থানীয় ইস্কুলে ক্লাস এইটে পড়ে সে।

কলস পাতা শেষ করে নিচে নামলো ছেলেটা। তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। মুসা আর রবিনের দিকে কৌতূহলী চোখে তাকাতে লাগলো সে। বুঝতে পারছে, বিদেশী। কচির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনেরা কি এখানে নতুন আইলেন?'

'আমি পুরানোই। এরা নতুন।'

'ইনিও?' কিশোরকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো সে।

'হ্যাঁ।'

'কই থাকেন ভাই আপনেরা?' এবারের প্রশ্নটা কিশোরকে।

'আমেরিকায়। আমার নাম কিশোর পাশা,' হাত বাড়িয়ে দিলো সে। 'ওরা আমার বন্ধু। ওর নাম মুসা আমান। আর ও রবিন মিলফোর্ড।'

চকচক করে উঠলো ছেলেটার দুচোখ। দৃষ্টিতে বিস্ময় মেশানো অবিশ্বাস। 'রাখেন, রাখেন, আপনেদের নাম শুনছি! রকি বীচে থাকেন না আপনেরা?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালো কিশোর। চোখে কৌতূহল।

'বুঝেছি, আপনেরাই! কতো পড়ছি আপনেগো কিচ্ছা! খুব ভালা লাগে আমার! আপনেরা তিন গোয়েন্দা, ঠিক কইলাম না?' বলে জবাবের অপেক্ষা না করেই কিশোরের হাত দুই হাতে চেপে ধরলো সে। 'আমার নাম আবদুল করিম। হগগলে ডাকে করিম কইয়া। খালি বাবায় আর হেডস্যারে যখন বেশি রাইগ্গা যায়, তখন কয় করিম্মা।' নিষ্পাপ হাসি হাসলো সে। এক এক করে মুসা আর রবিনের হাতও ঝাঁকিয়ে দিলো।

ছেলেটার সরলতায় মুগ্ধ হয়ে গেল মুসা আর রবিন। আমেরিকায় এই বয়েসী কোন ছেলের এতোখানি আন্তরিকতা কল্পনাও করা যায় না।

মুসা জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি আমাদের কথা জানো?'

'হ জানি,' আবার হাসলো ছেলেটা। 'আপনে খালি খাইছে খাইছে করেন না? আর হগ্গল সময় খালি খাওনের লাইগ্যা পাগল হইয়া থাকেন। ভূতের নাম শুনলেই কাছার কাপড় ফালাইয়া দৌড়। ঠিক না?'

'হ্যাঁ,' ছেলেটার সব কথার অর্থ বুঝতে পারছে না মুসা, তবে মানে মোটামুটি আন্দাজ করে নিতে পারছে।

'গাছের মাথায় থাইক্কাই শুনলাম, রস খাওনের কতা কইতাছেন। অখন তো অইবো না, বাই, সকালের আগে রস পাওন যাইবো না।'

খুব সহজেই ওদেরকে আপন করে নিলো ছেলেটা। বকবক করে চললো। কাছেই ওদের বাড়ি। হাত তুলে দেখিয়ে দিলো।

সূর্য এখন আর চোখে পড়ে না। ডুবে গেছে। কিন্তু তার রেশ ছড়িয়ে রয়েছে পশ্চিম আকাশে। সাদা মেঘের ছোট-বড় পাহাড়গুলো এখন রক্তলাল।

ওদেরকে তার বাড়িতে রাতের খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে বসলো করিম। আজ না, আরেক দিন, বলে অনেক কষ্টে এড়ানো গেল।

দ্রুত কমে আসছে গোধূলির কালচে সবুজ আলো। ছায়াঢাকা মেঠোপথ ধরে আবার শহরের দিকে ফিরে চললো ওরা। এক অপূর্ব আনন্দে মন ভরে গেছে সবারই, বিশেষ করে তিন গোয়েন্দার।

মনে মনে আরেকবার স্বীকার করতে বাধ্য হলো রবিন আর মুসা, বাংলাদেশটা সত্যিই সুন্দর! সুন্দর এর মানুষগুলো!

চার

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে ঘর থেকে বেরোতেই মামীর সঙ্গে দেখা মুসার। তাকে ডাকতেই আসছিলেন তিনি। বললেন, 'উঠেছো। বারান্দায় গিয়ে দেখো কে এসেছে।'

'কে?'

'গিয়েই দেখো না,' মিটিমিটি হেসে চলে গেলেন তিনি।

ভীষণ কৌতূহল হলো মুসার। চলে এলো বারান্দায়। তাকে দেখেই হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালো ছেলেটা।

'আরে, করিম।'

'হ। রস লইয়া আইছি। আইজ রাইতে কুয়াশা খুব ভালো পড়ছিলো। ভালো রস অইছে।' সামনে রাখা দুই কলস রস দেখালো করিম। 'যান, একটা গেলাস লইয়া আয়েন। ঢাইল্লা দেই, খান।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে রইল মুসা। এই কষ্টটা কেন করতে গেলে?—বলে যে সৌজন্যটুকু দেখাবে সেকথাও ভুলে গেল। ভাবতেই পারেনি এভাবে রস নিয়ে হাজির হয়ে যাবে আবদুল করিম।

'এই নে, গেলাস,' পেছন থেকে মামীর কথায় সংবিৎ ফিরলো যেন তার।

গেলাসটা নিয়ে হাসলো মুসা। বাড়িয়ে দিলো করিমের দিকে। 'দাও।'

কলসের মুখে পরিষ্কার গামছা বাঁধা। সাদা ফেনা জমে রয়েছে। রস ঢেলে দিলো করিম।

হাতে নিয়ে পানীয়টুকু ভালো করে দেখলো মুসা। এই জিনিস আগে কখনও দেখেনি সে। গন্ধ শুঁকলো। তারপর চুমুক দিলো গেলাসে। দিয়েই বলে উঠলো, 'খাইছে! এতো মিষ্টি!' বলেই ঢকঢক করে সবটুকু গিলে ফেলে আবার গেলাসটা বাড়িয়ে দিলো।

গিলে চলেছে মুসা। আর ক্রমেই বাড়ছে করিমের হাসি। দারুণ মজা পাচ্ছে। গ্রামে ওরা বন্ধুরা মিলে বাজি ধরে রস খায়। সবাই প্রচুর খেতে পারে। কিন্তু এখন তার মনে হলো, মুসার ধারে কাছে যেতে পারবে না কেউ।

'চলেন, একদিন আমাগো বাড়িত গিয়া বাজি ধইরা খাইবেন?' প্রস্তাব দিয়ে ফেললো করিম।

না বুঝেই মাথা কাত করলো মুসা, 'আচ্ছা।' আবার বাড়িয়ে দিলো গেলাস।

একের পর এক গেলাস খালি করে অবশেষে ওটা করিমের হাতে দিতে দিতে মস্ত ঢেকুর তুলল সে, 'নাও, আর পারবো না।'

একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লো মুসা। ঢোল হয়ে যাওয়া পেটে হাত বোলাচ্ছে। কিশোর আর রবিনও এসেছে। ওদেরকে বললো, 'দারুণ টেস্ট, বুঝলে।

খেয়ে দেখো।' ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হাসলো সে। 'এতো মজা, লোভ সামলাতে পারিনি। এর সঙ্গে কোথায় লাগে পেপসি-কোক-ফান্টা...'

রস খাওয়া শেষ হলো। কিছুতেই পয়সা নিতে চাইলো না আবদুল করিম। কিন্তু তিনজনের কাছ থেকে তিনটে স্যুভনির তাকে নিতেই হলো। আমেরিকা থেকে নিয়ে এসেছে তিন গোয়েন্দা। রবিন দিলো ইলেকট্রনিক ঘড়ি বসানো একটা কলপেন। কিশোর দিলো একটা পকেট নাইফ। মুসা দিল সুন্দর একটা গেঞ্জি আর একবাক্স চকলেট।

খুব খুশি হলো করিম। ওদেরকে আবারও খাওয়ার দাওয়াত দিলো। একেবারে নাছোড়বান্দা। কথা আদায় না করে যাবেই না।

শেষে কিশোর বলল, 'ঠিক আছে, যাবো, তবে আজ না। আজ তো বুধবার, যেতে পারবো না। আরেক দিন।'

বুধবারে কি অসুবিধা বুঝতে পারলো না করিম। জিজ্ঞেসও করলো না। জানতে চাইলো, 'আরেক দিন কবে?'

'কালও হতে পারে। এসো একবার। যেতে পারলে চলে যাবো।'

'আচ্ছা,' বলে উঠে পড়লো করিম।

দিনের বেলাটা নানা জায়গায় ঘুরে কাটালো তিন গোয়েন্দা। সোনার গাঁ দেখে এলো। বিকেল বেলা ফিরে খেয়েদেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলো। রাতের খাওয়ার পর বেরোলো আবার, গাড়ি নিয়ে, মামার সঙ্গে।

সোমবার আর বুধবারেই ঘটে কাঁচ ভাঙার ঘটনাগুলো।

আগের বারের মতোই সেদিনও সাত নম্বর রোডের মোড়ে তিন গোয়েন্দাকে নামিয়ে দিলেন চৌধুরী সাহেব। নির্দিষ্ট জায়গায় এনে গাড়ি পার্ক করলেন। কচি নেমে চলে গেল একটা বাড়ির ছায়ার দিকে। তিনি চললেন মোড়ের চায়ের দোকানে।

আগের দিনের মতোই ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসলো তিন গোয়েন্দা।

প্রথমে এলো সেই লম্বা বিদেশী মহিলা। হাতে লাঠি, সঙ্গে কুকুর। সেদিনের মতোই সব কিছু শুঁকতে শুঁকতে এলো কুকুরটা, লাফ দিয়ে গাড়ির কাঁচে পা তুলে দিলো, ধমক দিয়ে তাকে নামিয়ে নিলো মহিলা।

ফিক করে হেসে ফেললো মুসা।

কুকুরটাকে নিয়ে চলে গেল মহিলা। আবার নীরব হয়ে গেল রাস্তা।

এরপর গোটা দুই গাড়ি হুস হুস করে বেরিয়ে গেল। পার্ক করে রাখা গাড়িটার কাছে এসেও একটু গতি কমালো না।

দ্বিতীয় গাড়িটা যাওয়ার কিছুক্ষণ পর এলো সেই বিচিত্র পোশাক পরা তরুণ। টেন-স্পীড সাইকেলে করে। সেদিন তো পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গতি

কমিয়েছিলো, আজ তা-ও কমালো না। শাঁই শাঁই করে সোজা ছুটে গিয়ে মোড় নিয়ে ঢুকে পড়ল একটা উপ-গলিতে।

ঝোপের আড়ালে অপেক্ষা করে আছে ছেলেরা।

দশটার দিকে মোড়ের কাছে আরেকটা গাড়ির হেডলাইট দেখা গেল। আরও কাছে এলে দেখা গেল একটা ফোক্স ওয়াগেন। অদ্ভুত রঙ করেছে—ওপরের অংশটা বেগুনী, নিচের অংশ হলুদ। তোবড়ানো ফেন্ডার। সামনের বাম্পারের একপাশ খুলে গেছে, আরেক পাশ ছুটলেই খসে পড়ে যাবে। ইঞ্জিনের ভারি শব্দ আর ঝুলে পড়া বাম্পারের ঝনঝন আওয়াজ তুলে এগিয়ে এলো ওটা। পার্ক করা গাড়িটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জানালা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এলো কি একটা জিনিস। গিয়ে পড়ল গাড়িটার নিচে।

'কি ছুঁড়লো!' চেঁচিয়ে বললো মুসা।

'চলো, দেখি!' কিশোর বললো।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো তিনজনে। ছুটে রাস্তা পেরিয়ে এসে উঁকি দিলো গাড়ির নিচে। টর্চের আলোয় জিনিসটা দেখে মুখ বাঁকালো কিশোর।

জিনিসটা বের করে আনলো মুসা। ভীষণ নিরাশ হয়েছে।

'সিগারেটের প্যাকেট!' বিড়বিড় করলো রবিন। 'ভেতরে কিছু নেই তো?'

খুলে দেখলো মুসা। 'কিচ্ছু নেই!' নিমের তেতো ঝরলো তার কণ্ঠ থেকে, 'ধুর...'

কথা শেষ হলো না তার। হঠাৎ বেজে উঠলো সাইরেন। মোড়ের কাছে দেখা দিলো পুলিশের গাড়ি। ছাতের ওপরে লাল-নীল আলো জ্বলছে-নিভছে। পথের আরেক মাথায় একটা উপ-গলির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একই রকম আরেকটা গাড়ি।

তিন গোয়েন্দাকে ঘিরে ফেললো পুলিশ।

পুলিশের গাড়িতে বসানো সার্চ লাইটের আলো এসে পড়লো ওদের গায়ে। এগিয়ে এলেন একজন গম্ভীরমুখো সার্জেন্ট। বুকে প্ল্যাস্টিকের ফলক ঝুলছে, তাতে নাম লেখাঃ আবদুল আজিজ। এক এক করে তাকালেন কিশোর, মুসা আর রবিনের মুখের দিকে। শেষ দুজনকে দেখে অবাক হয়েছেন, বোঝা গেল। জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের পরিচয়?'

'কি জিজ্ঞেস করছেন!' বলে উঠল রাগত একটা কণ্ঠ, 'ধরে লাগান না ধোলাই! পথেঘাটে চুরি, ছিনতাই, বোমাবাজি...অতিষ্ঠ করে ফেললো!'

মোটা একটা বেতের লাঠিতে ভর দিয়ে পুলিশের ভিড় সরিয়ে ভেতরে ঢুকলেন এক বৃদ্ধ। পরনে অবিন্যস্ত পোশাক। পেছন পেছন এলো এক তরুণ আর সতেরো-আঠারো বছরের আরেক তরুণী।

'চোর কোথাকার!' তিন গোয়েন্দার দিকে চেয়ে চোখ পাকিয়ে গর্জে উঠলেন বৃদ্ধ, 'আমার ঈগল কোথায়?'

একটা পেট্রল কার থেকে নেমে এলেন পুলিশের একজন সাব-ইন্সপেক্টর। বুকে ঝোলানো ফলকে নাম লেখা, হাফিজ আলি। তিন গোয়েন্দাকে দেখে সার্জেন্টের মতোই অবাক হলেন তিনিও। কুঁচকে গেল ভুরু। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ছেলেদের দিকে তাকিয়ে থেকে একই প্রশ্ন করলেন, 'তোমাদের পরিচয়?'

'পরিচয়-ফরিচয় পড়ে!' ধমকে উঠলেন বৃদ্ধ। 'আমার ঈগলটা কোথায় আগে জিজ্ঞেস করুন! ধরে পেটান না...'

'আহ্, থামুন তো আপনি,' হাত তুলে বললেন পুলিশ অফিসার। আবার তাকালেন ছেলেদের দিকে, 'এখানে কি করছো তোমরা?'

'উ...উই...' ইংরেজিতে বলতে গিয়েও থেমে গেল মুসা। বাংলায় তোতলাতে শুরু করলো, 'আ-আমরা...চো-চো-চো...'

'চোর নই,' বাক্যটা শেষ করে দিলো কিশোর। বৃদ্ধকে দেখিয়ে বললো, 'ইনি ভুল করছেন।'

কি বলতে যাচ্ছিলেন সাব-ইন্সপেক্টর, চেঁচিয়ে বললো একজন কনস্টেবল, 'স্যার, আরেক ব্যাটাকে ধরেছি! লুকিয়ে ছিলো!' কচিকে টানতে টানতে নিয়ে আসছে সে।

চিৎকার করে উঠলেন বৃদ্ধ, 'আরি, ওটাকে চিনি তো! তিন-তিনবার দেখেছি একটা পিকআপের কাছে, আর তিনবারই কাঁচ ভেঙেছিলো গাড়িটার!'

'ওটা আমাদেরই গাড়ি,' কচি বললো। 'মাল ডেলিভারি দিতে এসেছিলাম। কে জানি ভেঙে রেখে গেছে।'

'এটা কার?' সামনের গাড়িটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন সাব-ইন্সপেক্টর।

'ওসব কথা বাদ দিন না!' খেপে গেলেন বৃদ্ধ। 'আমার ঈগল কোথায় জিজ্ঞেস করুন!'

'আপনি স্যার থামুন না!' বিরক্ত হয়ে বললেন পুলিশ অফিসার। 'আমরাই তো করছি যা করার। আপনি চুপ থাকুন, প্লীজ।'

গজগজ করতে লাগলেন বৃদ্ধ।

কিশোর বললো, 'দেখুন, আমরা গাড়ির কাঁচ ভাঙতে আসিনি। চুরি করতেও নয়।'

বার বার চোর চোর শুনতে শুনতে অসহ্য হয়ে গেছে মুসা। চমকের প্রথম ধাক্কাটাও কাটিয়ে উঠেছে। রেগে গেল। ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে বললো, 'ঈগল ভেরি বিগ পাখি। পকেটে ভরে রেখেছি নাকি?'

'ঠিক,' বাংলায় বললো রবিন। পরের কথাটা বললো ইংরেজিতে, 'পাখি চুরি করতে যাবো কোন দুঃখে?'

'সেটা আমি কি জানি?' চুপ থাকতে পারছেন না বৃদ্ধ। মুখ ভেঙচালেন, 'এঁহ্, ভেরি বিগ পাখি! ন্যাকামো হচ্ছে! জানো না কি পাখি...'

আরেকজন কনস্টেবল চেঁচিয়ে উঠলো, 'স্যার, এই গাড়িটা চিনি!' নাম্বার প্লেটের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। 'চৌধুরী সাহেবের! আরিফুর রহমান চৌধুরী! ডি আই জি ছিলেন...'

'হ্যাঁ, আমারই,' পেছন থেকে শোনা গেল ভারি কণ্ঠ।

ঝট করে ফিরে তাকালেন সাব-ইন্সপেক্টর। 'স্যার, আপনি?'

অ্যাটেনশন হয়ে গেলেন তিনি আর তাঁর দলের লোকেরা। স্যালুট করলেন।

সালামের জবাব দিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে এলেন ভূতপূর্ব ডি আই জি, 'হ্যাঁ। কাঁচ ভাঙে কে ধরতে এসেছি।' কিশোরকে দেখিয়ে বললেন, 'ও আমার ভাগ্নে, কিশোর পাশা। আমেরিকায় থাকে। বেড়াতে এসেছে।...আর এরা ওর বন্ধু। ও মুসা আমান।...ও রবিন মিলফোর্ড। গোয়েন্দাগিরির খুব শখ। নামটাম ভালোই করেছে ওখানে।'

'আমি ওদের কথা জানি, স্যার,' হাসিমুখে বললো একজন কনস্টেবল। 'পড়েছি। তিন গোয়েন্দা।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন চৌধুরী সাহেব।

'ফোন করে ডেকে আনলাম চোর ভেবে,' বিড়বিড় করলেন বৃদ্ধ। 'এখন শুনি গোয়েন্দা।' অস্থির ভঙ্গিতে রাস্তায় বেত ঠুকতে ঠুকতে বললেন, 'আমার ঈগলটা কি পাবো না?'

পাঁচ

'এরা যে লুকিয়ে আছে, আপনারা খবর পেলেন কোথায়?' চৌধুরী সাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

কথা হচ্ছে বৃদ্ধ আকবর আলি খানের ড্রইংরুমে বসে, তিন গোয়েন্দাকে চোর ভেবে বসেছেন যিনি। মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে কিশোর। আসবাবপত্র খুব দামী, কিন্তু পুরানো ধাঁচের। জমিদারী আমলের জিনিসের মতো ভারি আর নকশা করা। বসার ঘরে দেয়ালে টানানো আকবর আলি খানের তিরিশ-চল্লিশ বছর আগের একটা ছবি। পরনে কালো স্যুট। ঠিক একই রকম পোশাক পরেন এখনও। কিছুতেই যেন সময়টা পার হয়ে আসতে পারেননি, কিংবা হয়তো চানই না।

'দুমাস ধরেই ধরার চেষ্টা করছি, স্যার,' সার্জেন্ট জানালেন। 'অনেকেই খবর দিচ্ছে, রহস্যময় ভাবে গাড়ির উইণ্ডশীল্ড ভেঙে রেখে যাচ্ছে কেউ। গত হপ্তায় খান সাহেবও থানায় ডাইরি করে এসেছেন,' বৃদ্ধকে দেখালেন তিনি। 'তাঁর গাড়ির কাঁচ ভেঙে ভেতর থেকে ঈগলটা বের করে নিয়ে গেছে। বাড়ির সামনে তখন ছিলো গাড়িটা। ভুলে ঈগলটা রয়ে গিয়েছিলো গাড়িতে। খানিক পরে মনে পড়তেই ছুটে

গিয়ে দেখেন গাড়ির কাঁচ ভাঙা, ঈগল উধাও। তারপর থেকেই রাস্তার ওপর চোখ রাখেন। পরশুদিন রাতেও নাকি তিনজন ছেলেকে বাড়ির সামনের রাস্তায়, ঝোপের আড়ালে ঘাপটি মেরে থাকতে দেখেছেন। আমাদেরকে হুঁশিয়ার করে রেখেছেন। আজও যখন এদেরকে দেখলেন,' তিন গোয়েন্দাকে দেখালেন আবদুল আজিজ, 'ফোন করলেন থানায়। আমি তখন চৌরাস্তার মোড়ে ডিউটিতে ছিলাম। অয়্যারলেসে আমাকে জানিয়েছেন সাব-ইন্সপেক্টর হাফিজ আলি।'

'জানালার কাঁচ ভাঙার পর,' রবিন বললো, 'উড়ে পালিয়েছে হয়তো ঈগলটা।'

মুসা বললো, 'ঈগল ডেঞ্জারাস পাখি। ছেড়ে রাখা হয় না। পালালো কিভাবে?'

কড়া চোখে ওদের দিকে তাকালেন আকবর আলি খান। 'ইচ্ছে করে ন্যাকা সাজছো, না কী? পাখি হবে কেন? আমার জিনিসটা একটা...'

'বুঝেছি!' বলে উঠলো কিশোর। জ্বলজ্বল করছে চোখ। 'পাখি নয়, মুদ্রা! একটা দুর্লভ মুদ্রা।'

'মুদ্রা?' অবাক হয়ে কিশোরের দিকে তাকালো কচি।

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'আমেরিকান। সোনার টাকা, দশ ডলারের। আঠারোশো সালের শুরুতে বাজারে ছাড়া হয়েছিলো। এক পিঠে ঈগলের ছাপ মারা, ঈগল বললেই লোকে চিনতো তখন। আরও একটা প্রায় একই রকম মুদ্রা ছিলো তখন, হাফ ঈগল, ছাড়া হয়েছিলো আঠারোশো বাইশ সালে। দুনিয়ার সবচেয়ে দুর্লভ মুদ্রাগুলোর একটা এখন।'

'শুনলেন!' গর্জে উঠলেন আকবর সাহেব। 'সব জানে। তার মানে ঈগলটা দেখেছে!'

'দেখলেই যে জানবে শুধু, না দেখলে জানবে না, এটা কোনো কথা হলো না,' গম্ভীর হয়ে বললেন আরিফ সাহেব। 'না দেখেও জানা যায়, বই পড়ে। আর আমার ভাগ্নে প্রচুর বই পড়ে।'

আরিফ সাহেবের সঙ্গে সুর মিলিয়ে মেয়েটা বললো, 'ঠিকই তো। তুমি কিন্তু দুর্ব্যবহার করছো, আব্বা।'

কিছু বললেন না আকবর সাহেব। তবে দৃষ্টি কিছুটা নরম হলো।

তিন গোয়েন্দার দিকে চেয়ে আবার বললো মেয়েটা, 'তোমরা কিছু মনে করো না, ভাই। আব্বার মনমেজাজ ভালো নেই। ঈগলটা হারিয়ে ভীষণ অস্থির।' উঠে এসে কিশোরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো, কোনো জড়তা নেই। 'আমি ডলি।' সোফায় বসা তরুণকে দেখিয়ে বললো, 'ও আমার চাচতো ভাই, সানি।'

সানিও এসে এক এক করে হাত মেলালো তিন গোয়েন্দার সঙ্গে।

এই সময় চা-নাস্তা নিয়ে ঢুকলো বাড়ির কাজের লোক। মেহমানদেরকে

সেগুলো পরিবেশন করতে লাগলো ভাই-বোন মিলে।

'কি ঈগল আপনাদেরটা?' চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সানিকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'ডাবল ঈগল।'

'তার মানে বিশ ডলারের। আঠারোশো উনপঞ্চাশ সালে তৈরি। হাফ ঈগলের চেয়েও দুর্লভ। যতদূর জানি, আমেরিকায় এখন একটাই আছে, গভর্নমেন্টের কাছে। দশ লাখ ডলারে কিনতে চেয়েছিলো এক কোটিপতি, তা-ও রাজি হয়নি সরকার।'

'জানি,' সানি বললো। 'আঠারোশো তিপ্পান্ন সালে নাকি আরও তিনটে তৈরি হয়েছে, যার দুটোর খোঁজ আছে এখন। একেকটার দাম পাঁচ লাখ ডলার।'

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করলো মুসা। 'বিশ ডলারের একটা সোনার টুকরোর এতো দাম!'

'অ্যানটিক ভ্যালু,' কিশোর বললো।

'হ্যাঁ,' সানি বললো। 'চাচারটা তৈরি হয়েছে উনিশশো সাত সালে। দাম আড়াই লাখ ডলারে মতো।'

'গাড়িতে ছিলো কেন ওটা?' রবিন জিজ্ঞেস করলো।

'ধানমণ্ডিতে পুরানো মুদ্রার একটা একজিবিশন হয়েছিলো,' ডলি জানালো, 'সেখানে দিয়েছিলো আব্বা। ওখান থেকে নিয়ে আসার পর ভুলে গাড়িতেই রয়ে গিয়েছিলো।'

'দোষটা তোর!'

এবার মেয়ের ওপর রেগে গেলেন আকবর আলি। 'কতোবার মানা করেছি, গাড়ি চালানোর সময় এতো জোরে ক্যাসেট বাজাবি না!' ভুলে গেলেন পুলিশের সামনে একথা বলা ঠিক হচ্ছে না, কারণ তাঁর মেয়ের ড্রাইভিং লাইসেন্সই নেই, ওই বয়সে পাওয়া যায় না। গোপনে চালায়। 'গান না ছাই! ধুড়ুম ধুড়ুম ঢাকের শব্দ আর চেঁচামেচি, আফ্রিকার জংলীরাও এই কাণ্ড করে না। কি যে শোনে আজকালকার ছেলেমেয়েগুলো! মাথা ধরে গিয়েছিলো আমার! ওই চেঁচামেচিতেই সব ভুলে গিয়েছিলাম, বাক্স ফেলে এসেছি গাড়িতে। নইলে কি আর ঈগলটা খোয়াতাম!'

'দুর্লভ জিনিস তো,' তাঁকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে সহানুভূতির সুরে বললো কিশোর, 'টাকা দিয়েও সব সময় পাওয়া যায় না। এসব জিনিস হারিয়ে গেলে কষ্টটা সে জন্যেই বেশি পায় সংগ্রহকারী।'

'কিশোর,' মুসা বললো, 'গাড়ির ভেতরের জিনিস চুরি করার জন্যেই কি তাহলে কাঁচ ভাঙে?'

মাথা নাড়লো কিশোর। 'আমার তা মনে হয় না।'

'আমারও না,' মাথা নাড়লো কচি। 'কারণ আমাদের গাড়ি থেকে একবারও কিছু চুরি যায়নি। চুরি যাওয়ার মতো অবশ্য কিছু ছিলোও না ভেতরে।'

'তাহলে কাঁচ ভাঙার আর কি কারণ থাকতে পারে?' সানির প্রশ্ন।

'তাই তো, আর কি কারণ?' প্রশ্নটা ডলিরও। 'আমার তো বিশ্বাস চুরিই এর একমাত্র কারণ। সঙ্ঘবদ্ধ কোনো দলের কাজ।'

'না আমারও মনে হয় না চুরি এর কারণ,' সার্জেন্ট আজিজ বললেন। 'তোমাদেরটা বাদে আর কোনো গাড়ি থেকেই কোনো কিছু চুরি যায়নি। রিপোর্ট করেনি কেউ। এমন কতোগুলো গাড়িরও কাঁচ ভেঙেছে যেগুলোর দরজা লক করা ছিলো না। যদি আর কোনো উদ্দেশ্য না থাকে, তাহলে বলতে হবে এটা স্রেফ শয়তানী।'

'কি জানি,' কথাটা মানতে পারলো না কচি। 'শয়তানী করলে তো কোনো দুষ্টু ছেলের কাজ হতো। তাহলে কি ধরে ফেলতে পারতেন না এতোদিনে?'

'ঠিকই বলেছো,' একমত হলো কিশোর। 'ম্যাপে যা দেখলাম, তাতে মনে হয়, বেশ হিসেব করে এককেখানে গিয়ে এককেবার কাঁচ ভাঙে। এটা দুষ্টু ছেলের কাজ হতে পারে না। তাছাড়া সব দিন নয়, ভাঙে দুটো বিশেষ দিনে, সোম আর বুধবার।'

'তাই নাকি?' অবাক মনে হলো সাব-ইন্সপেক্টরকে। 'এটা তো খেয়াল করিনি!'

ছয়

পরদিন সকাল আটটায় ড্রইং রুমে এসে বসলো তিন গোয়েন্দা। আরিফ সাহেব আগে থেকেই আছেন। কচিও এলো। তাকে আসতে বলে দিয়েছিলো কিশোর।

'মামা, একটা কাজ করে দেবে?' ভূমিকা না করে সরাসরিই বললো কিশোর।

'কি কাজ?' খবরের কাগজ থেকে মুখ তুললেন আরিফ সাহেব।

'থানায় গিয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে চাই। কাঁচ ভাঙার রাতে রাস্তায় ডিউটি ছিলো যাদের, তাদের কয়েকজনের সঙ্গে।'

এক মুহূর্ত ভাবলেন আরিফ সাহেব। তারপর মাথা ঝাঁকালেন, 'হুঁ, তা অবশ্য করা যায়। গুলশান থানার ওসিকে ফোন করে বলতে পারি। ব্যবস্থা করে দেবে। কখন যেতে চাস?'

'পারলে এখনই।'

'আচ্ছা দেখি।'

পনেরো মিনিট পর রিসিভার রেখে দিয়ে ফিরে তাকালেন আরিফ সাহেব। মৃদু হেসে বললেন, 'হয়ে গেছে। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। ওসি কথা দিয়েছে, আমার চিঠি দেখালেই সহযোগিতা করবে পুলিশ।'

আরও আধঘন্টা পর বেরিয়ে পড়লো ওরা। বাসে করে উত্তরা থেকে বনানীতে এসে নামলো।

ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে কিশোর বললো, 'যেসব রাস্তায় কাঁচ ভেঙেছে, ওসব জায়গায় সোমবার কিংবা বুধবারে যাদের ডিউটি ছিলো তাদেরকে জিজ্ঞেস করবো। গত হপ্তার খবর নিলেই হবে।'

'কিন্তু জিজ্ঞেসটা করবো কি?' মুসার প্রশ্ন।

'অস্বাভাবিক কিছু দেখেছে কিনা। কাকে কাকে দেখেছে, কি রকম লোক, এসব।'

'মনে আছে কিনা ওদের কে জানে!' রবিন বললো। 'প্রশ্নগুলো সব তুমিই করো। আমরা তো বাংলা ভালো বলতে পারি না।'

থানায় ঢুকে পরিচয় দিয়ে ওসি কথা জিজ্ঞেস করতেই তাঁর ঘরে ওদেরকে নিয়ে এলেন একজন ডিউটিরত পুলিশ। আরিফ সাহেবের চিঠি তাঁকে দেখালো কিশোর। ব্যবস্থা মোটামুটি তিনি আগেই করে রেখেছেন।

একজন তরুণ পুলিশ কনস্টেবলের সাক্ষাৎকার নেয়া হলো প্রথম।

'ওই কাঁচ ভাঙা?' মাথা নাড়লেন কনস্টেবল। 'নাহ্ কিচ্ছু দেখিনি। দেখলে তো ধরেই ফেলতাম। সন্দেহজনক মনে হয়নি কাউকে। অযথা সময় নষ্ট করেছি, বুঝলে। আসল চোর-ডাকাত ধরা বাদ দিয়ে কতগুলো দুষ্টু ছেলের পেছনে লেগেছি।'

'দুষ্টু ছেলেই, আপনি শিওর?' কিশোরের প্রশ্ন।

'তাছাড়া আর কি? দেখো, চাকরিতে ঢুকেছি সাত বছর হয়ে গেছে। শয়তান লোক তো আর কম দেখলাম না...'

'আচ্ছা, কাকে কাকে দেখেছেন, মনে আছে? অনেক লোক?'

'রাস্তা যখন, লোক তো দেখবোই। আসছে যাচ্ছে, আসছে যাচ্ছে, কেউ দাঁড়ায়নি। কোনো গাড়ির দিকে ইট-পাথর ছুঁড়ে মারেনি কেউ, হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি মেরে কাঁচ ভাঙেনি...'

'যাদেরকে দেখেছেন, তাদের কারও চেহারা মনে আছে?'

'নিশ্চয়ই আছে। অনেকেরই। সাত বছর কাটিয়ে ফেলেছি, এখন একটা প্রমোশন দরকার আমার। কাজেই ডিউটিতে ফাঁকি দিই না। আর আমার স্মরণশক্তি খুব ভালো, কাউকে একবার দেখলে সহজে ভুলি না...'

'দাঁড়ান দাঁড়ান, লিখে নিই।' পকেট থেকে তাড়াতাড়ি নোটবুক বের করলো কিশোর।

নোটবুকের দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন হঠাৎ কনস্টেবল, অযথাই কেশে গলা পরিষ্কার করলেন, ফালতু কথা আর বলা চলবে না বুঝে গেছেন। কারণ বক্তব্য লেখা হয়ে যাচ্ছে খাতায়। আর সেটা যদি ওসি সাহেব দেখেন...সতর্ক হয়ে কথা বললেন এবার তিনি, 'দাঁড়াও মনে করি। সে রাতে যে রাস্তায় পাহারা দিয়েছি, সেটাতে বিদেশীদের বাড়ি-ঘর বেশি। বেশির ভাগই

এমব্যাসিতে চাকরি করে। একজন আমেরিকান মহিলাকে দেখলাম দামী একটা গাড়ি নিয়ে এসে এক বাড়ির সামনে রাখলো। বেশ কিছুক্ষণ বসে রইলো। তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো আরেক মহিলা। গাড়িতে উঠলো। চলে গেল ওরা। এরপর···এরপর, হ্যাঁ এরপর এলো আরেক বিদেশী মহিলা। হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলো বোধহয়। সাথে একটা কুকুর। এমন পাজি জানোয়ার, আমার হলে পিটিয়ে পাছার চামড়া তুলে ফেলতাম। যেটা দেখে সেটাই শোঁকে, এখানে লাফ দিয়ে ওঠে, ওখানে লাফ দিয়ে ওঠে···চলে গেল ওরা। তারপর এলো একটা রামছাগল···'

'রামছাগল?'

'আরে মানুষই। ছাগলের মতো স্বভাব আরকি। ওই যে দেখেছো না রাস্তায়, কতগুলো ছেলেছোকরা আছে, চুলের ঠিক নেই, কাপড়ের ঠিক নেই, কি যে পরে আর কি যে করে···ছাগল না ওগুলো? তেমনি একটা আরকি। তোমার তো আরো ভালো জানার কথা। একটা বিদেশী সাইকেলে চড়ে এলো। মাথায় ক্যাপ, চোখে কালো চশমা···আরো দেখো কাণ্ড! পিঠে বস্তার মতো একটা ব্যাগ, সেটার ভেতরে বোধহয় ওয়াকম্যান-টোয়াকম্যান ছিলো, কানে হেডফোন। অনেক দেশেই গাড়ি কিংবা কিছু চালানোর সময় ওসব ব্যবহার করা নিষেধ, অ্যাকসিডেন্ট করে বলে, আমাদের দেশেও মানা করে দেয়া উচিত···এই যে দেখো না, লাকজারি কোচগুলো, সারারাত ধরে চলে। দিনেও চলে। কানের পোকা বের করে দিয়ে সারাক্ষণ ওগুলোর মধ্যে হিন্দি ছবির গান বাজে। ভিসিআর চলে। মাঝে মাঝে ড্রাইভারও গুনগুন করে গলা মেলায়, মাথা দোলায়, অসতর্ক হয়ে যায়। আর অসতর্ক হলেই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে···'

'তা ঠিক,' এক মত হলো মুসা। 'সব যাত্রী তো ওসব পছন্দও করে না। নিশ্চয় অসুবিধা হয়। তো, আর কাকে দেখেছেন?'

'দেখেছি তো অনেককেই। তবে মনে রাখার মতো কাউকে নয়।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে,' নোটবুক বন্ধ করতে করতে বললো কিশোর।

'তোমাকেও ধন্যবাদ। অযথা কষ্ট করছো, বুঝলে। সব দুষ্টু ছেলেদের কাজ।'

'দেখা যাক, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কি বেরোয়?' হেসে বললো গোয়েন্দাপ্রধান।

এরপর কথা হলো সেই সার্জেন্ট আবদুল আজিজের সঙ্গে, সে রাতে যাঁর সাথে দেখা হয়েছিলো তিন গোয়েন্দার। হেসে স্বাগত জানালেন ছেলেদেরকে। 'আমার ওপরই তাহলে গোয়েন্দাগিরি চালাতে এসেছো। ভালো। তো কি জানতে চাও?'

'গত হপ্তায় তো সাত নম্বর রোডের কাছে ডিউটি ছিলো আপনার। কাউকে কাঁচ ভাঙতে দেখেননি। একটা কথা বলুন তো, ওই রোডে এমন কাউকে চোখে পড়েছে, যার আচরণ সন্দেহজনক মনে হয়েছে?'

'তাহলে তো ধরতামই। অন্তত জিজ্ঞেস তো করতাম, ওখানে কি করছে? না, সে রকম কাউকে চোখে পড়েনি।'

'লোকজন, গাড়ি; নিশ্চয় অনেক গেছে। এমন কাউকে চোখে পড়েছে, যার কথা মনে আছে এখনও আপনার?'

'উঁ! গাল চুলকালেন সার্জেন্ট, মনে করার চেষ্টা করছেন। 'কিছু কিছু আছে। লাল একটা টয়োটা করোলাতে করে গেছেন দুজন বিদেশী ভদ্রলোক। একটা ধূসর ফোক্স ওয়াগেন চালিয়ে গেছে দাড়িওয়ালা এক লোক। সম্ভবত ড্রাইভার। খবরের কাগজের এক হকার ঢুকেছিলো এক বাড়িতে, বোধহয় বিলটিল নিতে। দুজন বয়স্কা মহিলা হেঁটে গেছেন, সাথে একটা ছেলে। ছেলেটার হাতে গুলতি ছিলো। একজন মহিলা গেছেন, সাথে একটা কুকুর নিয়ে…'

'মহিলার হাতে একটা লাঠি ছিলো, না?'

মাথা নাড়লেন আবদুল আজিজ, 'না, কিছুই ছিলো না। শেকল ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন কুকুরটাকে।'

'বিদেশী?'

'হ্যাঁ, বিদেশী।'

'কুকুরটার রঙ সাদা, তার মধ্যে কালো ছোপ, তাই না?'

'না। সারা শরীর ধূসর।'

নিরাশ মনে হলো কিশোরকে। 'না, তাহলে যার কথা বলছি সে না। আচ্ছা, আর কাকে দেখেছেন?'

'বয় স্কাউটের পোশাক পরা দুটো ছেলে। লম্বা চুলওয়ালা হিপ্পি মার্কা এক তরুণ। টেন-স্পীড সাইকেলে করে গেছে আরেক তরুণ, মাথায় ক্যাপ, চোখে চশমা। পিঠে ব্যাকপ্যাক, তাতে ওয়াকম্যান ছিলো, কানে লাগানো হেডফোন দেখেই বুঝেছি। মোটর সাইকেলে চড়ে গেছে তিনজন, তাদের কোন কিছুই চোখে পড়ার মতো নয়। চারজন বয়স্ক লোক গেছেন জগিং করতে করতে, সবার গায়েই গেঞ্জী, তিনজনের পরনে ফুল প্যান্ট, একজনের হাফ…ফকির-টকির আর সাধারণ কিছু লোক পায়ে হেঁটে গেছে, তাদের কথা মনে রাখার প্রয়োজন বোধ করিনি…'

একজন হাবিলদারের সাক্ষাৎকার নিতে গেল তারপর ওরা।

'কিছুই ঘটেনি,' জবাব দিলেন হাবিলদার। 'চোখে পড়ার মতো কিচ্ছু না। যা জিজ্ঞেস করার তাড়াতাড়ি করো। আমার ডিউটি আছে।'

'জানি, কাঁচ ভাঙতে কাউকে দেখেননি সন্দেহজনক কাউকে দেখেছেন?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'না।' ঘড়ি দেখলেন হাবিলদার।

'আচ্ছা,' তাড়াতাড়ি বললো কিশোর। 'কাকে কাকে দেখেছেন সে রাতে? মানে, চোখে পড়ার মতো?'

'অনেককেই।'

'খুলে বলবেন?'

আরেকবার ঘড়ি দেখলেন হাবিলদার। 'পুরানো একটা টয়োটা পিকআপ ট্রাক ঢুকতে দেখেছি। পেছনে কতগুলো ছেলে হই-হট্টগোল করে গান গাইছিলো। পিকনিক-টিকনিকে গিয়েছিলো বোধহয়। গলির প্রায় শেষ মাথায় গিয়ে একটা বাড়ির সামনে থামলো গাড়িটা। কয়েকটা ছেলে নেমে যাওয়ার পর বেরিয়ে গেল। আরও অনেককেই দেখেছি।' টেবিল থেকে ক্যাপ তুলে নিলেন তিনি।

'আরও দু-চারজনের কথা বলুন, প্লীজ!'

'মোটর সাইকেল নিয়ে তিনটে ছেলেকে যেতে দেখেছি। পাশাপাশি চলেছিলো। নিশ্চয় বন্ধু। গাড়ি গেছে কয়েকটা। তবে মনে রাখার মতো একজনই গেছে।'

'সে কে? আগ্রহে সামনে ঝুঁকে এলো কিশোর।

'দেখে তো মনে হলো পাগলা গারদ থেকে বেরিয়েছে। একটা সাইকেলে করে এলো। মাথায় টুপি, চোখে কালো চশমা, পিঠে ব্যাগ, কানে হেডফোন···শাঁই শাঁই করে চলে গেল। একবার ভেবেছি, থামাবো। তারপর ভাবলাম মরুকগে। আমার কি?' তৃতীয়বার ঘড়ি দেখলেন হাবিলদার। 'চলি, আর থাকতে পারছি না। আর কিছু জানার থাকলে অন্য সময় এসো, যখন আমার বাইরে ডিউটি থাকবে না।'

ফাইলে মুখ গুঁজে ছিলেন সাব-ইন্সপেক্টর হাফিজ আলি। ছেলেরা অফিসে ঢুকতে সাড়া পেয়ে মুখ তুললেন। হেসে বললেন, 'আরে, তিন গোয়েন্দা যে। এসো এসো।'

টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালো কিশোর। 'স্যার, আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিলো···'

'বসো,' চেয়ার দেখিয়ে দিলেন সাব-ইন্সপেক্টর। 'জানি। ওসি সাহেব বলেছেন। খুব বেশি সময় দিতে পারবো না কিন্তু···'

'বেশি সময় লাগবে না।'

'বলো, কি জানতে চাও?'

সাত

'নিশ্চয় সাইকেলওয়ালা!' টেবিলে চাপড় মারলো মুসা।

'ঠিক!' তার সঙ্গে সুর মেলালো রবিন। 'টুপি, গগলস, ব্যাকপ্যাক, হেডফোন!'

'চারজন পুলিশকে জিজ্ঞেস করেছি আমরা,' একমত হলো রবিনও। 'চারজনেই ওকে দেখেছে। আমরা দুবার পাহারা দিয়েছি। দুবারই দেখেছি।'

আলোচনা হচ্ছে বসার ঘরে। পুলিশদের কাছ থেকে নতুন কিছুই জানতে পারেনি ওরা।

'তবে,' কিশোর বললো, 'কেউই তাকে কিছু করতে দেখেনি। আমরাও না।'

'না, তা দেখেনি,' সায় দিলো অন্য তিন জনেই।

'একটা ব্যাপার কিন্তু সন্দেহজনক,' আবার বললো কিশোর। 'তাকে বিভিন্ন রাস্তায় দেখা গেছে। রাতের বেলা। মোটামুটি একটা বিশেষ সময়ে। ওটা লোকের বাড়ি ফেরার সময়, বেরোনোর নয়। হতে পারে তার বাড়ি ওই এলাকায়। একেক দিন একেক রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরে। কতো লোকেরই তো কতো স্বভাব থাকে।'

'তারমানে বলতে চাইছো,' নিরাশ মনে হলো মুসাকে, 'ব্যাপারটা কাকতালীয়?'

'একবার দুবার কাকতালীয় হতে পারে। কিন্তু এতোবার···বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। তাকে জানালা ভাঙতে দেখা যায়নি, তারমানে এই নয় যে সে ভাঙেনি। সন্দেহ থেকে বাদ দেয়া যায় না।'

'তোমার ধারণা,' রবিন বললো, 'পুলিশ দেখেই সতর্ক হয়ে যায় সে? ওই রাস্তায় আর না ভেঙে অন্য যেখানে পাহারা নেই সেখানে গিয়ে ভাঙে?'

'অসম্ভব কি?'

'আমরা পাহারা দেয়ার সময়ও ভাঙেনি,' মুসা বললো। 'তাহলে কি আমাদেরও দেখেছে?'

'দেখে থাকতে পারে। ভাঙতে এলে তা সাবধান হয়েই আসে। দেখেশুনে নেয় সব। আমরা যে ঝোপের আড়ালে লুকিয়েছি, সেটা তেমন ঘন নয়। ভালো মতো তাকালে যে কারোই চোখে পড়তে পারে।' এক মুহূর্ত চুপ করে থাকলো কিশোর। তারপর বললো, 'এখন আমাদের বড় সন্দেহ ওই সাইকেলওয়ালা। তাকে অপরাধী প্রমাণ করতে পারলেই হয়।'

'কি করে করবো?' মুসা জিজ্ঞেস করলো।

'ভাবছো কিছু?' রবিনের প্রশ্ন।

কিশোর জবাব দেয়ার আগেই কচি বললো, 'কিন্তু ও-ই যদি ভেঙে থাকে, তাহলে আমি দেখলাম না কেন? মানে, আমি তো চোখ রেখেছিলাম। কাঁচ ভাঙতে হলে কোনো কিছু দিয়ে বাড়ি মারতে হবে। গাড়ির কাছে থামতে হবে। কোনোটাই করেনি সে। এমন কি যে রাতে কাঁচ ভাঙার শব্দ শুনেছি, সে রাতেও তাকে দেখিনি।'

কিশোরের দিকে তাকালো রবিন। 'সাইকেল না থামিয়ে কি করে কাঁচ ভাঙা যায় কিশোর?'

'কিংবা নাহয় থামলোই,' মুসা বললো। 'কিন্তু কারো চোখে না পড়ে কি ভাবে ভাঙে? কি দিয়ে? অদৃশ্য মানব হয়ে যায় নাকি?'

'অবাস্তব কোনো কিছু ঘটে না নিশ্চয়ই,' কিশোর বললো। 'সেটা সম্ভবও নয়।' কচির দিকে তাকালো সে। 'সে রাতে কাঁচ ভাঙতে শুনেছো তুমি, গাড়ির কাছে

কাউকে দেখোনি। হতে পারে তুমি বেরোতে বেরোতে তোমার চোখের আড়াল হয়ে গিয়েছিলো সে। এমন কিছু কি চোখে পড়েছে তোমার যা মনে করতে পারছো না?'

চোখ আধবোজা করে ভাবার চেষ্টা করলো কচি। 'পিকআপের কাছে কাউকে দেখিনি···রাস্তায়ও না···' হঠাৎ সোজা হয়ে বসলো সে। 'দাঁড়াও দাঁড়াও, একটা নড়াচড়া বোধহয় দেখেছি! গাড়ির সামনে! দূরে! রাস্তায়!'

'কি ধরনের নড়াচড়া?'

'বলতে পারবো না। মনে করতে পারছি না। মনে হলো যেন পলকের জন্যে দেখেছি।'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'হয় এরকম। অনেক কিছুই দেখি আমরা যা মনে রাখার চেষ্টা করি না। ফলে ভুলে যাই। নড়াচড়াটা হয়তো কোনো সাইকেলেরই দেখেছো। কিন্তু যেহেতু কাঁচ ভাঙার সাথে সাইকেলের কোনো সম্পর্ক নেই, অন্তত তখন আমার মনে হয়নি, ওটার কথা মনে রাখার চেষ্টা করোনি তুমি। অথচ দেখেছো ঠিকই। একে বলে সাইকোলজিক্যাল ইনভিজিবিলিটি।'

'এতো দ্রুত যদি চলেই গিয়ে থাকে,' রবিন প্রশ্ন তুললো, 'তার মানে কাঁচ ভাঙার জন্যে থামেনি সে। চলন্ত সাইকেল থেকে কি করে ভাঙলো?'

'ঠিক বলতে পারবো না। তবে একটা আইডিয়া আসছে মাথায়। দেখি, পুলিশের সঙ্গে আবার কথা বলতে হবে। কচি, তোমাদের পিকআপটাও পরীক্ষা করতে চাই।'

'করবে। যখন খুশি।'

'কিন্তু কিশোর,' রবিন বললো, 'সাইকেলওয়ালা যে কাঁচ ভাঙে, এটা প্রমাণ করবে কি করে? অবশ্য যদি ও-ই ভেঙে থাকে।'

'হাতেনাতে ধরবো। আবার ভূত-থেকে-ভূতে ব্যবহার করে।'

'মানে, শহরের সমস্ত ছেলেমেয়েকে হুঁশিয়ার করে দেবে চোখ রাখার জন্যে?' মুসা বললো।

'হ্যাঁ, তাই করবো। কিছু তথ্য এখন আমাদের হাতে আছে। ওদেরকে পরিষ্কার করে বলতে পারবো, কার ওপর চোখ রাখতে হবে। এতোগুলো চোখের কড়া নজর এড়িয়ে নিরাপদে কিছুতেই কাজ সারতে পারবে না সে।'

'যদি সে আগেই জেনে না যায় যে চোখ রাখা হচ্ছে,' মুসা বললো। 'যে ভাবে জেনে যায় পুলিশ নজর রাখছে। এক্সরে ভিশন না তো তার? কিংবা ইনফ্রা-রেড চোখ, যে অন্ধকারেও দেখবে! কে জানে হয়তো অলৌকিক কোনো ক্ষমতা আছে। শুনেছি এদেশে নাকি ওরকম ক্ষমতাশালী লোকের অভাব নেই, অনেক পীর-ফকির আছে···'

'ওসব কিছু না। অন্য কোনো ভাবে জানে। বাস্তব, সহজ কোনো উপায়ে।

রাতেও চোখে কালো চশমা পরে, উদ্ভট চেহারার জিনিস। আমার এখন সন্দেহ হচ্ছে, ওটা ফীল্ড গ্লাস। ওকে হাতেনাতে ধরতে পারলেই জেনে যাবো সেটা। কিন্তু মুশকিল হলো সেটা জানার জন্যে আগামী সোমবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাদেরকে। তার আগে আঘাত হানবে না সে।'

'ভালোই হয়েছে,' মুসা বললো। 'ঘোরার সময় পেলাম। করিমদের বাড়িতে দাওয়াত খাবো, রাত কাটাবো। ও বললো এদেশে গাঁয়ের বাড়িতে রাতে থাকার মজাই নাকি আলাদা, বিশেষ করে শীতকালে। দেখে আসবো সেটা।'

'আমার পক্ষে যাওয়া বোধহয় সম্ভব হবে না,' কচি বললো। 'অনেক কাজ। আমি ফার্মে না থাকলে অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। বাবা একা কদিক সামলাবে?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক,' মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'তোমাকে আটকাবো না। তবে আমাদের সঙ্গে যেতে পারলে ভালো হতো। থাক, অসুবিধে হবে না। করিম পথঘাট চেনে। তো, এখন কি তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে? পিকআপটা দেখতাম।'

'চলো।'

উঠতে যাবে ওরা, এই সময় বাজলো টেলিফোন। মামা-মামীর কারো হবে মনে করে রিসিভার তুললো কিশোর, 'হ্যালো।'

'ইয়ে,' পরিচিত একটা কণ্ঠ, অস্বস্তি বোধ করছে বোঝা যায়, 'আরিফ সাহেবের বাসা?'

'হ্যাঁ।'

'কিশোর পাশা আছে?'

অবাক হলো কিশোর। 'বলছি।'

'ও, কিশোর। আমি সানি। আকবর সাহেবের ভাতিজা। কাল রাতে আমাদের বাসার সামনে দেখা হয়েছিলো।'

'হ্যাঁ, মনে আছে। কি ব্যাপার?'

'ডলির মুখে তোমাদের সুখ্যাতি শুনে শুনে চাচার ধারণা হয়েছে, চেষ্টা করলে তোমরা হয়তো তাঁর ঈগলটা খুঁজে বের করে দিতে পারবে। তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে বললেন আমাদের। তা ফিস কত্তো তোমাদের?'

'ফিস-টিস নিই না আমরা। মানুষকে সাহায্য করতে পারলে, রহস্য আর সমস্যার সমাধান করে দিতে পারলেই খুশি।'

'তাই নাকি? ভালো কথা। চাচাকে বলবো। এখন কি একবার আসতে পারবে? ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা যেতো। টেলিফোনে তো সব কথা বলা যায় না...'

'এখুনি?' এক মুহূর্ত ভাবলো কিশোর। 'বেশ আসছি।'

'বাসা চিনবে তো?'

'নিশ্চয়। রাখলাম।'

আট

বাড়িটা বিশাল। সেদিন রাতের বেলা ঢুকেছিলো গোয়েন্দারা, ভালোমতো দেখতে পারেনি, এখন দেখলো। ভেতরে প্রচুর গাছপালা। গাড়ি বারান্দায় নতুন মডেলের একটা হোণ্ডা সিভিক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো ওরা। গ্যারেজে আরেকটা গাড়ি আছে। অনেক পুরানো। গায়ে ধুলো জমে আছে পুরু হয়ে। কোন আদ্যিকাল থেকে ওটা ওখানে পড়ে আছে কে জানে। হুড আর উইণ্ডশীল্ড ক্যানভাসে ঢাকা।

গাছপালার ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেছে খোয়া বিছানো পথ। গাছের কারণে সামনের দরজাটা প্রায় চোখেই পড়ে না।

কাছে এসে কলিং বেলের সুইচ টিপলো কিশোর। দরজা খুললো না।

'এখুনি আসতে বলেছিলো?' দরজা খুলছে না দেখে সন্দেহ হলো মুসার। 'ঠিক শুনেছো?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলো কিশোর।

হঠাৎ বাড়ির অনেক ভেতর থেকে শোনা গেল রেগে যাওয়া কণ্ঠস্বর। দ্রুত আরও কয়েকবার সুইচ টিপলো কিশোর। দরজা এবারও খুললো না, তবে কথা থেমে গেল।

'বেলটাই বোধহয় কাজ করে না,' রবিন বললো।

'পাশে ঢোকার অন্য দরজা থাকতে পারে,' মুসার অনুমান।

আবার রাস্তায় ফিরে এসে আশেপাশে উঁকি দিতে লাগলো ওরা। গ্যারেজটা যে পাশে সে পাশে আর কোনো দরজা দেখা গেল না।

'ওটা কি?' অদ্ভুত একটা জিনিসের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা। পাশের খোলা চত্বরে চিত হয়ে আছে চার ফুট চওড়া একটা ধাতব জিনিস। দেখতে পিরিচের মতো। নিচে তিনটে পা। আকাশের দিকে পেট।

'স্যাটেলাইট ডিশ,' কিশোর বললো।

'মহাকাশের স্যাটেলাইট থেকে পাঠানো সঙ্কেত ধরে,' জানালো রবিন। 'টেলিভিশন আর রেডিওর সঙ্কেত গিয়ে স্যাটেলাইটে ধাক্কা খেয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে। আর আসে বলেই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে অনেক দূর থেকে পাঠানো টেলিভিশনের ছবি দেখি, রেডিও শুনতে পাই আমার। এখানকার আইন জানিনে, তবে আমেরিকায় এই ডিশের মাধ্যমে সঙ্কেত ধরে টিভি দেখলে কিংবা রেডিও শুনলে কেব্‌ল্‌ কোম্পানিকে পয়সা দিতে হয় না। খরচ বাঁচে।'

কিশোর বললো, 'এখানে ওরকম কোন কোম্পানি নেই। রেডিও, টিভি দুটোই সরকারী। লাইসেন্সের খরচ দিতেই হবে।'

'তাহলে এটা রেখেছে কেন?' মুসার প্রশ্ন।

'হয়তো এমনি। কিংবা ওটাকে অ্যান্টেনা হিসেবে কাজে লাগায়। কোনো সময়

আমেরিকায় ছিলেন হয়তো ভদ্রলোক, তখন কিনেছিলেন, আসার সময় নিয়ে এসেছেন সাথে করে।'

'মনে হয়,' একমত হলো রবিন।

আবার কথা শোনা গেল। মুসা বলে উঠলো, 'খান সাহেবের গলা না?'

ঘরের ভেতর থেকেই এসেছে বোধহয় কথা, মানুষটাকে দেখা যাচ্ছে না।

'এই যে, এসে গেছো, এসো!' বাড়ির সামনের দিক থেকে শোনা গেল আরেকটা কণ্ঠ। তাড়াতাড়ি আবার সামনের দরজার কাছে চলে এলো ছেলেরা। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সানি। কেমন যেন দ্বিধান্বিত। 'এসো,' আবার বললো সে।

'কয়েকবার বেল বাজালাম,' বাড়ির পাশে চলে যাওয়ার কৈফিয়ত দিলো কিশোর, 'কেউ খুললো না। ওদিকে আর কোনো দরজা-টরজা আছে কিনা দেখতে গিয়েছিলাম।'

'সরি,' সানি বললো। 'পেছন দিকে ছিলাম আমরা। চাচার সঙ্গে কথা বলছিলাম। বেল শুনিনি।'

ওদের নিয়ে ঘরে ঢুকলো সে। বাড়িটা পুরানো, কিন্তু ঝকঝকে তকতকে। গুলশান-বনানীর আর দশটা আধুনিক বাড়ি থেকে আলাদা, অনেকটা পুরানো ঢাকার বাড়ির মতো।

'চাচার শরীরটা ভালো নেই আজ,' সানি বললো। 'শুয়ে আছেন। আমাকেই তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে বললেন। ওই ঈগলটা খুঁজে দেয়ার ব্যাপারে আর কি।'

'আসলে,' রবিন বললো, 'এই কেসে ইতিমধ্যেই জড়িয়ে গেছি আমরা। কে কাঁচ ভাঙে ধরার জন্যে কচিকে সাহায্য করছি।

'তাই তো। ভুলেই গিয়েছিলাম।'

'নতুন একটা আঙ্গিক যখন পাওয়া গেল,' কিশোর বললো, 'এদিক থেকেও তদন্ত চালাতে পারি আমরা। হয়তো ঈগল খুঁজতে গিয়েই কাঁচ যে ভাঙে তাকে ধরে ফেলতে পারবো। চুরি যখন করেছে, নিয়ে গিয়ে নিশ্চয় বিক্রিরও চেষ্টা করবে।'

'কি করে?' মুসা বললো। 'এতো দামী জিনিস বেচবে কার কাছে? সাধারণ লোকে কিনবে না। টাকা এবং শখ দুটোই যার আছে সে ছাড়া। আর এখন কেনার ঝুঁকিও নিতে চাইবে না কেউ সহজে। চুরির খবর জেনে ফেলেছে অনেকে। এতো টাকা দিয়ে কিনে পুলিশের ঝামেলায় কেউ পড়তে চাইবে না।'

'এসব জিনিস যারা সংগ্রহ করে তাদেরকে চেনো না তুমি, মুসা,' কিশোর বললো। 'কিছু লোক আছে, যারা রীতিমতো পাগল হয়ে যায়। হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। যে-কোনো ঝুঁকি নিয়ে বসে। জোগাড় করে লুকিয়ে রেখে দেয়। শুধু নিজে দেখে, কাউকে দেখতেও দেয় না।'

মাথা ঝাঁকালো সানি। 'ও ঠিকই বলেছে। আর এদের টাকাও থাকে প্রচুর।

নইলে একটা মুদ্রার জন্যে এতো টাকা কি করে খরচ করবে বলো।'

'তবে,' মুসার কথার খেই ধরলো কিশোর, 'এটা আমেরিকা নয়। এখানে ওরকম সংগ্রহকারী দু-চারজনও আছে কিনা সন্দেহ। মুদ্রাটা বিক্রি করতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'খুব কঠিন হবে।'

'আচ্ছা, মুদ্রা, স্ট্যাম্প ঢাকায় যারা সাপ্লাই দেয়, তাদের নিশ্চয় চেনেন আপনারা। নাম-ঠিকানা বলুন, ওদের ওপর চোখ রাখবো আমরা।'

'আমি?' অস্বস্তি ফুটলো সানির চোখে। চুলে হাত চালাতে চালাতে মাথা নাড়লো। 'নাহ্, আমি চিনি না। ওসব চাচার ব্যাপার। খুব কমই নাক গলাই আমি।'

'তাহলে তাঁকেই জিজ্ঞেস করা দরকার।'

চোখ মিটমিট করলো সানি। 'চাচাকে?...ঠিক আছে, করতে পারবে। আগে তোমাদেরকে কাজে নিয়োগ করুক...' হাতের ঘড়ির দিকে তাকালো সে। 'আরিব্বাবা...

তার দিকে একটা মুহূর্ত স্থির তাকিয়ে রইলো কিশোর। তারপর ঘরে চোখ বোলালো। 'আপনার চাচার নিশ্চয় আরও মুদ্রা আছে। দেখা যাবে? এখানে তো একটাও দেখছি না।'

'এখানে রাখে না। পড়ার ঘরে।' আবার ঘড়ি দেখলো সে।

'দেখা যাবে?'

'দেখবে? ঠিক আছে, এসো।'

লিভিং রুম, তারপর আরেকটা বড় হলঘর পার করিয়ে ওদেরকে পেছনের একটা দরজার কাছে নিয়ে এলো সানি। চাবির গোছা থেকে একটা বেছে নিয়ে তালা খুললো। ঘরটা ছোট। লাল রঙের পুরু কার্পেট বিছানো। মেহগনি কাঠের ভারি ভারি আসবাব। শেলফগুলো বইয়ে ঠাসা। একধারে সুন্দর করে সাজানো পায়া লাগানো অনেকগুলো সুদৃশ্য কাঁচের বাক্স। ভেতরে গাঢ় নীল মখমলের বিছানায় যেন ঘুমিয়ে রয়েছে নানারকম মুদ্রা।

একটা বাক্স দেখিয়ে সানি বললো, 'ওটাতে আমেরিকান মুদ্রা। ডাবল ঈগল আরেকটা আছে ওতে, দেখো। যেটা চুরি গেছে সেটারই মতো। তবে এটার দাম চুরি যাওয়াটার তুলনায় কিছুই না।'

গা ঘেঁষাঘেঁষি করে মাথা নিচু করে এসে বাক্স ঘিরে দাঁড়ালো তিন গোয়েন্দা। নীল মখমলে শুয়ে আছে সোনার মুদ্রাটা। চকচক করছে। একটা রুপার টাকার প্রায় সমান মুদ্রাটার এক পিঠে একটা উড়ন্ত ঈগল ছাপ মারা। ভোরের আকাশে ডানা মেলে দিয়েছে। সূর্য উঠছে সবে, ছড়িয়ে পড়েছে সূর্যরশ্মি।

'কতো পুরানো এটা?' জিজ্ঞেস করলো রবিন। 'উনিশশো নয় সালের,' সানি

জানালো। 'তারিখটা অন্য পিঠে। একই রকম সুন্দর, অথচ দাম মাত্র আট হাজার আমেরিকান ডলার।'

শিস দিয়ে উঠলো মুসা। 'মাত্র! আট হাজার ডলার মাত্র হলো!'

'মাত্র বলেছি যেটা চুরি গেছে তার তুলনায়। দেখতে যেমনই হোক, সেটা আসল কথা নয়, দাম কম-বেশি অন্য কারণে। যেটা যতো বেশি দুর্লভ সেটার দাম ততো বেশি।'

'চুরি যাওয়ার সময় কিসের মধ্যে ছিলো জিনিসটা?' রবিন জিজ্ঞেস করলো।

'কালো চামড়ার একটা গহনার বাক্সে। ওই যে সৌখিন বাক্স আছে না কিছু, মহিলারা আঙটি-টাঙটি রাখে, ওরকম। সিগারেটের প্যাকেটের সমান। ডালার একপাশে দুটো কব্জা লাগানো, আরেক পাশে হুড়কো। বোতাম টিপলেই লাফ দিয়ে উঠে যায় ডালা। ভেতরে এরকমই নীল কাপড়। চাকচিক্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে প্ল্যাস্টিকে মুড়ে রাখা হয়েছিলো।'

সোনার চমৎকার মুদ্রাটার দিকে তাকিয়ে সানির কথা শুনছে তিন গোয়েন্দা। তারপর মুখ তুলে সারা ঘরে চোখ বোলালো কিশোর। নিজেকেই যেন প্রশ্নটা করলো, 'এ ঘরে তো কোনো টিভি দেখছি না?'

'টেলিভিশন দুচোখে দেখতে পারে না চাচা,' হেসে বললো সানি।

'আঙিনায় তাহলে স্যাটেলাইট ডিশ বসানো হয়েছে কেন?'

'ডিশ?' আবার চোখ মিটমিট করলো সে। 'টিভি একটা আছে। গেম রুমে। আমি আর ডলি দেখি। চাচা এখন শুয়ে আছে ওঘরে, নইলে ডিশটা দিয়ে কি কাজ হয় দেখাতাম।'

'ও,' বলে কি বোঝালো কিশোর বোঝা গেল না। 'ঠিক আছে, পরে এসে এক সময় নাহয় দেখবো। তা আপনার চাচাকে জিজ্ঞেস করবেন কি, আমাদেরকে...'

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। হাতে বেত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আকবর আলি। কঠিন দৃষ্টিতে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠলেন, 'এখানে কি?' লাঠিতে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে এলেন তিনি। 'এরপর কোনটা চুরি করবে সেটা দেখতে এসেছো?'

'আপনার ভাতিজাই এঘরে নিয়ে এসেছে আমাদের,' শান্ত কণ্ঠে বললো কিশোর। 'চুরি করে ঢুকিনি। ঈগলটা খুঁজতে গেলে আমাদের জানতে হবে দেখতে ওটা কি রকম। এখন...'

'আমার ঈগল খুঁজবে!' ভুরু কুঁচকে গেল খান সাহেবের। 'ওটার ধারে কাছে ঘেঁষতে দেবো ভেবেছো? বেরোও!'

'কিন্তু, স্যার, আপনার ভাতিজা...' সানিকে দেখালো কিশোর, 'আমাদেরকে ফোন করে ডেকে এনেছে তদন্ত করার জন্যে! আপনিই নাকি আসতে বলেছেন।'

'সানি!' লাল হয়ে গেছে আকবর আলির মুখ। 'ও ডেকে এনেছে! আমি আসতে বলেছি! সানি, তুই যে এতো মিথ্যে কথা বলিস জানতাম না তো!' ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন খান সাহেব। 'আমি কিচ্ছু বলিনি!' বেত তুলে আরেক পা এগোলেন তিনি। ভাতিজাকে বাড়িই মারবেন যেন।

তবে বেতটা যথাস্থানে আঘাত হানার আগেই ঢুকলো ডলি। একটানে বাবার হাত থেকে কেড়ে নিলো ওটা। 'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, আব্বা!'

মেয়ের দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে রইলেন বৃদ্ধ। বললেন, 'তোরা ভাইবোনে মিলে যে কি করছিস বুঝতে পারছি না। থাকগে, বোঝার দরকারও নেই আমার। এই ছেলেগুলোকে বের করে দে এখান থেকে।'

বেতটা মেয়ের হাত থেকে আবার ফেরত নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে গেলেন আকবর আলি। বিরক্ত দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইলো ভাইবোন।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে তিন গোয়েন্দাকে বললো সানি, 'সরি, কিছু মনে করো না। চাচার মন-মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেছে ইদানীং। খিটখিটে হয়ে গেছেন। কথায় কথায় রেগে যান।'

'হ্যাঁ,' ভাইয়ের সঙ্গে সুর মেলালো ডলি, 'আব্বার কথায় কিছু মনে করো না। তোমাদের ডাকতে বলে নিজেই এখন ভুলে বসে আছে। এরপর আবার ডাকতে বললে লিখে দিতে বলবো।'

মাথা ঝাঁকালো সানি। 'হ্যাঁ, তাই করবো। লিখে না দিলে আর ডাকছি না তোমাদেরকে।' গজগজ করে বললো, 'অযথা মানুষকে ডেকে এনে অপমান...'

বাইরে বেরিয়ে খোয়া বিছানো পথ ধরে গেটের দিকে এগোলো তিন গোয়েন্দা।

'আশ্চর্য!' আনমনে বললো কিশোর। 'ডাকতে বলেছেন, সেটাও ভুলে গেলেন? এতো তাড়াতাড়ি?'

'আমার কাছেও অবাক লাগছে ব্যাপারটা,' রবিন মাথা দোলালো।

'পাগল আরকি,' সাফ মন্তব্য করে দিলো মুসা। 'এতো টাকা দিয়ে নইলে একটা সোনার টাকা কেনে?'

গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে এখন আরেকটা গাড়ি, লাল ছোট একটা সুজুকি। চিন্তিত ভঙ্গিতে ওটার দিকে তাকিয়ে থেকে কিশোর বললো, 'যাকগে, ওসব নিয়ে পরে ভাববো। এখন তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। সন্ধ্যার আগেই কচিদের বাড়ি গিয়ে ওদের পিকআপটা দেখতে চাই।'

চারজনে মিলে পিকআপটা পরীক্ষা করলো ওরা। সীটের ওপরে, তলায়, সীটের সামনের মেঝেতে, পিকআপের ছোট কেবিনের ভেতর যত্নে জায়গা আছে, সবখানে।

'কাগজ আটকানোর ক্লিপ দিয়ে নিশ্চয় কাঁচ ভাঙা যায় না।'

সীটের নিচ থেকে একটা ক্লিপ বের করে দেখালো মুসা।

'না,' শুকনো গলায় বললো কিশোর।

'কিংবা কয়েকটা খালি দুধের টিন দিয়ে?' পিকআপের পেছন থেকে টিনগুলো বের করলো রবিন।

'আমি রেখেছি ওগুলো,' হেসে বললো কচি। 'মাঝে মাঝে কাজে লাগে।'

'এটা কি?' জুতোর তলায় চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া মটর দানার চেয়ে ছোট একটুকরো ধাতব জিনিস বের করে দেখালো মুসা।

হাতে নিয়ে দেখলো রবিন। চিনতে পারলো না

কচিও পারলো না।

'যাই হোক,' মুসা বললো। 'বেশি ছোট। এটা দিয়ে ঢিল মেরে কাঁচের কিচ্ছু করা যাবে না। তবে জিনিসটা চেনা চেনা লাগছে।'

'লাগবেই,' বললো রবিন। 'সীসা। কোনো জিনিস ঝালাই-টালাই করতে গিয়ে পড়ে থাকতে পারে।'

হাতের তালুতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলো কিশোর। চিনলো না। ফিরিয়ে দিলো আবার মুসাকে। নিজের অজান্তেই জিনিসটা পকেটে ভরলো মুসা। আবার খোঁজাখুঁজি চললো। কাঁচ ভাঙা যেতে পারে, ওরকম কিছুই পাওয়া গেল না।

কচির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরে চললো তিন গোয়েন্দা।

বাগানে ছিলেন মামী। ওদেরকে দেখে এগিয়ে এলেন বাগানের কিনারে। 'এসেছিস। যা, হাতমুখ ধুয়ে নে গে। চা দিচ্ছি।...ও, হ্যাঁ, কিশোর, সানি নামে একজন ফোন করেছিলো। আসতে না আসতেই কতোজনের সঙ্গে পরিচয় করে ফেললি। ফোনও করে।'

হাসলো কিশোর। 'কিছু বললো?'

'বললো তার চাচা নাকি মত পরিবর্তন করেছেন। যা ঘটে গেছে তার জন্যে অনুতপ্ত।'

'আবার যাবো!' মুসা বললো। 'কিশোর, এবার পয়সা দিতে রাজি না হলে আর যাচ্ছি না আমি। যেমন লোক, তেমনি তার ব্যবস্থা। বিনে পয়সায় কাজটা করে দিতে চেয়েছিলাম, ভাল্লাগেনি।'

'হ্যাঁ, ঠিক,' তুড়ি বাজালো রবিন। 'অন্তত মোটা একটা পুরস্কার ঘোষণা না করা পর্যন্ত ওঁর মোহর আর খুঁজতে যাচ্ছি না।'

কিন্তু ওদের কথায় তেমন কান নেই কিশোরের। জিজ্ঞেস করলো, 'মামী, আজ বাইরে কাউকে অদ্ভুত আচরণ করতে দেখেছো?'

'অদ্ভুত আচরণ?' অবাক হলেন মামী। 'না তো!'

'বেশ, অদ্ভুত আচরণ না হয় না-ই করলো, থামের মাথায় উঠেছিল কেউ?' যে

ধাতব থামটা থেকে টেলিফোনের তার এসে ঢুকেছে এই বাড়িতে সেটার দিকে হাত তুললো কিশোর।

'না,' মাথা নাড়লেন মামী। 'দাঁড়া দাঁড়া, দেখেছি। মেকানিক। ফোনের তার চেক করতে আসে যে, ওদেরই একজন। লোকটা নতুন। চিনি না।'

'কখন সেটা?' আগ্রহ দেখাল কিশোর।

'এই তো, তোরা বেরোনোর একটু আগে। বাগানেই ছিলাম আমি তখন, দেখলি না? যা, হাত-মুখ ধো গিয়ে।'

কৌতূহল আর চেপে রাখতে পারলো না মুসা। ওরা ওখান থেকে সরে আসার সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো, 'ব্যাপারটা কি, কিশোর?'

'লোকটা কি ছদ্মবেশী?' রবিনের প্রশ্ন। 'আসল মেকানিক নয়? এ বাড়ির ওপর চোখ রাখছিলো?'

'রাখতেও পারে,' দায়সারা জবাব দিলো কিশোর। 'এ নিয়ে পরে চিন্তা-ভাবনা করবো। সোমবারের আগে অনেক সময় পাওয়া যাবে। আপাতত হাত-মুখ ধুয়ে নিয়ে চলো চা খাইগে।'

নয়

পরদিন করিমদের বাড়িতে দাওয়াত খেতে গেল তিন গোয়েন্দা। দাওয়াত রাতে, অথচ নেয়ার জন্যে দুপুরবেলাই এসে বসে রইলো ছেলেটা।

করিমের মায়ের আদর-যত্নে অভিভূত হয়ে গেল ওরা। সম্পন্ন গৃহস্থ করিমের বাবা, বাড়ি-ঘরের অবস্থা দেখেই সেটা আন্দাজ করা গেল।

বাড়িতে ঢোকার পর থেকেই শুরু হলো খাবার আসা। খানিক পর পরই এটা নিয়ে আসেন করিমের মা, ওটা নিয়ে আসেন। নানা রকম পিঠা, খেজুরের রসে তৈরি পায়েস, চিড়া-মুড়ির মোয়া। থালায় করে নিয়ে আসেন, আর বলেন, 'খাও, বাবারা, খাও। আমরা গরীব মানুষ। ভালা জিনিস ত আর খাওয়াইতে পারুম না। এগুলানই খাও।'

বৈঠকখানায় ভিড়। প্রায় সবাই করিমের সমবয়েসী গাঁয়ের ছেলে। বিদেশী বন্ধুদের দাওয়াত করে আনছে একথাটা প্রায় ঢাকঢোল পিটিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলো সে। ওদের আঞ্চলিক সব কথা বুঝতে পারে না মুসা, তা-ও ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল দেখতে দেখতে।

শীতের রাত। আটটা বাজতে না বাজতেই ঘুমিয়ে পড়ে গাঁয়ের লোক, নিঝুম হয়ে যায় পাড়া। কচিত কারও ঘরে কুপির কাঁপা আলো চোখে পড়ে। তিন গোয়েন্দাকে দেখতে আসা ছেলেরা চলে গেল আটটা বাজার আগেই। সঙ্গে করে নিয়ে আসা কিছু কিছু জিনিস ওদেরকে উপহার দিয়েছে গোয়েন্দারা। খুব খুশি হয়েছে ছেলেগুলো।

রসুই ঘরে ভাত বেড়ে দিয়ে খেতে ডাকলেন করিমের মা।

হ্যারিকেনের মিটমিটে আলো। মাটির মেঝেতে মাদুরের ওপর খেতে বসলো তিন গোয়েন্দা। এ রকম ভাবে খায়নি আর কখনও। এক অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে ওদের। আবছা অন্ধকার, খাবারও ঠিকমতো দেখা যায় না। ঘরের ভেতরে কেমন এক ধরনের ভ্যাপসা গন্ধ। ওরা জানে না, শুকনো পাট, কাঁচা সরষে, আর অনেক পুরানো তেল চিটচিটে কাঁথা-বালিশের মিশ্র গন্ধ ওটা।

কড়া ঝাল দেয়া মুরগীর মাংস, লাল চালের ভাত, মসুরের ডাল, আর নানা রকম সব্জী। সেই সাথে প্রচুর কাঁচা মরিচ আর পেঁয়াজ।

সাধারণ খাবার। কিন্তু খেতে খেতে মুসার মনে হলো খাবারের এই স্বাদ আগে কমই পেয়েছে। পরিবেশের জন্যেই বোধ হয় ভালো লাগছে এতোটা। মানুষগুলোর অকৃত্রিম ভালোবাসা আর আন্তরিকতাও যোগ হয়েছে এর সঙ্গে। রুটি খেতে অভ্যস্ত যে রবিন, তারও খারাপ লাগছে না খেতে। শুধু ঝালটা একটু বেশি লাগছে। খানিক পর পরই পানি গিলতে হচ্ছে। নাক-চোখ দিয়ে পানি গড়াচ্ছে ঝালের চোটে।

খাওয়া সেরে বাইরে দাওয়ায় এসে বসলো ছেলেরা। রাতে থাকবে। কাজেই কম্বল-টম্বল নিয়ে তৈরি হয়েই এসেছে।

পরিষ্কার আকাশ। তবু কেমন যেন ঝাপসা লাগছে। কুয়াশার জন্যে। অনেক গাছপালা এখানে। বাড়ির সামনে একটা পুকুর। তিন পাড়ে বাঁশঝাড়। ঘন কালো দেখাচ্ছে এখন। পুকুরে শব্দ করে ঘাই মারছে কাতলা মাছ। বাঁশ বনে কর্কশ গলায় ডেকে উঠলো একটা পেঁচা। তার পর পরই শোনা গেল ঝাড়ের ওপাশের খেত থেকে আসা শেয়ালের হুক্কা-হুয়া।

উঠানে নেমে নাড়ার আগুন জ্বাললো করিম। অগ্নিকুণ্ডের পাশে পিঁড়ি পেতে দিয়ে তিন গোয়েন্দাকে ডাকলো ওখানে গিয়ে বসতে।

গোল হয়ে বসলো সবাই।

বাঁশের ছোট টুকরিতে করে খেত থেকে তুলে নিয়ে আসা হয়েছে অনেক মটরশুঁটি। আগুনে সেগুলো পোড়াতে দিয়ে করিম বলল, 'বিকালে তুইল্লা আইন্না রাখছে আমার ভাই। পোড়াইয়া খাইতে খুব মজা লাগে।'

মাথার ওপরে খোলা আকাশ। নিচে অন্ধকার নীরবতার মাঝে আগুনের পাশে গল্প চললো ওদের। কথায় কথায় করিম জানালো, চাঁদ উঠলে নাকি মুন্সী বাড়ির দীঘির পাড়ে শেয়ালের আসর বসে। শেয়ালদের রাজা থাকে, মন্ত্রী থাকে, বিচার-আচার চলে অনেক রাত পর্যন্ত। জলসা হয়।

বিশ্বাস করলো না মুসা। মুচকি হাসলো।

রেগে গেল করিম। জেদ ধরে বললো, 'বিশ্বাস করলা না? দ্যাখতে চাও?'

মাথা ঝাঁকালো মুসা।

'ঠিক আছে। চান উঠুক। তারপর যামু।'

অনেক রাতে বাঁশ বনের মাথা ছাড়িয়ে উঠে এলো হলদে চাঁদ। সেদিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালো করিম। পুরানো চাদরটা ভালোমতো গায়ে জড়াতে জড়াতে বললো, 'চল, সময় অইছে।'

বাঁশঝাড়ের ভেতর দিয়ে গেছে পায়ে চলা পথ। সঙ্গে টর্চ এনেছে তিন গোয়েন্দা। করিমের সঙ্গে চলতে অসুবিধে হলো না। এ যেন এক রহস্যময় জগতে এসে পড়েছে ওরা। বাঁশ গাছের নিচে ঘন অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে রয়েছে। জ্যোৎস্না ঢুকতে পারে না।

এমন কি টর্চের আলোয়ও কাটতে চায় না সে অন্ধকার। সামান্য বাতাস লাগলেই সড়সড় করে বাঁশের পাতা, গাছের ফাঁক দিয়ে শিস কেটে বেরিয়ে যায় বাতাস, যেন অশরীরী কোনো প্রেতাত্মার বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস। ধক করে ওঠে বুকের ভেতরটা। ছমছম করতে থাকে গা।

বাঁশবন থেকে বেরোতেই দেখা গেল ধবধবে সাদা মাঠ। ফসল কাটা শেষ। একটা ঘাস নেই কোথাও। সমস্ত খেত জুড়ে পড়ে রয়েছে মাটির ঢেলা। ঘোলাটে চাঁদের আলোয় দূর থেকে দেখলে মনে হয় দিগন্তজোড়া বিশাল এক সাদা চাদর বিছিয়ে দিয়েছে যেন কেউ। খেতের ওপর দিয়েই কোণাকুণি চলে গেছে পায়েচলা পথ। সেই পথে নামলো ওরা। কয়েক পা এগোতে না এগোতেই জুতোর ওপর মিহি ধুলোর আস্তরণ পড়লো।

বেশ কয়েকটা খেতের পর মুন্সী বাড়ির সীমানা। অনেক বড় এলাকা নিয়ে বাড়ি। বিরাট দীঘির পাড়ে ঘন বাঁশবন। উঁচু হয়ে আছে দীঘির পাড়। কাছে আসতে দেখা গেল কালো কালো অনেক গর্ত।

'এই গুলান শিয়ালের গর্ত,' জানালো করিম। 'আমরা বসমু গিয়া দীঘির ঘাটলায়। চুপচাপ।'

শান বাঁধানো ঘাট। সিঁড়ির ওপরে বেশ চওড়া একটা প্ল্যাটফর্ম মতো, তাতে বেশ সাজিয়ে তৈরি করা হয়েছে ইঁট-সিমেন্টের চেয়ার। পাকাপোক্ত ব্যবস্থা। সিঁড়ি যতোদিন থাকবে এগুলোও থাকবে, নষ্ট হবে না।

সেই চেয়ারে এসে বসলো ওরা।

'এইবার খালি বইয়া থাকো চুপ কইরা,' করিম বললো।

'কখন আসবে?' মুসা জিজ্ঞেস করলো।

'আইবো, সময় অইলেই।'

সময় যায়। চুপ করে বসে আছে ওরা। ফিসফাস পর্যন্ত করছে না। কানের কাছে মশা পিনপিন করছে। চাপড় মারতে গিয়েও মারছে না। যদি আওয়াজ শুনে শেয়ালেরা আসা বন্ধ করে দেয়।

রাত বাড়ছে। মাথার ওপরে উঠে এসেছে চাঁদ। মস্ত বড়। ঘোলাটে ভাব দূর হয়ে গেছে অনেকখানি, হলদেটে রঙ কেটে গিয়ে সাদা হয়ে উঠেছে। পুকুরের পানির

ওপর ধোঁয়ার মতো কুণ্ডলি পাকিয়ে উড়ছে কুয়াশা।

'দূর, আসবে না,' আর ধৈর্য রাখতে পারছে না মুসা।

'আইবো, আইবো। দ্যাখো না খালি।'

রবিন চুপ হয়ে আছে। কিশোরও। করিমের কথা বিশ্বাস করেছে। এতো জোর দিয়ে যখন বলছে, নিশ্চয় আসবে।

আরও কয়েক মিনিট কাটলো। হঠাৎ মুসার বাহু খামচে ধরলো করিম। হাত তুলে দেখালো ঢেলা-খেতের দিকে।

প্রথমে কিছু চোখে পড়লো না। তারপর তিনজনেই দেখলো, দীঘির পাড়ের দিক থেকে খেতের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে একটা জানোয়ার। কুকুরের মতো দেখতে। বেশ রাজকীয় ভঙ্গিতে হেলেদুলে ধীরেসুস্থে চলেছে। গিয়ে বসলো ওটা খেতের একটা আলের ওপর।

পাড়ের কাছ থেকে আরেকটা শেয়াল বেরোলো। বসলো গিয়ে প্রথমটার সামনে, মুখোমুখি, যেন আলাপ করতে বসেছে। তারপর যেন মাটি ফুঁড়ে উদয় হতে লাগলো একের পর এক শেয়াল। কোনোটা একা, কোনোটা জোড়া বেঁধে, আবার কেউ কেউ বাচ্চা-কাচ্চা, পরিবার-পরিজন নিয়ে। দল বেঁধে এগোলো সবাই প্রথম শেয়াল দুটোর দিকে।

আলে বসা প্রথম শেয়ালটার সামনে গোল হয়ে বসলো ওগুলো। যেন বিচারে বসেছে গাঁয়ের মোড়ল। তার সামনে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে জড়ো হয়েছে গ্রামবাসী।

দীঘির পাড়ের গর্তে বোধহয় আর একটা শেয়ালও রইলো না। সব গিয়ে সামিল হয়েছে সভায়। চাঁদের দিকে মুখ তুলে লম্বা হাঁক ছাড়ল প্রথম শেয়ালটা। ওটাই নেতা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওটার ডাক মিলাতে না মিলাতেই *হা-উ-উ-উ-উ-উ* করে ডেকে উঠলো আরেকটা। সুর মেলালো আরেকটা। তারপর আরও একটা। সমস্বরে চেঁচাতে শুরু করলো সবগুলো। মহা আনন্দে কেঁউ কেঁউ করে লাফালাফি শুরু করলো বাচ্চাগুলো।

সে এক বিচিত্র জারি গান। কেউ বলছে *হাউ*, কেউ বলছে *হোউ*, কেউ *কা-হুয়া*, কেউ বা আবার *হুক্কা-হুয়া* । দু-একটা আবার তার জের টানছে *হুয়া হুয়া হুয়া হুয়া* বলে। থ হয়ে গেছে তিন গোয়েন্দা। বাস্তবে এ রকম কিছু ঘটতে পারে, তা-ও আবার নিজের চোখে দেখবে, কোনো দিন কল্পনাই করেনি ওরা।

আড়চোখে করিমের দিকে তাকালো মুসা।

মিটিমিটি হাসছে করিম।

শেয়ালের জারি গান একবিন্দু পছন্দ করতে পারেনি গাঁয়ের কুকুরের দল। পাগল হয়ে গেল যেন ওগুলো। চারদিক থেকে ভেসে আসছে এখন ওগুলোর হাঁকডাক।

পাত্তাই দিলো না শেয়ালের দল। আরও কয়েকবার ডেকে খেলা জুড়ে দিলো।

তবে সবাই নয়, ছোটগুলো। বড়রা স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো ওদের খেলা। সেই সঙ্গে চললো গুরু-গম্ভীর আলোচনা।

থেকে থেকে জারি গান শুরু করে শেয়ালেরা। শোনামাত্র খেপে উঠে কুকুরগুলো। যেন ওগুলোকে খেপানোর জন্যেই এমন করে ওরা।

সভা ভাঙলো এক সময়।

আবার দীঘির পাড়ের গর্তের দিকে ফিরে চললো শেয়ালের দল।

'খাইছে!' বিড়বিড় করে শুধু একটা শব্দই উচ্চারণ করতে পারলো বিস্মিত মুসা।

'আশ্চর্য!' জোরে বললো না রবিন, যেন আমেজ কেটে যাওয়ার ভয়ে। 'কয়োট আর নেকড়েরা এ রকম সভা করে শুনেছি। শেয়ালেরাও যে করে জানতাম না।'

'না করার কোনো কারণ নেই,' কিশোর বললো। 'হাজার হলেও জাতভাই। শেয়ালের এ রকম জলসা বসানোর কথা চাচার কাছেও শুনেছি। চাঁদনী রাতে নাকি সুন্দর বনের হরিণেরাও জলসা বসায়, নাচে। বনের মধ্যে মধু জোগাড় করতে যায় যে সব মৌয়াল, তারা এসে এসব কিচ্ছা বলে।'

'বানিয়ে বলে?' মুসার প্রশ্ন।

'আগে সে রকমই মনে হয়েছে। কিন্তু এখন আর বলব না সে কথা। চোখের সামনেই যে কাণ্ডটা ঘটতে দেখলাম!'

বড় করে হাই তুললো করিম। বিজয়ীর ভঙ্গিতে তাকালো মুসার দিকে। 'রাইত অনেক অইছে। লও, বাড়িত যাই।'

দশ

আরেক সোমবার এলো অবশেষে। মাঝখানে কয়েকটা দিন। তবে মোটেও একঘেয়ে লাগেনি তিন গোয়েন্দার। ফুড়ুৎ করে উড়ে চলে গেছে যেন। অনেক দেখেছে ওরা, অনেক ঘুরেছে। পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে দাওয়াত খেয়ে এসেছে। হই-হট্টগোল আর আনন্দ করেছে। ইতিমধ্যে একদিন মামার সঙ্গে গিয়ে পাখিও শিকার করে এসেছে। তবে সব কিছুর মাঝেও বারে বারে ঘুরে ফিরে মনে এসেছে প্রশ্নগুলো—কে কাঁচ ভাঙে? কি করে ভাঙে? কেন ভাঙে? ঈগলের সঙ্গে গাড়ির কাঁচ ভাঙার কি সম্পর্ক? কে চুরি করলো মুদ্রাটা?

সোমবার দুপুর বেলায়ই আরিফ সাহেবের বাড়িতে চলে এলো কচি। কিশোর বললো তাকে, 'আজই আরেকবার ভূত-থেকে-ভূতে চালান দিতে চাই।'

'আবার?'

'হ্যাঁ। কেন, ভুলে গেলে, আরেকবার চালান দেয়ার কথা ছিলো না? ভিনগ্রহের মানুষের খোঁজ চেয়ে?'

এবার রবিন আর মুসাও অবাক। সমস্বরে বলে উঠলো, 'ভিনগ্রহের মানুষ!'

'তোমরাই তো বললে। টেন-স্পীড যে চালায় তাকে ভিনগ্রহের মানুষের মতো লাগে।'

অনেক জায়গায় ফোন করলো কচি, তার বন্ধুদের। বলে দিলো কি করতে হবে। হুঁশিয়ার করে দিলো, যাতে লুকিয়ে থেকে নজর রাখে। সাইকেলওয়ালা যেন টের না পায়। জানিয়ে দিলো, কেউ খবর পেলে যেন ওদের বাড়িতে টেলিফোনে রচিকে জানায়। বাড়িতে ফোন করে তার ছোট ভাই রচিকে বুঝিয়ে বললো, ভূতদের ফোন যদি আসে, যা যা বলে নোটবুকে লিখে রাখতে। আরিফ সাহেবের ফোন নম্বর দিয়ে বললো নয়টা পর্যন্ত ওই বাড়িতেই থাকবে। ইতিমধ্যে যদি ফোন আসে, সঙ্গে সঙ্গে সে যেন জানায়।

সকাল সকাল রাতের খাবার খেয়ে নিলো সেদিন ওরা। তারপর বসার ঘরে এসে বসলো। ফোন আসার অপেক্ষা করছে। আটটা বাজলো। এলো না। গেল আরও পনেরো মিনিট···সাড়ে আটটায় বেজে উঠলো ফোন। ছোঁ মেরে রিসিভার তুলে নিলো কচি। তার ভাইই ফোন করেছে। উত্তেজিত হয়ে বললো, 'সর্বনাশ হয়েছে! একগাদা গাড়ির কাঁচ ভেঙেছে!'

'দাঁড়া দাঁড়া, কাগজ-কলম বের করি!' কচি বললো। 'আস্তে আস্তে বল!'

নোটবুকে লিখে রাখা তথ্য পড়লো ওপাশ থেকে রচি, 'ক্যাপ, চশমা, হেডফোন আর ব্যাকপ্যাক পরা একটা লোক সাইকেল চালিয়ে গেছে ধানমণ্ডির দশ নম্বর রাস্তা দিয়ে। এইমাত্র একটা গাড়ির কাঁচ ভাঙলো। সাইকেল চালককে কিছু করতে দেখা যায়নি।'

মুখ বাঁকালো মুসা। 'তারমানে ও কিছু করেনি।'

'তাই তো মনে হয়,' ঠোঁট কামড়ালো কিশোর। 'কিন্তু সে ছিলো ওখানে।'

'আট নম্বর রাস্তায় দেখা গেছে সাইকেল আরোহীকে,' রচি বললো। 'কালো একটা টয়োটা স্প্রিন্টারের কাঁচ ভাঙা হয়েছে। লোকটা গাড়ির কাছে থামেনি।'

'থামেনি!' কচির মুখে শুনে প্রায় চিৎকার করে উঠলো মুসা।

'কিন্তু ও যাওয়ার সময়ই তো ভেঙেছে কাঁচ!' রবিন বললো। 'সে না হলে আর কে?'

'ছয় নম্বর রাস্তায় আর একটা টয়োটার কাঁচ ভেঙেছে। সাইকেল আরোহীকে দেখা গেছে,' ভাইয়ের কাছে শুনে বললো কচি। 'শার্টের ভেতর থেকে কিছু একটা বের করছিলো।'

'কী?' আবার চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।

'দাঁড়াও দাঁড়াও, শুনি,' হাত তুললো কচি। 'হ্যাঁ, রচি, বল।'

জানা গেল, *বারো নম্বর রাস্তায় গগলস পরা টেন-স্পীড সাইকেল আরোহীকে দেখা গেছে। ওই রাস্তায় কোনো গাড়ির কাঁচ ভাঙেনি। চোদ্দ নম্বর রাস্তায়ও সাইকেল আরোহীকে দেখা গেছে। একটা টয়োটা পাবলিকার কাঁচ ভাঙা হয়েছে।*

শার্টের ভেতর থেকে কিছু একটা বের করেছিলো সে।

'কিন্তু কি বের করছিলো?' প্রশ্ন করলো রবিন। 'গাড়ির কাঁচ ভাঙা যায় এমন কিছু?'

'ভাঙতে হলে হয় ভারি কিছু দিয়ে পিটাতে হবে, নয়তো ছুঁড়ে মারতে হবে,' যুক্তি দেখালো মুসা। 'আর সে রকম কিছু করে থাকলে চোখে পড়তে বাধ্য। পড়লো না কেন?'

রচি জানালো, *ষোল নম্বর রাস্তায় দেখা গেছে সাইকেল আরোহীকে। একটা টয়োটা স্টারলেটের কাঁচ ভাঙা হয়েছে। মনে হলো গাড়ির দিকে কোনো কিছু নিশানা করছিল লোকটা। কিন্তু এতো দ্রুত সরে চলে গেল, যে ছেলেটা চোখ রেখেছিলো সে ঠিকমতো দেখতেই পারেনি। রাস্তার কয়েকটা পোস্টে আলোও ছিল না।*

'নিশানা করেছে, না?' বিড় বিড় করে বললো মুসা। পকেট হাতড়াচ্ছে। হ্যাঁ, আছে এখনও। যত্ন করেই রেখেছিলো। দু-আঙুলে ধরে বের করে আনলো জিনিসটা। চোখের সামনে এনে ভালোমতো দেখলো। চিৎকার করে উঠলো হঠাৎ। 'বুঝেছি! কিশোওর, এয়ার গানের গুলি! গুলি করে গাড়ির কাঁচ ভাঙে! শক্তিশালী কোনো এয়ারগান!'

রচির কথা শুনছে আর নোটবুকে লিখে চলছে কচি, *আঠারো নম্বর রোডে দেখা গেছে সাইকেল চালককে। সবুজ রঙের একটা টয়োটার কাঁচ ভেঙেছে! সাইকেল আরোহীকে কিছু করতে দেখা যায়নি।*

এটাই শেষ তথ্য। ভাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন রেখে দিলো কচি।

মুসার কথাটা ভেবে দেখলো কিশোর। বললো, 'তুমি ঠিকই আন্দাজ করেছো, সেকেণ্ড। শার্টের নিচে গানটা লুকিয়ে রাখে সে। এয়ার-পিস্তল। গাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় একটানে বের করে গুলি করেই আবার লুকিয়ে ফেলে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার। শব্দ হয় না তেমন। আর যা-ও বা হয় কাঁচ ভাঙার আওয়াজ সেটাকে ঢেকে দেয়, আলাদা করে বোঝা যায় না। অন্ধকারে দেখাও যায় না কিছু। কাঁচে লেগে চ্যাপ্টা হয়ে যায় গুলিটা। যদি জানা না থাকে কি খুঁজছে, তাহলে দেখলেও ওটা চোখে পড়বে না কারো।'

'এইবার পুলিশকে জানানো যায়!' কচি বললো। 'আমার বাপ জানও এবার বিশ্বাস না করে পারবে না।'

'না, এখনও সময় হয়নি,' কিশোর বললো। 'আগে হাতেনাতে ধরি ব্যাটাকে, তারপর।'

'কেন, এখন বললে...' বাধা পেয়ে থেমে গেল মুসা। আবার বেজে উঠেছে টেলিফোন।

রিসিভার কানে লাগিয়েই চেঁচিয়ে উঠলো কচি, 'ধরে ফেলেছে! এই,

আরেকবার বল রচি,' কোন রাস্তায়!...সাতাশ নম্বর?' ঠিক আছে তো?' তিন গোয়েন্দার দিকে চেয়ে বললো সে, 'সাইকেলওয়ালাকে ধরে ফেলেছে পুলিশ! যাবে নাকি?'

'নিশ্চয় যাবো!' বলে উঠলো রবিন।

'মামা তো ঘরে নেই,' কিশোর বললো উত্তেজিত কণ্ঠে। 'যাবো কিভাবে? এতো দূর যেতে...'

'গাড়ি নিয়ে যাবো,' কচি বললো।

'কার গাড়ি?'

'তোমার মামারটাই। ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে আমার। মামীকে রাজি করাও।'

প্রথমে রাজি হতে চাইলেন না মামী। পরে কিশোর যখন জোর দিয়ে বললো, বিশ মাইলের বেশি গাড়ির স্পীড ওঠাতে দেবে না কচিকে, তখন রাজি হলেন।

এ সময়ে রাস্তায় গাড়ির ভিড় তেমন নেই। খোলা হাইওয়ে। ইচ্ছে করলে উড়ে যাওয়া যায়, কিন্তু কিশোরের চাপে ইচ্ছেটা দমন করতে বাধ্য হলো কচি। তবে বিশ মাইল গতিবেগে কিছুতেই সীমাবদ্ধ রাখতে পারছে না সে। তিরিশ-পঁয়তিরিশে উঠে যাচ্ছে।

সাতাশ নম্বর রোডের মোড়ে এসে দেখলো পুলিশ নেই। সারা রাস্তায় কোথাও পুলিশ দেখা গেল না। লোকজনকে জিজ্ঞেস করলো কচি, একটু আগে এখানে কাউকে কোনো কারণে ধরেছিলো কিনা। কোনো বাড়ির দারোয়ান, কোনো দোকানদার, কিংবা কোনো পথচারী—কেউই বলতে পারলো না ওরকম কিছু ঘটেছে এখানে। সবাই একবাক্যে বললো, সন্ধ্যার পর থেকে পুলিশই দেখেনি এই রাস্তায়। এমনকি টহলদার পুলিশও না।

'আশ্চর্য!' রবিন বললো।

'ব্যাপারটা কি?' মুসার প্রশ্ন।

'ঠকানো হয়েছে আমাদেরকে!' গম্ভীর হয়ে বললো কচি। 'চালাকি! শেষ ফোনটা রচি করেনি। করেছে অন্য কেউ। আমাদেরকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে। ইস্, তখন বুঝলাম না! গলাটা অন্যরকম লাগছিলো সে জন্যেই!'

এগার

'কিন্তু কেন?' নীরব পথের এমাথা-ওমাথা দেখছে গোয়েন্দা-সহকারী। যেখানে পুলিশ আর মানুষে গিজগিজ করার কথা সেখানটা এখন পুরোপুরি নির্জন।

'রসিকতা করেছে আমাদের সঙ্গে,' কিশোর বললো।

'কিংবা যাতে পুলিশকে খবর দিতে না পারি সে জন্যে। কে জানে, হয়তো

এখনও এখানকারই কোনো পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। কচি, দেখো তো রাস্তাগুলো ঘুরে।'

আবাসিক এলাকার রাস্তাগুলো ধরে ধীরে ধীরে গাড়ি চালালো কচি। পথের পাশে কোনো গাড়ি দাঁড়ানো দেখলেই বকের মতো গলা বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করছে তিন গোয়েন্দা, সেটার কাঁচ ভাঙা কিনা।

'ওই যে একটা!' আচমকা চেঁচিয়ে উঠলো রবিন।

'গাড়ি থামাও!' সাথে সাথে বললো কিশোর।

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষলো কচি। তারপর গাড়ি পিছিয়ে আনলো। একটা লাল টয়োটা করোলার কাঁচ ভাঙা। মালিক এখনও বোধহয় জানে না। পথের পাশে গাড়ি রেখে গেছে, ফিরে এলে দেখবে। কিংবা হয়তো জানে। কিন্তু কি আর করবে? এখন তো কাঁচ বদলানো সম্ভব না। দিনের বেলা যা করার করবে।

'তারমানে গাড়ির কাঁচ সত্যি সত্যি ভাঙা হয়েছে এই এলাকায়,' আনমনে বিড়বিড় করে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। 'সেটা মিথ্যে কথা নয়। ভূত-থেকে-ভূতেরা সত্যি কথাই বলেছে। শুধু শেষ ভূতটা ছাড়া।'

'মানে?' মুসার প্রশ্ন।

'ওই যে, যে ভূতটা আমাদের বললো সাইকেলওয়ালাকে পুলিশে ধরেছে।' হাত নাড়লো কিশোর, 'কচি, চলো বাড়ি চলো।'

'কাঁচগুলো ভাঙতে দেখলো,' রবিন বললো, 'কিন্তু তাকে যেতে দেখলো না কেন কেউ? সমস্ত শহরেই ভূত রয়েছে আমাদের। তাদের কারো চোখেই পড়লো না কেন আর? কাঁচ ভাঙার পর একেবারে উধাও!'

বাড়ি ফিরে বসার ঘরে আলোচনা হচ্ছে ওদের। আরিফ সাহেব এখনও ফেরেননি।

গাড়িটা গ্যারেজে ঢুকিয়ে রেখে এলো কচি। রবিনের কথা শুনতে পেয়েছে। বললো, 'ঠিক, পালালো কোথায় ব্যাটা? এতোগুলো চোখকে এভাবে ফাঁকি দিলো কিভাবে?'

'দুটো উপায়ে সেটা করতে পারে,' দুই আঙুল তুললো গোয়েন্দাপ্রধান। 'হয় সমস্ত কাপড়-চোপড় বদলে সাইকেলটা কোথাও ফেলে পালিয়েছে। নয়তো কোথাও একটা পিকআপ অপেক্ষা করছিলো তার জন্যে, সাইকেলসহ তুলে নিয়ে গেছে।'

'কেন এই সাবধানতা?' মুসার জিজ্ঞাসা। 'ছেলেমেয়েরা যে তার ওপর চোখ রেখেছে, টের পেয়েই কি পালালো?'

'আমার তা-ই ধারণা।'

'কিভাবে জানলো?' কচির প্রশ্ন।

'তার ওপর যে চোখ রাখা হয়েছে, এটা বলে দেয়া হয়েছে তাকে। তাড়াতাড়ি কাঁচ ভাঙা বাদ দিয়ে পালিয়েছে যখন, এছাড়া আর কোন কারণ নেই।'

'কিন্তু সতর্ক করলো কি ভাবে?' সন্দেহ যাচ্ছে না কচির।

'কোনো ভূত হয়তো চেনে তাকে। বলে দিয়েছে,' রবিন অনুমান করলো।

'উঁহুঁ, তা নয়,' মাথা নাড়লো কিশোর। 'আস্তে আস্তে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে আসছে। অন্য কোনো ভাবে জেনেছে আমাদের কথা। যেভাবে সব সময় সে জেনে যায় কোন রাস্তায় পুলিশ যাচ্ছে তার ওপর নজর রাখার জন্যে। নিশ্চয় হুঁশিয়ার করা হয় তাকে, হেডফোনের মাধ্যমে।'

'তার কানে লাগানো হেডফোন?'

'সিবি রেডিও!' বললো মুসা।

'নাকি হ্যাম রেডিও!' রবিন বললো।

'যে রেডিওই হোক, সেটা পুলিশের ওয়্যারলেসে বলা কথা ধরতে পারে,' বললো কিশোর। 'থানার সঙ্গে সর্বক্ষণ যোগাযোগ রাখে ডিউটিতে থাকা পুলিশ অফিসার, রেডিওর মাধ্যমে। ওই ধরনের যন্ত্র আর কারও কাছে থাকলে তার পক্ষেও সেই কথা শোনা সম্ভব। একই ওয়েভলেংথে টিউন করে রাখে সে রেডিও। পুলিশের কথাবার্তা সব শোনে। হুঁশিয়ার হয়ে যায়। যে রাস্তায় পুলিশ থাকে সেখানে আর কাঁচ ভাঙতে যায় না। আজ রাতেও রেডিওতেই কেউ তাকে সাহায্য করেছে।'

'কিন্তু কিশোর,' প্রতিবাদ করলো, 'ভূত-থেকে-ভূতের খবর শুধু আমরা চারজনই জানি।'

'ঠিক,' একমত হয়ে বললো মুসা। 'আমাদের সঙ্গে রসিকতা যে করলো সে কিভাবে জানলো? আর কি করেই বা জানলো কোন নম্বরে ফোন করতে হবে আমাদের?'

'চলো, বোধহয় দেখাতে পারবো,' কিশোর বললো। 'টর্চ আর একটা মই দরকার। গ্যারেজে লম্বা মই আছে, দেখেছি।'

মিনিট কয়েক পর দল বেঁধে চললো চারজনে। টর্চ হাতে কিশোর চলেছে আগে আগে। পেছনে মই বয়ে নিয়ে চলেছে মুসা আর কচি। রবিন সাহায্য করছে তাদের। সেই টেলিফোনের থামটার কাছে এসে দাঁড়ালো ওরা, যেটা থেকে লাইন এসেছে আরিফ সাহেবের বাড়িতে।

টেলিফোন বক্সটা থামের মাথার কাছে। সেটা দেখিয়ে মুসাকে নির্দেশ দিলো কিশোর, 'যাও, মই লাগিয়ে ওখানে উঠে যাও।'

'কি করবো উঠে?'

'বাক্স খুলে দেখো কি আছে। জানাবে আমাদের।'

টর্চের পেছনে লাগানো কর্ডটা হাতে ঢুকিয়ে কনুয়ের কাছে ঝুলিয়ে নিয়ে মই বেয়ে উঠে গেল মুসা। বাক্সের দরজা খুলে ভেতরে আলো ফেললো। 'শুধু তো

তার··· না না, দাঁড়াও আরেকটা জিনিস আছে।'

'কী?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

আরো ভালো করে দেখলো মুসা। 'চিনতে পারছি না। চারকোণা খুব ছোট একটা বাক্সের মতো জিনিস। ধাতুর না প্ল্যাস্টিকের বোঝা যায় না। দুটো তার বেরিয়ে গেছে। বোধহয় টেলিফোনের তারের সঙ্গে জোড়া দেয়া হয়েছে। খুলে আনবো?'

'না। নেমে এসো।'

মাটিতে নেমে আবার ওপরের বাক্সটার দিকে তাকিয়ে বললো মুসা, 'ওয়্যারট্যাপ, না? চৌধুরী আংকেলের লাইনের সঙ্গে লাগিয়ে দিয়ে আমাদের কথাবার্তা শুনেছে। এভাবেই জেনেছে ব্যাটা ভূত-থেকে-ভূতের কথা।'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'এটাই একমাত্র জবাব।'

বাক্সটার দিকে রবিনও তাকিয়ে রয়েছে। 'কিন্তু শোনে কোত্থেকে? বাক্স থেকে তো আর কোনো তার বেরিয়ে যায়নি। মানে, স্বাভাবিক তারগুলো ছাড়া আর কিছু?'

'নিশ্চয় কোনো ধরনের রিমোট লিসেনিং ডিভাইস। রেডিওর মতো তার ছাড়াই সঙ্কেত পাঠায়। যে এই কাজ করেছে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি সম্পর্কে তার অসাধারণ জ্ঞান।'

'তারমানে আমাদের ওপর সর্বক্ষণ নজর রেখে চলেছে সে,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো রবিন।

রবিনের কথার মানে বুঝতে পারলো মুসা। তার দিকে তাকিয়ে গুঙিয়ে উঠলো।

মইটা নিয়ে আবার ফিরে চললো ওরা।

গ্যারেজে মই রেখে আবার ঘরে এসে বসলো ওরা। আরিফ সাহেব তখনও ফেরেননি। মামী রান্না তৈরীতে ব্যস্ত।

কিশোর বললো, 'সেদিন যে মামী একটা লোককে খাম্বায় উঠতে দেখেছিলো, আমার ধারণা ওই লোকই যন্ত্রটা লাগিয়েছে ফোন বক্সে।'

'কে সে?' মুসার প্রশ্ন। 'আমাদের ওপর নজর রাখে কেন? কি চায়?'

'কাঁচ ভাঙুরার অ্যাসিসট্যান্ট হতে পারে,' কচি বললো।

ঠোঁট কামড়ালো কিশোর। 'তা পারে।'

'আসল ব্যাপারটা কি বলো তো?' রবিন বললো, 'এতো আঁটঘাট বেঁধে এভাবে গাড়ির কাঁচ ভাঙার কি মানে? এয়ার পিস্তল, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, পুলিশ-ব্যাণ্ড রেডিও, ওয়্যারট্যাপ···নাহ্, এতো সব জিনিসপত্র নিয়ে শুধু শুধু মজা করার জন্যে কাঁচ ভাঙছে না!'

'ঠিক,' আঙুল নাচালো মুসা। 'অন্য কোনো কারণ আছে। লাভজনক কিছু।

নইলে এতো সব করতে যেতো না।'

'লাভজনক কাজই তো করে,' কচি বললো। 'গাড়িতে অনেক সময় দামী জিনিস রেখে যায় লোকে। উইণ্ডশীল্ড ভেঙে সেগুলো চুরি করে চোরটা। ওই যে ঈগলটা যেমন করলো। অনেক দামী জিনিস। ওই একটা বিক্রি করলেই সারা জীবন খেতে পারবে।'

'এদেশে ওই ঈগল বিক্রি করতে পারবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে।' কিশোরের দিকে তাকালো রবিন। 'কিশোর, তুমি কি বলো?'

'বলে আর কি হবে? এই কেস খতম।'

হাঁ হয়ে গেল অন্য তিনজন। নীরবে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে।

'হ্যাঁ, এই কেস শেষ,' আবার বললো কিশোর। 'লোকটাকে হারিয়েছি আমরা।'

চুপ করেই রইলো তিন শ্রোতা।

'আমরা এখন জানি টেন-স্পীডওলাই কাঁচ ভাঙে,' কিশোর বললো। 'কিন্তু সে কে, জানি না। ওর নাম জানি না, পরিচয় জানি না, ওর সম্পর্কে কিছুই জানি না। অন্ধকারে তার চেহারাও দেখতে পারিনি ভালোমতো। সে জেনে গেছে, তার পরিচয় ফাঁস হওয়ার পথে, ফলে ডুব দেবে এখন। আর হয়তো গাড়ির কাঁচ ভাঙবে না। যদি না ভাঙে ধরবো কিভাবে?'

হতাশায় গুঙিয়ে উঠলো মুসা। 'তাই তো! জানি ওই ব্যাটাই শয়তান, কিন্তু ধরতে পারছি না!'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'রহস্যের সমাধান আমরা করেছি। কিন্তু অপরাধীকে ধরতে পারলাম না।'

চুপ করে ভাবতে লাগলো চারজনে।

ঘড়ির দিকে তাকালো মুসা, 'আর বসে থেকে কি লাভ? চলো, শুতে যাই।'

'হ্যাঁ,তাই চলো,' আফসোস করে বললো রবিন। 'এই কেস এখানেই শেষ। গাড়ির কাঁচও আর ভাঙবে না, লোকটাকেও ধরতে পারবো না।'

'তোমাদের তো কিছু হবে না, ক্ষতিটা হলো আমার,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বললো কচি। চেহারা দেখে মনে হলো কেঁদে ফেলতো, লজ্জায় পারছে না। 'মস্ত ক্ষতি। আব্বাকে কিছুতেই বোঝাতে পারবো না, আমার সঙ্গে শত্রুতা করে নয়, চুরি করার জন্যে গাড়ির কাঁচ ভাঙে একটা চোর! ড্রাইভিং লাইসেন্স করাটাই সার হলো আমার! গাড়ি আর চালাতে পারবো না!'

বিদায় নিয়ে বাস ধরতে চললো কচি।

বার

পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে বসে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো এনায়েত উল্লাহ। চোখে অবিশ্বাস। বললো, 'বলিস কি? এয়ার পিস্তল দিয়ে কাঁচ ভাঙে?'

'হ্যাঁ, আব্বা, তাই। কাল রাতে সেটা প্রমাণ করে দিয়েছে কিশোর।' ভূত-থেকে-ভূতের সাহায্যে কিভাবে সাইকেলওয়ালার কাঁচ ভাঙার খবর জেনেছে সব কথা বাবাকে খুলে বললো কচি।

'ভূত-থেকে-ভূতে! নামটা ভালোই দিয়েছে। আইডিয়াটাও চমৎকার! বুদ্ধি আছে ছেলেটার,' হাসলো এনায়েত উল্লাহ। 'তা পুলিশের কাছে মুখ খুলেছে চোরটা?'

'পুলিশকে বলা হয়নি এখনও।'

'বলা হয়নি?' ভ্রূকুটি করলো এনায়েত উল্লাহ। 'কেন? তোরা নিজেরাই ধরার চেষ্টা করবি নাকি?'

'না।'

'তাহলে?'

'লোকটা কে তা-ই জানি না আমরা এখনও,' আরেক দিকে তাকিয়ে বললো কচি। 'ওর নাম জানি না, কোথায় থাকে জানি না, বিদঘুটে টুপি আর গগলস পরে থাকে বলে চেহারাও দেখতে পারিনি।'

'জানিসই না লোকটা কে?' ভুরু কোঁচকালো এনায়েত উল্লাহ।

'না, ধরতে পারলে তবে তো জানবো। তার আগেই পালালো। তবে...তবে, আমার মনে হয় কিশোর যেভাবেই হোক বের করে ফেলবে...পারবে ও! পারবেই!'

'হুঁ,' কচির মতো এতোটা আশা করতে পারলো না এনায়েত উল্লাহ। আবার খাওয়ায় মন দিলো। 'দেখ, পারে যদি ভালো। তবে যতোক্ষণ আমাকে প্রমাণ দেখাতে না পারছিস, গাড়ির চাবি আমি তোকে দিচ্ছি না।'

মুখ কালো করে নাস্তা শেষ করলো কচি। তারপর রওনা হলো কিশোরদের ওখানে। সারারাত অনেক ভেবেছে সে। লোকটাকে ধরার মতো কোনো উপায় বের করতে পারেনি। আশা করছে তিন গোয়েন্দার মাথা থেকে কোনো বুদ্ধি বেরোবে।

গেট দিয়ে ঢুকেই দেখলো কচি, বাগানে রোদ পোহাচ্ছে রবিন আর মুসা। এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো,' কিশোর কই?'

'সেটা তো আমাদেরও প্রশ্ন,' মুসা বললো।

'বাড়িতে নেই,' রবিন জানালো। 'ঘুম থেকে উঠেই দেখলাম নেই। আন্টিকে জিজ্ঞেস করলাম। বাইরে যাচ্ছে বলে নাকি বেরিয়ে গেছে কিশোর। কোথায় যাবে বলে যায়নি। তারপর থেকে এই বসেই আছি।'

একটা চেয়ারে বসলো রুচি। 'সাইকেলওয়ালাকে পাকড়াও করার কোন উপায় করতে পেরেছো? কোন বুদ্ধি-টুদ্ধি?'

নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো দুই সহকারী গোয়েন্দা।

আধ ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। তবু কিশোর ফিরলো না।

আরও পাঁচ মিনিট পর দেখা গেল তাকে। ঢুকছে গেট দিয়ে।

'কিশোওর!' চিৎকার করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো মুসা।

'কোথায় গিয়েছিলে?' রবিন বললো। 'সারাটা সকাল তোমার জন্যে বসে আছি।'

হাসলো কিশোর। 'আসলে ঠিকমতো আলোচনা করতে পারলে কাল রাতেই সমস্যার সমাধান করে ফেলা যেতো। মাঝরাতে হঠাৎ খিদেয় ঘুম ভেঙে গেল। রাতে কম খেয়েছিলাম। তুমি আর মুসা জিজ্ঞেস করেছিলে না, গাড়ির কাঁচ কেন ভাঙে সাইকেলওয়ালা?'

'কেন!' প্রায় একই সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো অন্য তিনজন।

'সেটাই আলোচনা করবো এখন,' হাসলো গোয়েন্দাপ্রধান। 'এখন আমাদের বুঝতে হবে কেন উইণ্ডশীল্ড ভাঙে। আর তাহলেই জেনে যাবো লোকটা কে।'

নীরবে বসে রইলো তিন শ্রোতা। একে অন্যের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। তারপর তাকালো কিশোরের মুখের দিকে।

'আমি কিছুই বুঝতে পারবো না,' সাফ জানিয়ে দিলো রবিন।

রুচি বললো, 'না হয় কারণটা জানা গেলই, তাতে লোকটাকে চিনবো কি ভাবে? যে কেউ এ কাজ করে থাকতে পারে।'

'জানা যাবে,' দৃঢ়কণ্ঠে বললো কিশোর। 'গাড়ির কাঁচ কেন ভাঙে জানতে পারলে এটাও বুঝে যাবো কোন জায়গায় তাকে খুঁজতে হবে।'

'কি যে বলো কিছুই বুঝতে পারি না,' অনুযোগের সুরে বললো মুসা। 'ঠিক আছে, তোমার কথাই সই। মেনে নিলাম, উইণ্ডশীল্ড কেন ভাঙে বুঝতে পারলেই সমস্যার সমাধান হবে। এখন বলো, কেন ভাঙে? গাড়ির কাঁচ পছন্দ করে না বলে?'

'নাকি সে গাড়িই পছন্দ করে না? হিংসা? কেন লোকে চালাবে, আমি পারবো না, ওরকম কিছু?' রবিনের প্রশ্ন। 'সে জন্যেই গাড়ির ক্ষতি করে?'

'না,' মাথা নাড়লো কিশোর, 'ওসব নয়। তাহলে গাড়ির শুধু একটা বিশেষ কাঁচই ভাঙতো না। সব ভেঙে দিতো। কিংবা গাড়ির অন্য ক্ষতিও করতো। কিন্তু তা না করে যেন প্ল্যান করে খুব সাবধানে একটা করে কাঁচ ভাঙে। এমন একটা ভাব করে রাখতে চায়, যাতে লোকে মনে করে ব্যাপারটা নিছকই দুর্ঘটনা।'

'পাগল হতে পারে,' মুসা বললো, 'সেয়ানা পাগল। কাঁচ ভাঙতে ভালোবাসে, আবার ধরাও পড়তে চায় না।'

'পাগলের অতো সূক্ষ্ম বুদ্ধি হবে না,' কিশোর মানতে পারলো না মুসার কথা।

'হ্যাঁ, বড়লোকের ওপর অনেকের রাগ থাকে, তাদের ক্ষতি করতে পারলে খুশি হয়। আর রেগে গিয়ে মানুষ যখন কোন কাজ করে বুদ্ধি তখন ঘোলা হয়ে যায়। বোকামি কিংবা ভুল করে বসে। ওরকম কারো কাজ হলে এতোদিনে ধরা পড়ে যেতো।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক,' একমত হলো কচি।

'আসলে এই লোকটা পাগল-টাগল কিছু না,' কিশোর বললো। 'খুব বুদ্ধিমান। কাঁচও ভাঙছে, আবার অত্যন্ত চালাকির সঙ্গে লুকিয়েও রাখছে নিজেকে।'

'তাহলে হয়তো প্রতিশোধ,' রবিন বললো। 'কি বলো?'

'কার ওপর?'

'গাড়ি কোম্পানির ওপর।'

'সেটা আমেরিকায় কিংবা জাপানে হতে পারে, যেখানে গাড়ি তৈরি হয়। কোম্পানিতে কোম্পানিতে রেষারেষি থাকলে, প্রতিযোগিতা থাকলে সেটা ভাবা যেতো, যদিও গাড়ি কোম্পানির মতো বড় বড় প্রতিষ্ঠান এতো বাজে কাজ করবে না। আর বাংলাদেশে যেখানে গাড়ি তৈরিরই কোন কোম্পানি নেই, সেখানে এসবের প্রশ্নই ওঠে না।'

'তাহলে ওই কথাই ঠিক। গাড়ির মালিকদের ওপরই লোকটার রাগ।'

'অনেক গাড়ির কাঁচ ভাঙা হয়েছে, নথি,' কিশোর বললো। 'এতোগুলো মানুষের ওপর রাগ কিংবা ঘৃণা কোনটাই থাকতে পারে না একজনের।'

'তাহলে পাগলই,' মুসা বললো।

'কিন্তু পাগলের মতো আচরণ তো করছে না,' প্রতিবাদ করলো কচি।

'তাহলে আমি ফেল,' দুহাত নাড়তে নাড়তে বলল মুসা। হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, 'কেন ভাঙে শয়তানটাই জানে!'

'কিশোর,' সামনে ঝুঁকলো রবিন, 'ঈগলের ব্যাপারটা এর মধ্যে আনছি না কেন? এমনও তো হতে পারে সমস্ত সূত্র লুকিয়ে আছে ওটার মাঝেই? অন্য সব গাড়ির কাঁচ ভাঙা তার কাছে একটা বাহানা মাত্র। আসলে ভাঙতে চেয়েছে ওই একটা গাড়িরই কাঁচ, যেটাতে মুদ্রা ছিলো। আর মুদ্রা চুরির ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দেয়ার জন্যে, মানে, পুলিশের চোখ অন্য দিকে সরানোর জন্যেই এতোগুলো গাড়ির কাঁচ ভেঙেছে।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলালো কিশোর। 'তোমার কথায় যে যুক্তি একেবারেই নেই তা নয়। তবে সেক্ষেত্রে কাঁচ ভেঙে আরও জিনিস চুরি করতো, যাতে সবাই মনে করে কাঁচ ভাঙাই হয় চুরি করার জন্যে। সাধারণ চুরির মধ্যেই পড়ে গেছে মুদ্রা চুরির ব্যাপারটাও। তাই না?'

'তাহলে...' আবার ভাবতে আরম্ভ করেছে মুসা। কথা শেষ করলো না।

'আর কি কারণ হতে পারে?' মুসার কথাটাই যেন শেষ করলো কচি।

'আমিও আর কিছু ভেবে পাচ্ছি না,' মাথা নাড়লো রবিন।

'ভাবলে আরও অনেক সম্ভাবনা বেরিয়ে আসতে পারে,' কিশোর বললো। 'তবে মুসার কাল রাতের একটা কথা আমার কাছে খুব মূল্যবান মনে হয়েছে।'

'আমি বলেছি!' মুসা অবাক। 'কাল রাতে?'

'হ্যাঁ, বলেছো। তুমি বলেছো, গাড়ির কাঁচ ভেঙে কার কি লাভ?'

চোখ মিটমিট করতে লাগলো অন্য তিনজন।

'লাভ?' ভুরু কুঁচকে বললো কচি। 'গাড়ির কাঁচ ভেঙে লাভ?'

'বুঝেছি!' তুড়ি বাজিয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো মুসা। তারপর বসে পড়লো আবার ধীরে ধীরে। 'ঠিক, লাভ! তাদের লাভ, যারা গাড়ির জানালার কাঁচ বানায়, কিংবা সাপ্লাই দেয়!'

'ঠিক, ঠিক!' রবিনও উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। 'বাংলাদেশে নিশ্চয় ওরকম কাঁচ তৈরির কোন কোম্পানি নেই। বাকি রইলো যারা সাপ্লাই দেয়। বিদেশ থেকে আমদানী করে। আর নিশ্চয় ওই কাঁচ আমদানী কোন একটা প্রতিষ্ঠানই করে থাকে। একচেটিয়া ব্যবসা।'

'ঠিক এই কথাটাই আমি বলতে চাইছি, নথি,' হাসিমুখে বললো কিশোর। 'যারা কাঁচ আমদানী করে। গাড়ির কাঁচ ক্রমাগত ভাঙতে থাকলে তাদেরই লাভ। কারণ কাঁচ ছাড়া গাড়ি চালানো সম্ভব নয়। বাধ্য হয়েই নতুন আরেকটা লাগাতে হবে মালিককে। আরও একটা ব্যাপার কি লক্ষ করেছো? শুধু টয়োটা গাড়িরই কাঁচ ভাঙে। তারমানে শুধু টয়োটার কাঁচই আমদানী করে তারা।'

'তেমন প্রতিষ্ঠান আছে এদেশে?' কচির প্রশ্ন। 'খোঁজ লাগাতে হয়।'

'নিশ্চয় আছে। সকালে সেটা খুঁজতেই বেরিয়েছিলাম,' কিশোর বললো। 'কয়েকটা মেকানিক শপে খোঁজ নিয়েছি। সবাই একটা নামই বললো। গাড়ির ওই কাঁচ একটা কোম্পানিই আমদানী করে। মডার্ন গ্লাস কোম্পানি।'

তের

লাল রঙা একটা পাকা বাড়ি। একতলা। পেছনে আরও তিনটে বাড়ি, পাকা দেয়াল, ওপরে টিনের চাল। এক সীমানার মধ্যেই বাড়িগুলো, কাঁটাতারের ছয় ফুট উঁচু বেড়া দিয়ে ঘেরা। এই হলো মডার্ন গ্লাস কোম্পানি। জায়গাটা শহরের বাইরে, খিলক্ষেত এলাকায়। উত্তরা এবং গুলশানের মাঝামাঝি, দুটো জায়গা থেকেই বেশি দূরে নয়। সামনের দিকে মূল গেট ছাড়াও ডেলিভারি ট্রাক আর কর্মচারীদের ঢোকার জন্যে আরেকটা গেট আছে একপাশে। সামনের বিল্ডিংটায় অফিস আর শো রুম। পেছনের টিনের চালাওয়ালাটা গুদাম। লাল বাড়িটার পাশে বেশ ছড়ানো একটা চত্বর রয়েছে। ওখানে গিয়ে ট্রাক কিংবা অন্য গাড়ি দাঁড়ায়, মাল বোঝাই করার জন্যে। গাড়ি পার্ক করার জায়গাটা এখন অর্ধেক খালি।

'কোম্পানির মালিকই কি কাঁচ ভাঙে?' প্রশ্ন করলো রবিন।

'ঠিক নেই,' জবাব দিলো কিশোর। 'তবে সে সম্ভাবনাও কম।'

পাশে ছোট একটা মার্কেট তৈরি হচ্ছে। ওটার ছাতে দাঁড়িয়ে কাঁচ কোম্পানির ওপর নজর রেখেছে তিন গোয়েন্দা আর কচি।

'সেলসম্যানের কাজও হতে পারে,' নিচের চত্বরের দিকে তাকিয়ে বললো কিশোর। 'যতো বেশি কাঁচ বিক্রি করবে ততো বেশি কমিশন পাবে। কমিশনের লোভেই হয়তো ভাঙে। কিংবা নতুন সেলসম্যান রাখা হয়েছে। মালিককে খুশি করার জন্যে সে এই কাজ করে বা করায়। অন্য কোন কর্মচারীর কাজও হতে পারে। একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক কাঁচ বিক্রি না হলে চাকরি খোয়ানোর ভয় আছে হয়তো তার।'

'সেটা জানবো কিভাবে?' কচি বললো। 'চেহারাই তো দেখিনি।'

'চেহারা না দেখলেও শরীর দেখেছি। লম্বা, পাতলা, সম্ভবত কম বয়েসী। বয়স্ক লোকেরা সাধারণত ওরকম টেন-স্পীড সাইকেল চালায় না।'

তাকিয়েই রয়েছে ছেলেরা। প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে নিচের কাজকর্ম দেখছে। মূল বাড়িটার মুখ রাস্তার দিকে নয়, ডানের পার্কিং লটের দিকে। বাঁয়ে আরেকটা আছে, সেটাতে শুধু ট্রাক কিংবা ভ্যানগাড়ি ঢোকে, মাল বোঝাইয়ের জন্যে। আর ঢোকে খুচরা খরিদ্দার। নানা রকম গাড়ি আসছে যাচ্ছে সেখানে—পিকআপ, ভ্যান, কার। সব টয়োটা। এবং সবগুলোর কাঁচ ভাঙা।

'দেখে তো মনে হয় পাইকারী বিক্রি করে এরা,' মুসা বললো কিছুটা অবাক হয়েই। 'তাহলে ওই গাড়িগুলো আসছে কেন এতো বেশি?'

'শুধু পাইকারী বিক্রিতে বোধহয় চলছিলো না আর,' জবাবটা দিলো কচি। 'খুচরাও শুরু করেছে।'

মূল বাড়িটার সামনের দিকের দেয়াল প্রায় পুরোটাই কাঁচের। ভেতরে অফিস। ডেস্ক, চেয়ার, ফাইলিং কেবিনেট দেখেই বোঝা যায়। গুদাম থেকে বড় বড় চ্যাপ্টা বাক্স এনে তোলা হচ্ছে বাঁয়ের চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ট্রাকে। ওটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে আরেকটা ট্রাক, মাল বোঝাই। সেটা থেকে মাল খালাস করে নিয়ে গিয়ে ভরা হচ্ছে গুদামে। দু-তিনজন লোক অফিস থেকে কিছুক্ষণ পর পরই বেরিয়ে এসে গুদামে ঢুকছে, বাদামী কাগজে মোড়া চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা প্যাকেট বয়ে নিয়ে আবার চলে যাচ্ছে অফিসে। বুঝতে অসুবিধে হয় না প্যাকেটগুলোতে রয়েছে কাঁচ। গাড়ি নিয়ে যারা আসছে তাদের অনেকেই কিনে নিয়ে যাচ্ছে ওই কাঁচ।

'কাউকেই কিন্তু সাইকেলওয়ালার মতো লাগছে না,' কর্মচারীদের কথা বললো কচি।

'না,' একমত হলো কিশোর। 'ওই লোকটা নিশ্চয় অফিসে কাজ করে। কোনো কেবিনে বসে রয়েছে, কিংবা গুদামের ভেতর। গুদাম-কর্মচারীও হতে পারে। আর সেলসম্যান হলে তো অফিসে থাকবে না। নিশ্চয় বেরিয়ে গেছে দোকানে দোকানে

খোঁজ নিতে, কার কি মাল লাগবে।'

মাল নামানো হয়ে গেলে বেরিয়ে গেল ট্রাক। যেটাতে বোঝাই হচ্ছিলো, সেটা রইলো, মাল তোলা এখনও শেষ হয়নি।

'কি করবো, কিশোর?' রবিন জিজ্ঞেস করলো। 'এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখবোই?'

'না, খালি হওয়ার অপেক্ষা করছি,' জবাব দিলো কিশোর। 'ট্রাকগুলো চলে গেলেই গুদামের সামনেটা খালি হয়ে যাবে। মাল খালাস কিংবা বোঝাইয়ের কাজ না থাকলে গুদামের ভেতরেও লোক থাকবে বলে মনে হয় না। তখন কচিকে নিয়ে আমি যাবো অফিসের দিকে। কথা বলার চেষ্টা করবো কর্মচারীদের সঙ্গে। শো রুমের জিনিস দেখার ভান করবো। এই সুযোগে তুমি আর মুসা গিয়ে গুদামে ঢুকবে। সূত্র খুঁজবে।'

'কি সূত্র?' মুসা জিজ্ঞেস করলো।

'সাইকেলওয়ালাকে ধরা যায় এরকম কিছু?'

'আর তোমরা কি জিজ্ঞেস করবে?'

'আমি না, জিজ্ঞেস করাবো কচিকে দিয়ে। ওর ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে। তাছাড়া ওদের গাড়ির কাঁচ ভেঙেছে চার চারবার। কাঁচের কথাই জিজ্ঞেস করবে ও। দামদর জানবে।'

'ঠিক আছে,' বললো রবিন।

আরও আধ ঘণ্টা কাজ চললো গুদামের সামনের চত্বরে। তারপর বেরিয়ে গেল ট্রাক। চত্বর খালি হয়ে গেল।

'সময় হয়েছে,' কিশোর বললো অবশেষে। 'মুসা, রবিন, মনে রাখবে খুব বাজে একটা লোককে নিয়ে কারবার করছি আমরা। বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে যে কোন সময়। সাইকেলওয়ালা এখানে আছে এরকম কোন চিহ্ন দেখলে গুদামের সামনের দরজা কিংবা জানালায় চকের দাগ দিয়ে রাখবে। আশ্চর্যবোধক চিহ্ন। আমি আর কচি সঙ্গে সঙ্গে তখন বাড়ি চলে যাবো। মামাকে বলে পুলিশ নিয়ে ফিরে আসবো।'

ছাতের ওপর থেকে নেমে এলো ওরা। অর্ধেক হয়ে বন্ধ হয়ে আছে মার্কেট তৈরির কাজ। বোধহয় টাকা-পয়সার অভাবেই। লোকজন কেউ নেই। ছাতে উঠতে তেমন বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। নামতেও জবাবদিহি করতে হলো না।

গ্লাস কোম্পানির পাশের দরজাটাও খোলা, সামনেরটাও। এদিক ওদিক তাকিয়ে চট করে ঢুকে পড়লো মুসা আর রবিন। গুদামের দিকে এগোলো।

কচিকে নিয়ে কিশোর ঢুকলো শো রুমে। চারজন খরিদ্দার দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সঙ্গে কথা বলছে তিনজন সেলসম্যান। কাউন্টারের ওপাশে বিরাট বিরাট তাক নানা রকম কাঁচে বোঝাই। কিছু কাঁচ আছে নকশা করা, কিছু নকশা ছাড়া।

সাদা কাঁচ আছে, রঙিন কাঁচ আছে। এসবই বাড়ি-ঘরের জানালার শার্সিতে লাগানো হয়। খরিদ্দাররা দেখে, পছন্দ করে, অর্ডার দেয়।

বাঁয়ের কাঁচের দেয়ালের ওপাশে আরেকটা ঘর। অফিস। একজন মহিলা আর দুজন পুরুষ কর্মচারীকে দেখা যাচ্ছে।

খরিদ্দারদের পেছনে দাঁড়িয়ে সেলসম্যানদের দেখছে কিশোর। তাদের একজন মোটাসোটা বয়স্ক মানুষ। আরেকজন লম্বা, পাতলা, তরুণ। চোখে চোখে কথা হয়ে গেল কচি আর কিশোরের। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে সামান্য মাথা ঝাঁকালো ওরা।

কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে এখন কথা বলছে দুজন খরিদ্দার।

এই সুযোগে চারপাশে চোখ বোলাতে লাগলো কিশোর। কাঁচের দেয়ালের ওপাশের মহিলা তরুণী। যথেষ্ট লম্বা, প্রায় পুরুষের সমান, পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি। পুরুষদের একজন লম্বা, মাঝবয়েসী। কোণের দিকে কাঁচে ঘেরা একটা খুপরিমতো ঘরে বসে আছে। একা। খুপরির কাঁচের দেয়ালে লেখা রয়েছে ঃ

শরাফত আহমেদ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

তারমানে ওই লোকটাই এই কোম্পানির মালিক। বেশ বড় একটা ডেস্কের ওপাশে বসে আছে লম্বা আরেকজন মানুষ। বয়েস প্রৌঢ়ত্বের কোঠা ছাড়িয়ে গেছে। ডেস্কে তার পদবী লেখা প্ল্যাস্টিকের বোর্ড দাঁড়িয়ে রয়েছে ঃ

জেনারেল ম্যানেজার।

'কিশোর!' কানের কাছে ফিসফিস করে উঠলো কচির কণ্ঠ।

ঝট করে ফিরে তাকালো কিশোর। সেলসম্যানদের একজন, সেই তরুণ লোকটা হেঁটে যাচ্ছে পাশের দরজার দিকে। গুদামে যাওয়ার চত্বরে বেরোনোর পথ ওটা।

চোদ্দ

কিশোরদেরকে ভেতরে ঢুকে যেতে দেখলো মুসা আর রবিন। চত্বরে অপেক্ষা করলো আর মিনিট দুয়েক। কাউকে আসতে না দেখে দ্রুতপায়ে এগোলো গুদামের দিকে। নির্জন। কেউ নেই। মূল বাড়িটার পেছনে গুদামের দিকে মুখ করে রয়েছে একটিমাত্র জানালা। দরজা আছে। সব বন্ধ।

আরেকবার এদিক ওদিক তাকিয়ে চট করে গুদামে ঢুকে পড়লো দুজনে।

ভেতরে আলো কম। জানালা নেই। দরজা দিয়ে যা আসছে তাতে ভেতরের অন্ধকার কাটছে না। ফলে সারাক্ষণ বৈদ্যুতিক আলো জ্বেলে রাখতে হচ্ছে। সারি সারি তাক, ওগুলোতে নানা রকমের প্যাকেট আর বাক্স। মেঝেতে একটার ওপর আরেকটা সাজিয়ে স্তূপ করে রাখা হয়েছে ছোট-বড় কাঠের বাক্স। বাদামী কাগজে

মোড়া অনেক কাঁচ দেখা গেল একটা তাকে। কান পেতে রইলো কিছুক্ষণ দুজনে। নিশ্চিত হয়ে নিলো ভেতরে ওরা ছাড়া আর কেউ নেই।

লম্বা শেলফগুলোর মধ্যে দিয়ে রয়েছে চলাচলের জন্যে সরু গলিপথ। সে পথে এগোলো ওরা। তাকের মধ্যে ফাঁক দেখলেই উঁকি দেয়, মাথা নিচু করে তাকায় শেলফের নিচের ফাঁকে। সাইকেলওয়ালার ব্যবহৃত জিনিসের চিহ্ন খুঁজছে।

কিছুই পাওয়া গেল না।

গুদামের শেষ প্রান্তে পার্টিশন দিয়ে ছোট একটা অফিস করা হয়েছে। তবে সেটা বোধহয় এখন আর অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। কারণ ওটার ভেতরেও বাক্স বোঝাই করে রাখা হয়েছে। অফিসের জিনিসপত্র রাখার একমাত্র কাঠের আলমারিটা এখন খালি। ব্যবসা বোধহয় খারাপ যাচ্ছে, লোক ছাঁটাই করতে বাধ্য হয়েছে মালিক।

আবার গুদামের সামনের দিকে চলে এলো ওরা। ভেতরে আরও খুঁজে দেখার ইচ্ছে আছে। তবে তার আগে দেখে নিশ্চিন্ত হতে চায় যে কেউ আসছে না। আগের মতোই নির্জন চত্বর। সামনের গেট দিয়ে গাড়ি আসা-যাওয়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু কোন গাড়িই পাশের গেট দিয়ে ঢুকছে না।

'কেউ নেই···' বলতে গিয়েই থেমে গেল মুসা।

'কি হলো!' তার পাশে এসে দাঁড়ালো রবিন।

দুজনেই দেখতে পাচ্ছে, খুলে যাচ্ছে মূল বিল্ডিং থেকে চত্বরে বেরোনোর দরজা।

তিন লাফে কাউন্টারের শেষ মাথায় চলে এলো কিশোর। ওদিকেই চত্বরে বেরোনোর দরজাটা। হাত নেড়ে ডেকে বললো, 'এই যে ভাই, শোনেন। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। আমার কথাটা খুব জরুরী।'

'আসছি,' দরজা ঠেলে খুলতে খুলতে বললো লোকটা। 'বেশি দেরি হবে না।'

'এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে,' রেগে যাওয়ার ভান করলো কিশোর। 'কথা বলছেন তো বলছেনই। আমাদের কি চোখে পড়ে না? মালিক কে আপনাদের? তাঁর সঙ্গে কথা বলবো।'

দরজার হাতলে হাত রেখেই থমকে গেল সেলসম্যান। দ্বিধা করছে। এ রকম করে যখন কথা বলছে নিশ্চয় হোমড়া চোমড়া কারও ছেলে।

'মালিক কে?' কড়া গলায় আবার জিজ্ঞেস করলো কিশোর। হাত তুলে কাঁচের অফিসে একলা বসা মানুষটাকে দেখিয়ে বললো, 'উনি?···এই কচি, এসো, বাবার কথা গিয়ে বলি। বলবো, আমাদেরকে পাত্তাই দেয়নি আপনাদের সেলসম্যান।'

'চলো,' কিশোরের অভিনয় দেখে মনে মনে অবাক না হয়ে পারলো না কচি।

যা বোঝার বুঝে গেল সেলসম্যান। এই ছেলেকে বেশি ঘাঁটানো উচিত হবে

না। চাকরি চলে যেতে পারে তাহলে। দরজার হাতল ছেড়ে দিয়ে কাউন্টারের কাছে ফিলে এলো সে। জিজ্ঞেস করলো, 'কি চাই?'

'একটা রোলস রয়েসের কাঁচ,' গম্ভীর মুখে বললো কিশোর। ভেতরে ভেতরে পেট ফেটে যাচ্ছে হাসিতে।

'রোলস রয়েস!' বিস্ময়ে ভুরু উঁচু হয়ে গেল সেলসম্যানের। 'এতো দামী গাড়ির কাঁচ পাবো কোথায়?'

'সেটা আমি কি জানি? বাবা বলে পাঠালো নিয়ে যেতে, নিতে এলাম।'

'কোন মডেলের? মডেল জানলে বলতে পারবো। টয়োটার কোন কাঁচ ওটায় লাগে কিনা দেখা যেতে পারে।'

'উনিশশো সাঁইতিরিশ মডেলের সিলভার ক্লাউড,' আমেরিকায় যে গাড়িটাতে চড়ে ওরা, হ্যানসন চালায়, সেটার কথা বলে দিলো কিশোর।

মরা মাছের মতো হাঁ হয়ে গেল সেলসম্যানের মুখ। ঢোক গিললো। ফ্যাকাশে মুখে রক্ত ফিরতে সময় লাগলো। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো, 'নামই শুনিনি কখনও, দেখা দূরে থাক। গাড়িটা কি নিয়ে এসেছো?'

'আপনি করে বলুন,' ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো কিশোর। 'তুমি শুনতে ভালো লাগে না আমার।...না, গাড়ি আনিনি।'

'তাহলে দয়া করে যদি ড্রাইভারকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও...মানে, দেন, তাহলে চেষ্টা করে দেখতে পারি টয়োটার কাঁচ ফিট্ করে কিনা।'

দরজা খুলতে দেখে বরফের মতো জমে গেছে রবিন ও মুসা। ওদের মনে হলো অনন্ত কাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে ওরা খোলা চত্বরে রোদের মাঝে, আর খুলেই চলেছে দরজাটা। এই খোলার যেন আর শেষ নেই।

তারপর ধীরে ধীরে আবার বন্ধ হয়ে গেল।

'হাউফ!' করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো মুসা।

'এসো,' তাড়া দিলো রবিন। 'জলদি ঢুকে পড়ি ওটায়।' দুই নম্বর গুদামটা দেখালো সে।

প্রায় দৌড়ে এসে দ্বিতীয় গুদামে ঢুকলো ওরা। এটার ভেতরটাও প্রথমটারই মতো অন্ধকার। আলো জ্বেলে রাখতে হয় সর্বক্ষণ। সারি সারি তাক। তবে তাকগুলোর বেশির ভাগই খালি।

প্রথম ঘরটার মতোই এটাতেও খুঁজতে শুরু করলো ওরা। এখানেও কিছু পেলো না। আরেকবার এসে উঁকি দিলো দরজায়। কাউকে দেখা গেল না। মূল বাড়ি থেকে বেরোলো না কেউ। চত্বরে বেরিয়ে একছুটে এসে ঢুকলো তৃতীয় এবং সব চেয়ে ছোট গুদামটায়। অন্য দুটোর মতোই এটাতেও আলো কম। কিছু মালপত্র রয়েছে কয়েকটা তাকে। ঘরের মাঝখানে একটা বড় টেবিল। তার ওপর কাঁচ কাটার

যন্ত্রপাতি। পাশে কয়েকটা লম্বা লম্বা টুলও রয়েছে। কাজ হয় ওগুলোতে।

বাঁয়ের শেলফগুলো ধরে পেছনে এগোলো রবিন। মুসা এগোলো ডান পাশ দিয়ে। চোখে লাগার মতো কিছুই দেখতে পেলো না। এই গুদামের পেছনেও পার্টিশন দেয়া একটা ছোট অফিস রয়েছে। জিনিসপত্রে ঠাসা।

'রবিন!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।

অফিসের পেছনের দেয়াল ঘেঁষে কয়েকটা বাক্সের ওপর তেরপল টেনে দেয়া ছিলো। সেটা সরাতেই বেরিয়ে পড়েছে একটা টেন-স্পীড বাইসাইকেল। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড় করানো।

'এইটাই?' রবিন এলে আবার বললো মুসা।

'কি জানি!' দ্বিধা করলো রবিন। 'অন্ধকারে দেখেছি। রঙ-টঙ তো দেখিনি। তবে এ রকম সাইকেলও এ শহরে দেখিনি আর। এটাই হবে।'

'সীটটা কিন্তু বেশ উঁচু। লম্বা মানুষের মাপে বসানো।'

আরও ভাল করে দেখার জন্যে এগোতে গেল মুসা। হাতের ধাক্কায় উল্টে পড়ে গেল ওপরের একটা বাক্স।

রবিন আর মুসা দুজনেই আশঙ্কা করেছিলো ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙবে। কিন্তু তেমন আওয়াজ হলো না। তবে কি কাঁচ নেই ভেতরে?

বাক্সটা সোজা করে বসিয়ে ডালা তুলে দেখলো মুসা। তারপরেই অস্ফুট শব্দ করে উঠলো। কি আছে দেখার জন্যে রবিনও এসে উঁকি দিলো ভেতরে।

পাওয়া গেল একটা ক্যাপ, চশমা, ব্যাকপ্যাক, তার ভেতরে রেডিও, হেডফোন, হলদে রঙের একটা স্পোর্টসম্যানদের জামা, কালো পায়জামা, আর সাইকেল চালানোর উপযোগী একজোড়া কেডস জুতো।

সেলসম্যানকে ওদিকে ব্যস্ত রেখেছে কিশোর, 'বেশ, ধরুন, এখানকার কোন কাঁচ ফিট করলো না। আনিয়ে তো দিতে পারবেন?'

'তা-ও জানি না,' জবাব দিলো লোকটা। 'তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি। অনেক সময় লাগবে। যে মডেলের কথা বলছেন, সিঙ্গাপুরেও পাওয়া যাবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ফ্যাক্টরিতে অর্ডার দিয়ে বানিয়ে আনাতে হবে। প্রচুর দাম পড়ে যাবে তাতে।'

'পড়লে পড়বে,' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়লো কিশোর। 'ভাঙা কাঁচ না বদলে তো আর গাড়ি চালানো যায় না।'

'তা বটে,' স্বীকার করলো সেলসম্যান। মুখ দেখেই আন্দাজ করা গেল মনে মনে বলছে, *ব্যাটা তোদের টাকা তোরা পানিতে ঢালবি, তাতে আমার কি?*

'গুড,' লোকটার কথায় খুব যেন সন্তুষ্ট হয়েছে কিশোর, এমন ভঙ্গি করলো। তারপর বললো, 'আরেকটা গাড়ির কাঁচ লাগবে। ক্যাডিলাক। উনিশশো সাতান্ন...'

'কিশোর!' ডেকে উঠলো জানালায় দাঁড়ানো কচি। উত্তেজনায় শক্ত হয়ে গেছে।

'কী?' বিরক্ত ভঙ্গিতে চোখমুখ কুঁচকে ফেললো কিশোর। তারপর যেন নেহায়েত অনিচ্ছার সঙ্গেই এগিয়ে গেল। ধমকের সুরে বললো, 'কথা বলছি যে দেখো না?' কচির পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। কি দেখে ডাকা হয়েছে তাকে, দেখিয়ে দেয়ার প্রয়োজন হলো না। কচির মতো সে-ও দেখলো, ছোট গুদামটার জানালায় বড় করে চকে আঁকা আশ্চর্যবোধক।

'আহ্, জ্বালিয়ে মারলো!' বিরক্ত স্বরে বললো সে। 'সময় অসময় বোঝে না!'

সেলসম্যানকে পুরোপুরি অন্ধকারে আর বিস্মিত করে রেখে কচিকে নিয়ে বেরিয়ে এলো কিশোর।

বাইরে বেরিয়ে আর হাসি চাপতে পারলো না।

কচিও হাসতে হাসতে হাত নেড়ে বললো, 'যা গুল মারতে পারো না তুমি! রোলস রয়েস, ক্যাডিলাক···এমন করে বলছিলে, আমারই বিশ্বাস করে ফেলতে ইচ্ছে করছিলো। সেলসম্যানের আর কি দোষ?' কিশোরের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হেসে রসিকতার সুরে জিজ্ঞেস করলো, 'তা এদেশে তোমার কোটিপতি বাবাটি কে হে?'

'হেফাজত আলি পাটোয়ারি,' হেসেই জবাব দিলো কিশোর। 'নাম শোনোনি? আগে কাগজ ফেরি করে বেচতো, এখন করে সোনার ব্যবসা, গোল্ড স্মাগলার। শুনতে খুব ভালো লাগে, না? কি গালভরা নাম। মানুষকে বলেও শান্তি। প্রচুর টাকা আছে আব্বা হুজুরের। আর আছে কয়েক ডজন পোষা সন্ত্রাসী। কেউ কিছু বললেই ঠিচু,' বলে পিস্তলের ট্রিগার টেপার ভঙ্গি করলো সে। 'সে জন্যেই তো কাউকে কেয়ার করি না। মুখের ওপর যা খুশি বলে দিই।···নাও, চলো এখন, পুলিশকে খবর দিতে হবে।'

গুদামের জানালার নিচে ঘাপটি মেরে বসে আছে রবিন আর মুসা। ওরা যে জিনিস পেয়েছে সেটা বোঝানোর জন্যে জানালায় চিহ্ন আঁকার পর পেরিয়ে গেছে দশটি মিনিট।

'আধ ঘন্টার বেশি লাগবে না,' হিসেব করে বললো রবিন। 'বাসে কিংবা বেবিতে করে বাড়ি যাওয়া, মামাকে দিয়ে থানায় টেলিফোন করানো, তারপর থানা থেকে পুলিশ নিয়ে আসা···ওই আধ ঘন্টাই যথেষ্ট।'

'ওকে যদি আমরা ধরতে পারতাম ভালো হতো,' মুসা আফসোস করলো।

'হয়তো হতো। তবে তার জন্যে দুঃখ করার কিছু নেই। রহস্যের কিনারা তো আমরাই করলাম। ধরার চেষ্টা হয়তো এখনও করা যায়, কিন্তু উচিত হবে না। ব্যাটার কাছে পিস্তল-টিস্তল থাকতে পারে। এয়ার পিস্তল তো আছেই।'

'কিন্তু তার পরেও…' বলতে গিয়ে থেমে গেল মুসা।

পাশের গেট দিয়ে ঢুকলো একটা নীল রঙের গাড়ি। তীব্র গতিতে চত্বরে ঢুকে এতো জোরে ব্রেক কষলো, কর্কশ আর্তনাদ করে উঠলো টায়ার। গাড়ি থেকে নেমে গটগট করে এগোলো এক তরুণ।

'মুসা, দেখো দেখো!' ফিসফিসিয়ে বললো রবিন।

লম্বা, পাতলা শরীর। চেহারা ফ্যাকাশে, যেন রক্তশূন্যতায় ভুগছে। লম্বা লম্বা চুল নেমে এসেছে ঘাড়ের ওপর। গায়ে নীল স্পোর্টস জ্যাকেট। খাড়া পাতলা ঠোঁট। চঞ্চল চোখের তারা, যেন সার্বক্ষণিক দ্বিধায় অস্থির। ধূসর প্যান্ট পরনে, পায়ে কালো চকচকে জুতো। মূল বাড়িটার দিকে এগোচ্ছে। কেমন একটা কর্তৃত্বময় ভঙ্গি, যেন কোম্পানিটার মালিক সে-ই।

'সাইকেলওয়ালার সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে,' নিচু গলায় বললো রবিন।

বাড়িটায় গিয়ে ঢুকলো সে।

ঘড়ি দেখলো মুসা। 'গাড়ির নম্বরটা নিয়ে রাখা দরকার। পুলিশ আসার আগেই চলে যেতে পারে।'

নোটবুকে নম্বর লিখছে মুসা, এই সময় ঝটকা দিয়ে খুলে গেল চত্বরে বেরোনোর দরজা, প্রায় ছুটে বেরিয়ে এলো লম্বা লোকটা। দ্রুতপায়ে চত্বর পেরিয়ে এগোলো মুসা আর রবিন যে গুদামটায় লুকিয়ে আছে সেটার দিকে।

'আরি, এদিকেই তো আসছে!' আঁতকে উঠলো রবিন।

লুকানোর জায়গা খুঁজতে শুরু করলো দুজনেই।

'জলদি!' মুসা বললো, 'শেলফের নিচে!'

দরজার কাছেই একটা বড় বাক্সের পেছনে শেলফের নিচে কিছুটা খালি জায়গা পাওয়া গেল লুকানোর মতো। হামাগুড়ি দিয়ে কোনোমতে তার মধ্যে গিয়ে ঢুকলো দুজনে।

এতো জোরে দরজা খুললো তরুণ, দড়াম করে গিয়ে পাল্লাটা বাড়ি খেলো দেয়ালের সঙ্গে। কোনো দিকে না তাকিয়ে দুটো শেলফের মাঝখান দিয়ে পেছন দিকে প্রায় দৌড়ে গেল সে। ওর জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলার শব্দও কানে আসছে গোয়েন্দাদের। আবার যখন বেরিয়ে এলো, মাথায় ক্যাপ পরা, বিচিত্র চশমাটা ঝুলছে গলায়, সাইকেল চালানোর কাপড়গুলো ঢোকানো ব্যাকপ্যাকে। ব্যাগটা ঝুলছে সাইকেলের হ্যাণ্ডেলবারে।

'সমস্ত প্রমাণ নিয়ে যাচ্ছে!' হিসিয়ে উঠলো মুসা। 'নষ্ট করে ফেললে গেল! আর প্রমাণ করা যাবে না সে-ই কাঁচ ভাঙতো!'

'থামানো তো যাবে না! যা খুশি করে বসতে পারে!'

কিন্তু ততোক্ষণে বেরোতে শুরু করে দিয়েছে মুসা। একবার দ্বিধা করে রবিনও তাকে অনুসরণ করলো।

'জিনিসগুলো গাড়িতে তুলছে ব্যাটা!' আরেকবার হিঁসিয়ে উঠলো মুসা।

গাড়ির পেছনের বুটে সাইকেলটা ঢোকানোর চেষ্টা করছে ও।

'আমার কাছে তো মোটেও ভয়ঙ্কর লাগছে না লোকটাকে,' মুসা বললো। 'অতো ভয় পাচ্ছি কেন?' রবিন প্রতিবাদ করার আগেই লাফিয়ে উঠে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

তাকে দেখেই সাইকেলটা ফেলে দিলো লোকটা। তাড়াতাড়ি গিয়ে উঠে বসলো গাড়িতে। ছুটতে শুরু করলো মুসা।

ফিরে তাকালো আবার লোকটা। জানালা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে ডান হাত। হাতে ধরা বিকট চেহারার একটা পিস্তল।

মুসার দিকে তাক করেছে!

পনের

'মডার্ন গ্লাস কোম্পানি!' ভুরু কুঁচকে বললেন আরিফ সাহেব। 'অসম্ভব! কিশোর, ওটার মালিককে আমি ভালো করেই চিনি। ভদ্রলোক।'

'কিন্তু আমাদের কাছে প্রমাণ আছে,' জোর গলায় বললো কিশোর। 'মুসা আর রবিন দেখতে পেয়েছে।'

'ভুল করছিস না তো?'

'না।'

এক মুহূর্ত গম্ভীর হয়ে রইলেন আরিফ সাহেব। চুপচাপ ভাবলেন। তারপর হাত বাড়ালেন ফোনের দিকে।

তিনি যতোক্ষণ থানার সঙ্গে কথা বললেন, ততক্ষণ অস্থির হয়ে পায়চারি করলো কিশোর। সোফায় বসে উসখুস করছে উত্তেজিত কচি। ঘড়ি দেখছে বার বার। শেষে আর থাকতে না পেরে বলেই ফেললো, 'কিশোর, ওরা কোনো বিপদে পড়বে না তো?'

'এসব কাজে সব সময়ই বিপদ থাকে,' ভারি গলায় জবাব দিলো কিশোর। 'বিশেষ করে যখন কোনো প্রমাণ আটকাতে যাও তুমি। আর সেই সাথে যুক্ত থাকে লাখ লাখ টাকার ব্যাপার।'

এই সময় রিসিভার রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন আরিফ সাহেব। বললেন, 'ওরা রেডি। চলো, থানায় যাবো। আমরা গেলেই ওরা রওনা হবে।'

'তুমি শিওর তো, কিশোর?' কাঁচ কোম্পানির দিকে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলেন সার্জেন্ট। 'কোম্পানির কোনো লোকেরই কাজ এসব?'

'এছাড়া আর কি?' শান্তকণ্ঠে বললো কিশোর। 'ভালোমতো ভাবলে আপনারাও আমার সঙ্গে একমত হবেন। ওরাই একমাত্র কোম্পানি, যারা টয়োটা গাড়ির কাঁচ আমদানী করে। কাঁচ ভাঙলে নতুন কাঁচ লাগাতেই হবে, নইলে গাড়ি

চালানো যায় না। যতো বেশি কাঁচ বিক্রি করতে পারবে ততো বেশি লাভ কোম্পানির।'

'শরাফত সাহেবের মতো ভদ্রলোক এরকম কাজ করবেন, আমার বিশ্বাস হয় না।'

'হয়তো তিনি জানেনই না যে এসব ঘটছে। আর হয়তো বলছি কেন, সত্যি তিনি জানেন না। ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেল কেলেঙ্কারি হবে, তাঁর ব্যবসা নষ্ট হয়ে যাবে। গাড়ির কাঁচ কিছু বেশি বিক্রি হলে লাভ হবে বটে, কিন্তু যেটুকু হবে, জানাজানি হয়ে গেলে ক্ষতি হবে তার চেয়ে বেশি। সামান্য ওই লাভের জন্যে তিনি পুরো ব্যবসার ওপর ঝুঁকি নেবেন না।'

'ঠিকই বলেছিস তুই, কিশোর,' আরিফ সাহেব বললেন। জীপে পুলিশের গাড়িতে না বসে আরিফ সাহেবের গাড়িতেই বসেছেন ওসি সাহেব। জীপে অন্যান্য পুলিশদের সঙ্গে রয়েছেন সার্জেন্ট আবদুল আজিজ। রেডিওতে ওসির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন তিনি।

মডার্ন গ্লাস কোম্পানির কাছে চলে এলো ওরা। কিশোর বললো, 'পাশের দরজাটা দেখছি খোলাই আছে।'

মাথা ঝাঁকালেন ওসি। রেডিওতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন সার্জেন্টকে। গ্লাস কোম্পানির পাশের গেটের দিকে ঘুরলো পুলিশের জীপ, এই সময় শাঁ করে বেরিয়ে এলো একটা নীল রঙের টয়োটা। পুলিশ দেখে যেন চমকে গেল। বেসামাল হয়ে গেল ক্ষণিকের জন্যে, ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষলো ড্রাইভার। তারপর শাঁই শাঁই স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে টায়ারের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ তুলে, অনেকখানি রবার ক্ষয় করে নাক ঘুরিয়ে ফেললো অন্যদিকে।

গেট দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলো রবিন। পুলিশের গাড়ি দেখেই বুঝে গেল যা বোঝার। পাগলের মতো চিৎকার করে দুই হাত শূন্যে তুলে নাড়তে শুরু করলো। নীল গাড়িটা দেখিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলো, 'মুসাকে ধরে নিয়ে গেছে! মুসাকে ধরে নিয়ে গেছে!'

রেডিওতে চিৎকার করে উঠলেন ওসি, 'ধরো,ধরো, গাড়িটাকে থামাও!'

নীল টয়োটার পেছনে ছুটলো পুলিশের জীপ। যেদিকে গেছে গাড়িটা, সে পথটা শেষ হয়ে গেছে খানিক দূর গিয়েই। তারপরে জলা। একপাশে ফসলের খেত। মাঝে মাঝে নতুন মাটি ফেলা হয়েছে বাড়ি তোলার জন্যে। উঁচু হয়ে আছে ভিটেগুলো।

জলার ধারে গিয়ে থেমে গেল গাড়ি। ভেতর থেকে কামানের গোলার মতো ছিটকে বেরোলো নীল জ্যাকেট পরা এক তরুণ। ভয়ার্ত চোখে একবার পুলিশের গাড়ির দিকে তাকিয়েই লাফ দিয়ে গিয়ে নামলো খেতের মধ্যে। এঁকেবেঁকে দিলো দৌড়।

'ধরো! ধরো!' চেঁচিয়ে আদেশ দিলেন ওসি।

কিন্তু জীপ থামিয়ে পুলিশ নামার আগেই নীল গাড়িটা থেকে ছিটকে বেরোলো আরেকজন। তাড়া করলো লোটাকে। মুসা আমান। নিয়মিত ব্যায়াম করা শরীর তার, তাছাড়া দৌড়াতে পারে খুব। লাফিয়ে ছুটলো খেতের ওপর দিয়ে। দ্রুত দূরত্ব কমে আসছে দুজনের মাঝে। দৌড়ানোর অভ্যাস বোধহয় খুব একটা নেই তরুণের, তাছাড়া পায়ে রয়েছে চামড়ার জুতো। চষা-খেতের ওপর দিয়ে ছুটতে গিয়ে কয়েকবার হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিলো।

লোকটার কয়েক ফুট পেছনে থাকতেই মাথা নিচু করে ডাইভ দিলো মুসা। তার বিখ্যাত ফ্লাইং ট্যাক্‌ল্‌। কায়দাটার একটা গালভরা বাংলা নাম দিয়েছে কিশোর ঃ উড়ুক্কু মানব বর্শা।

পিঠে যেন মুগুরের বাড়ি পড়লো তরুণের। মুসার ভীষণ শক্ত খুলির প্রচণ্ড আঘাতে হাত-পা ছড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে খেতের ওপর পড়ে গেল সে। পরমুহূর্তেই হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে বসলো আবার। কিন্তু দাঁড়াতে পারলো না। তার এক পা আঁকড়ে ধরেছে মুসা।

গায়ের জোরে ঝাড়া দিয়ে পা-টা ছাড়িয়ে নিতে না নিতেই আরেক পা ধরে ফেললো মুসা। হ্যাঁচকা টানে চিৎ করে ফেলে দিলো তাকে। লোকটা আবার উঠে বসার আগেই পৌঁছে গেল পুলিশ। ঘিরে ফেললো।

মাটির ওপরই পা ছড়িয়ে বসে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে মুসা। ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হাসলো সার্জেন্ট আজিজের ওপর চোখ পড়তে। হাত তুলে তরুণকে দেখিয়ে বললো, 'এই যে নিন আপনার কাঁচ ভাঙুরে।'

দুদিক থেকে দুহাত চেপে ধরেছে পুলিশ। ঝাড়াঝুড়া দিয়ে ছাড়া পাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিলো তরুণ। খেঁকিয়ে উঠলো, 'মিথ্যে কথা! আমি কিচ্ছু জানি না! আমাকে কেন ধরেছে! কিছুই করিনি আমি…এই ব্যাটাই চুরি করতে ঢুকেছিলো আমাদের গুদামে!'

হাসি মুছলো না মুসার মুখ থেকে। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো, 'ওর গাড়িতে গিয়ে দেখুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন।'

গালাগাল শুরু করলো তরুণ। তাকে জীপের দিকে টেনে নিয়ে চললো পুলিশ। ওখানে নীল টয়োটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে রবিন।

গাড়ির মধ্যে পাওয়া গেল ক্যাপ, চশমা, ব্যাকপ্যাক, তার ভেতরে রেডিও আর হেডফোন। সাইকেল চালানোর পোশাকগুলোও রয়েছে ব্যাগে। কিশোরের অনুমান ঠিক, চশমাটা ফীল্ড গ্লাসই, চোখে লাগালে রাতের অন্ধকারেও সব দেখা যায়।

'ওরা ইচ্ছে করে এগুলো আমার গাড়িতে ভরে রেখেছে!' চেঁচিয়ে উঠলো তরুণ। 'আমাকে ফাঁসানোর জন্যে!'

'জিনিসগুলো যে আপনার, প্রমাণ করা যাবে সেটা,' শান্তকণ্ঠে বললো

কিশোর। 'আপনার কোম্পানির লোকই সাক্ষী দেবে আশা করি। সাইকেলটা পড়ে আছে চত্বরে। সেটা আপনার, অফিসের সবাই জানে। ওটাতে সিরিয়াল নম্বর রয়েছে। কোন দোকান থেকে কিনেছেন, সহজেই বের করা যাবে।'

'ওসবের দরকারই নেই আসলে,' মুসা বললো। 'বড় প্রমাণটা রয়েছে ওর গাড়ির সামনের সীটের নিচে। ঢুকিয়ে রাখতে দেখেছি। এয়ার-পিস্তলটা। আঙুলের ছাপও পাওয়া যাবে তাতে।'

চুপ হয়ে গেল তরুণ।

সীটের নিচ থেকে সাবধানে রুমালে চেপে ধরে পিস্তলটা বের করে আনলেন ওসি। মোটা খাটো নল। নলের নিচে আরেকটা নলের মতো পাইপ। ওটায় চাপ দিয়ে ভেতরের স্প্রিংটাকে ভাঁজ করা যায়। ইস্পাতে তৈরি নীলচে চকচকে অস্ত্রটার ওজন বড়জোর দুই পাউণ্ড। খোদাই করে লেখা রয়েছে কোম্পানির নাম ঃ দি ওয়েবলি প্রিমিয়ার। তার নিচে অপেক্ষাকৃত ছোট অক্ষরে লেখা, মেড ইন ইংল্যাণ্ড।

'হুঁ, পয়েন্ট টু-টু ক্যালিবার,' দেখতে দেখতে বললেন আরিফ মামা। 'এই জিনিস একটা ছিলো আমার। সাংঘাতিক শক্তি স্প্রিঙের। কাছে থেকে গুলি করলে গাড়ির কাঁচ সহজেই গুঁড়িয়ে দেয়া যায়।'

তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে মাথা ঝাঁকালেন ওসি সাহেব। তরুণকে দেখিয়ে পুলিশদের নির্দেশ দিলেন, 'নিয়ে এসো ওকে। শরাফত আহমেদের সঙ্গে কথা বলবো।'

হাঁটতে হাঁটতে জানালো রবিন আর মুসা, কিভাবে গুদামের মধ্যে তরুণের ব্যবহার করা জিনিসগুলো খুঁজে পেয়েছে। কি করে সেগুলো নিয়ে পালানোর চেষ্টাটা করেছিল সে। মুসা বাধা দিতে গেলে কিভাবে তাকে পিস্তল দেখিয়ে গাড়িতে তুলে নিয়েছে।

'পালাচ্ছে দেখে খেপে গিয়েছিলাম,' কৈফিয়তের সুরে বললো মুসা। 'আসলে ওকে দেখে একটুও বিপজ্জনক লোক মনে হয়নি আমার। বরং মনে হচ্ছিলো খুব ভীতু। ধরার জন্যে বেরোলাম। এয়ার পিস্তল দেখিয়ে ঠেকালো আমাকে। গাড়িতে উঠতে বাধ্য করলো। চিনতে পেরেছি তখনি, ওটা এয়ার পিস্তল। জানি, ক্লোজ রেঞ্জে আসল পিস্তলের চেয়ে কম ভয়ঙ্কর নয়। হৃৎপিণ্ড বরাবর গুলি চালিয়ে সহজেই মানুষ মেরে ফেলা যাবে। কি আর করবো, উঠে বসলাম। গেট দিয়ে বেরিয়েই আপনাদের দেখে মাথা খারাপ হয়ে গেল ওর। দিলো আরেক দিকে টান।'

হই চই, পুলিশের বাঁশি, সবই শুনতে পেয়েছে গ্লাস কোম্পানির লোকেরা। পাশের গেটের বাইরে বেরিয়ে জটলা করছে। পুলিশের সঙ্গে তরুণকে দেখে ভুরু কুঁচকে গেল কয়েকজনের। ওরা সবাই অফিসের কর্মচারী। একজন ফিরে দৌড় দিলো অফিসের দিকে।

চত্বরে ঢুকলো পুলিশ। এই সময় অফিসের কাঁচের দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলেন

মাঝবয়েসী মানুষটা। এঁকেই কাঁচে ঘেরা ছোট্ট অফিসে একলা বসে থাকতে দেখেছে কিশোর আর রুচি। নাকমুখ কুঁচকে ভারি গলায় জানতে চাইলেন, 'কি হয়েছে?'

'আপনি?' ওসি পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

'আমি শরাফত আহমেদ। এই কোম্পানির মালিক।'

'ও। একে চেনেন?'

'চিনবো না কেন? আমার ছেলে, রনটু। কি করেছে ও?'

টেন-স্পীডটা ঠেলে নিয়ে এসেছে একজন কনস্টেবল। সেটা দেখিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন ওসি, 'এই সাইকেলটা কি আপনার ছেলের? আর এই ক্যাপ, চশমা...'

'আব্বা, বলো না, বলো না, কিচ্ছু বলো না!' চেঁচিয়ে বাধা দিলো রনটু।

ছেলের দিকে অবাক হয়ে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন শরাফত আহমেদ। তারপর ওসির দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন, 'হ্যাঁ, ওরই। কেন? ব্যাপারটা কি? কি করেছে ও?'

বাবার দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলো ছেলে। তার মুখের দিকে চেয়ে কি বুঝলেন শরাফত সাহেব, কে জানে। হাত নেড়ে সবাইকে ডাকলেন, 'ভেতরে আসুন। বসে কথা বলি।'

'শরাফত সাহেব,' আরিফ সাহেব বললেন, 'শুনলে দুঃখ পাবেন। আপনার ছেলে যে কাজ করেছে...' এয়ার পিস্তল দিয়ে কিভাবে একের পর এক গাড়ির কাঁচ ভেঙেছে খুলে বললেন তিনি।

'গাড়ির কাঁচ ভেঙেছে!' বিড়বিড় করলেন শরাফত আহমেদ। 'হুঁ, বুঝতে পারছি, কেন করেছে এই কাজ।' দুঃখের সুরে বললেন তিনি, 'কলেজে দিয়েছিলাম। পড়ালেখা করলো না। বাজে ছেলেদের সঙ্গে মিশে ব'খে গেল। ভাবলাম, এনে ব্যবসায় লাগিয়ে দিই। কিছু দিন কিছুই করলো না। রেগেমেগে শেষে একদিন হুঁশিয়ার করে দিলাম, ঠিকমতো কাজ দেখাতে না পারলে বাড়ি থেকেই বের করে দেবো। সম্পত্তির একটা কানাকড়িও দেবো না। তারপর হঠাৎ ভালো হয়ে গেল। গত তিনমাস ধরে তো চমৎকার কাজ দেখাচ্ছিলো। সেলস ম্যানেজার বানিয়ে দিয়েছিলাম। এমন ভাবে গাড়ির কাঁচ বিক্রি শুরু করলো, আমি তো ভাবলাম...' হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন তিনি। বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'অথচ...এই কাজ করেছে! নিজেই গাড়ির কাঁচগুলো ভেঙে দিয়ে এসেছে, যাতে মালিকেরা কিনতে বাধ্য হয়। ইস্, রনটু, তুই এভাবে আমার মুখে চুনকালি মাখালি...'

'ওদের কথা বিশ্বাস করো না, আব্বা!' প্রতিবাদ করলো রনটু। 'কি বলছে তাই বুঝতে পারছি না। ওরা শত্রুতা করছে আমার সঙ্গে,' তিন গোয়েন্দাকে দেখালো সে। 'আমার জিনিসগুলো চুরি করে নিয়ে গাড়িতে ভরে রেখেছে আমাকে

ফাঁসানোর জন্যে! প্রমাণ করতে পারবে আমি ভেঙেছি? কেউ দেখেছে?'

'পারবো!' জোর দিয়ে বললো রবিন। 'চোরাই ঈগলটা খুঁজে পেলেই হয়।'

চোখ মিটমিট করলেন শরাফত আহমেদ। 'চোরাই ঈগল! ঈগল পাখিও চুরি করেছে!'

'পাখি নয়,' ব্যাখ্যা করলো কচি, 'একটা দুর্লভ মুদ্রা। উনিশশো নয় সালে তৈরি একটা আমেরিকান বিশ ডলারের সোনার মোহর, ডাবল ঈগল বলে ওটাকে। গাড়ির জানালা ভেঙে চুরি করেছে ওটা আপনার ছেলে। অনেক দাম…'

'মোহর চুরি করেছে!' শরাফত আহমেদের গলা কেঁপে উঠলো। 'আমার ছেলে চোর!'

ফ্যাকাশে হয়ে গেছে রনটুর চেহারা। বললো, 'বিশ্বাস কোরো না, আব্বা!' গলায় জোর নেই তার। 'এটাও আমার ঘাড়ে চাপাতে চাইছে। বেশ, স্বীকার করছি, গাড়ির কাঁচ ভেঙেছি আমি। কিন্তু কক্ষনো মোহর চুরি করিনি! খোদার কসম! আমাদের ব্যবসা খারাপ হয়ে গেছে, তাই বাড়াতে চেয়েছিলাম। বিক্রি করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মোহর আমি চুরি করিনি!'

অনেকক্ষণ থেকেই একেবারে চুপ হয়ে আছে কিশোর। শুনছে কথাবার্তা। হঠাৎ এখন রনটুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে উঠলো, 'না, আমারও বিশ্বাস, আপনি চুরি করেননি!'

ষোল

কিশোরের কথা শুনে হাঁ হয়ে গেল তার বন্ধুরা। প্রথমে কথা খুঁজে পেলো রবিন, 'ঈগলটা ও চুরি করেনি?'

'কিশোর?' ভুরু কোঁচকালেন আরিফ সাহেব। 'ব্যাপারটা কি বল তো? তুই জানিস কে চুরি করেছে?'

ধীরে ধীরে নাটকীয় ভঙ্গিতে বললো কিশোর, 'আমি এখনও শিওর না।'

'শিওর না হলে বলা উচিত না।'

'ঈগলটা যে শরাফত সাহেবের ছেলে চুরি করেনি, এটা শিওর। কে করেছে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছি না। তবে চেষ্টা করলে হয়তো ধরে ফেলতে পারবো।'

'তারমানে তুই বলতে চাইছিস যে কাঁচ ভাঙে সে মোহর চোর নয়?'

'না। এর অন্য কোনো ব্যাখ্যা আছে।'

'সেটা কি?' অধৈর্য হয়ে হাত নাড়লো মুসা।

'এ ধরনের অপরাধকেই বলে কপিক্যাট ক্রাইম,' শান্তকণ্ঠে বললো কিশোর।

'কি ক্রাইম!' নাকমুখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো কচি।

'বাংলা মানে বোধহয় করা যাবে না এর,' কিশোরের হয়ে জবাবটা দিলেন

আরিফ সাহেব। 'তবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ধরা যাক, একই সময়ে দুটো অপরাধ ঘটলো। আগে থেকেই ঘটছে এ রকম একটা অপরাধ আরও একবার ঘটলো। ঠিক ওই সময়ে আরেকজন অপরাধী আরেকটা অপরাধ ঘটালো। এমন ভাবে, যাতে মনে হয় দুটোই একজনের কাজ। দ্বিতীয় কোনো অপরাধী যে আছে এটা সহজে বোঝা যাবে না।'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'গাড়ির কাঁচ ভাঙার খবরটা জানা ছিলো আমাদের এই দ্বিতীয় অপরাধীর। কাজেই সুযোগ বুঝে আকবর সাহেবের গাড়ির জানালা ভেঙে ঈগলটা চুরি করেছে সে। আশা করেছে, দোষটা গিয়ে পড়বে যে কাঁচ ভাঙে তার ঘাড়ে।'

'হ্যাঁ, এ রকম অপরাধ অনেক সময়ই ঘটে,' এবার মুখ খুললেন ওসি সাহেব। কিশোরের বুদ্ধি, জ্ঞান আর কথাবার্তা রীতিমতো অবাক করেছে তাঁকে। 'কি করে বুঝতে পারলে সেটা?'

সবার মুখের দিকে তাকালো একবার কিশোর। তারপর বললো, 'গোড়া থেকেই আমার সন্দেহ হচ্ছিলো, এই কেসে আরও একজন জড়িত রয়েছে। আড়িপেতে আমাদের কথা শুনেছে। কোন ভাবে আমাদের কথা জেনে গিয়েছিল সে, সে জন্যেই শুনতে চেয়েছে আমাদের কথা। টেলিফোন লাইনে ওয়্যারট্যাপ লাগিয়ে দিয়েছে। হুঁশিয়ার করে দিয়েছে রনটুকে যে সারা শহরে ভূত-থেকে-ভূতে চালু হয়ে গেছে, ভূতেরা শুরু করে দিয়েছে কাজ। ব্যাপারটা সম্পর্কে শিওর হতে পারতাম না আমি, যদি সে ছোট্ট একটা রসিকতা করার লোভ সামলাতে পারতো। ভেবেছে আমাদের নিয়ে খানিকটা মজা করবে। ফোনে আমাদের খবর দিয়েছে যে কাঁচ ভাঙুরা ধরা পড়েছে। যা-ই হোক, আমাদের ঠকিয়েছে সত্যি, তবে ফাঁকিটাতে সে নিজেই পড়ে নিজেকে ফাঁস করে দিয়েছে।'

অবাক হয়ে কিশোরের কথা শুনছেন ওসি সাহেব। ছেলেটার কিছু কিছু কথা বুঝতে পারছেন না। এই যেমন ভূত-থেকে-ভূতে। তবে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। কিশোরের কথা থেকে আন্দাজ করে নেয়ার অপেক্ষায় আছেন।

'ওরা কি একসঙ্গে কাজ করতো?' রবিন জানতে চাইলো। 'মানে, পার্টনার?'

মাথা নাড়লো কিশোর। 'না।' রনটুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কি, ঠিক বলিনি?'

মাথা নেড়ে সায় জানালো রনটু।

'পার্টনার না হলে,' আবার জিজ্ঞেস করলো রবিন, 'তাকে হুঁশিয়ার করতে গেল কেন দ্বিতীয় লোকটা?'

'এ তো সহজ কথা,' হাত ওল্টালো কিশোর। 'রনটু ধরা পড়লেই পুলিশ জেনে যাবে ঈগলটা সে চুরি করেনি। আসল চোরকে খুঁজতে শুরু করবে তখন। সেই ভয়েই তাকে ওয়্যারলেসে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে চোর যে, তার ওপর সন্দেহ

পড়েছে। প্রমাণ খোঁজা হচ্ছে। ব্যস, তাড়াতাড়ি এসে সেগুলো সরানোর চেষ্টা করেছে রনটু।' তার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, 'তাই না?'

আবার মাথা ঝাঁকালো রনটু। তাজ্জব হয়ে গেছে, তার চোখ দেখেই অনুমান করা যায়।

'কে করেছে, নিশ্চয় জানেন না?'

'না।'

ওসি সাহেব বললেন, 'তাহলে ধরে নেয়া যাচ্ছে, আরেকজন আছে। কে, জানো নাকি? ধরতে পারবে?'

সরাসরি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কিশোর বললো, 'ইলেকট্রনিকসে তার অসাধারণ জ্ঞান। মনে হয় ধরতে পারবো। আজ বিকেলেই। যদি আমাকে সাহায্য করেন।'

কিশোরের ওপর বিশ্বাস জন্মে গেছে ওসি সাহেবের। তবু দ্বিধা করলেন। আরিফ সাহেবের দিকে তাকালেন একবার। তারপর বললেন, 'বেশ, করবো।' শরাফত আহমেদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সরি, শরাফত সাহেব, আপনার ছেলেকে থানায় নিয়ে যেতে হচ্ছে আমাদের। জামিন চাইলে হয়তো পাবেন। উকিলের সঙ্গে কথা বলুন।'

গম্ভীর হয়ে বললেন শরাফত আহমেদ, 'নিয়ে যান। যে ছেলে বাপের নাক-কান কাটে, তাকে ছাড়িয়ে আনতে যাচ্ছি না আমি।'

'কিন্তু আব্বা,' মরিয়া হয়ে বললো রনটু, 'তুমি বুঝতে পারছো না, ব্যবসার উন্নতির জন্যেই আমি একাজ...'

'ব্যবসার উন্নতির জন্যে এসব করতে বলা হয়নি তোমাকে!' কড়া গলায় বললেন শরাফত সাহেব। 'ওসি সাহেব, নিয়ে যান। যা শাস্তি হয় হোক। ওর শাস্তি হওয়াই উচিত।' বলে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। চোখের কোণে জল।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন আরিফ সাহেব। আস্তে বললেন, 'জীবনে কতো যে ঘটনা দেখলাম! সন্তান মানুষ না হলে...' কথাটা শেষ করলেন না তিনি। কিশোরের দিকে তাকালেন, 'তা চোরটা কে, বললি না তো?'

'ডলি খান,' বোমা ফাটালো যেন কিশোর। 'মিস্টার আকবর আলি খানের মেয়ে।'

সতের

কিশোরের ওপর ভীষণ রেগে গেল ডলি। আকবর সাহেবের বসার ঘরে বসেছে সবাই—আকবর সাহেব, তাঁর মেয়ে ডলি, তিন গোয়েন্দা, কচি, ওসি সাহেব, আরিফ সাহেব। রনটুকে নিয়ে পুলিশের জীপে করে থানায় চলে গেছেন সার্জেন্ট আজিজ।

'কাজটা আপনিই করেছেন,' শান্তকণ্ঠে আবার বললো কিশোর। 'আরো

আগেই বোঝা উচিত ছিলো আমার।'

'কিন্তু একাজ কেন করবে আমার মেয়ে?' হাতের লাঠিটা সজোরে মেঝেতে ঠুকলেন আকবর সাহেব।

'আপনার মেয়েকেই জিজ্ঞেস করুন।'

'না, আমি তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাই।'

'আসলে মেয়ের কোনো খোঁজখবর রাখেন না তো আপনি, আছেন নিজেকে নিয়ে আর আপনার মুদ্রা নিয়ে, নইলে অনেক আগেই বুঝতে পারতেন।' কিছুটা ঝাঁঝের সঙ্গেই বললো কিশোর। আকবর সাহেবের দুর্ব্যবহার অনেক সহ্য করেছে সে, আর নয়। ডলির দিকে তাকিয়ে বললো, 'দয়া করে আপনার কামিজের হাতাটা একটু তুলবেন?'

রেগে গেলেন আকবর সাহেব। 'কেন, কামিজের হাতা তুলবে কেন? ফাজলেমি করার আর জায়গা পাওনি!'

'আমি ফাজলেমি করছি না। তুলতে বলুন, নিজের চোখেই দেখতে পাবেন।'

'কি দেখতে পাবো?'

'আগে তো তুলুক।'

কিন্তু দ্বিধা করতে লাগলো ডলি।

'কি হলো?' ডলির দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচালো কিশোর। 'তুলুন।'

ধীরে ধীরে ডান হাতের হাতাটা কনুই পর্যন্ত গোটালো ডলি। চোখ নামিয়ে রেখেছে। তার হাতের কালো কালো দাগগুলো সবাই দেখলো। সবাই বুঝতে পারলো কিসের দাগ ওগুলো, শুধু কচি আর আকবর সাহেব ছাড়া। তিনি বললেন, 'তুললো তো, এখন কি হলো?'

ধৈর্য হারালেন ওসি। আকবর সাহেবের কাটা কাটা কথা তাঁরও পছন্দ হচ্ছে না। কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'কেন, বুঝতে পারছেন না?'

'না, পারছি না!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন আকবর সাহেব।

আরিফ সাহেব বললেন, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে আপনার মেয়ের, জানেনই না আপনি! ও ড্রাগ অ্যাডিক্ট। সর্বনাশা নেশার জালে জড়িয়ে পড়েছে আপনার মেয়ে। ওগুলো ইঞ্জেকশনের সুচের দাগ।'

হঠাৎ যেন ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন আকবর সাহেব। এলিয়ে পড়লেন সোফায়। বোকার মতো চেয়ে রয়েছেন মেয়ের হাতের দাগগুলোর দিকে। স্তব্ধ হয়ে গেছেন।

'এবার কি আর অস্বীকার করবেন,' ডলির দিকে চেয়ে কোমল গলায় বললো কিশোর, 'হেরোইন কেনার টাকার জন্যে ঈগলটা চুরি করেননি আপনি?'

জবাব দিলো না ডলি। মাথাটা ঝুলে পড়েছে বুকের ওপর।

'আমেরিকায় গিয়ে এই নেশার শিকার হয়েছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালো ডলি। 'পড়তে গিয়েছিলাম। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে এই সর্বনাশ হয়েছে আমার। আব্বা টাকা পাঠাতো পড়ার জন্যে, আমি পড়ালেখা বাদ দিয়ে খরচ করতাম নেশার পেছনে। তাতেও কুলাতো না। নানান অসুবিধায় পড়লাম। শেষে বাধ্য হয়ে চলে এসেছি দেশে।'

'ইলেকট্রনিকসে আপনার অসাধারণ জ্ঞান। ওই স্যাটেলাইট ডিশটা আপনারই, তাই না?'

'হ্যাঁ। আব্বা আনিয়ে দিয়েছে আমেরিকা থেকে। আমার শখ দেখে। সিবি রেডিও, হ্যাম রেডিও, টিভি, সব কিছুরই অ্যান্টেনা হিসেবে ব্যবহার করি আমি ডিশটা।'

'আমাদের কথা শোনার জন্যে টেলিফোন লাইনে ওয়্যারট্যাপ আপনিই লাগিয়েছিলেন?'

'না। সানি লাগিয়ে দিয়েছে। ও আমাকে ভালোবাসে। সে জন্যে যা করতে বলি তা-ই করে। আমার ড্রাগ নেয়ার কথাও জানে। অনেক চেষ্টা করেছে ছাড়ানোর জন্যে। আমি মানা করেছি, তাই বলেনি আব্বাকে। গোপন রেখেছে।'

'এখন কোথায় সে?'

'বাইরে কোথাও গেছে।'

'আচ্ছা, আপনার আব্বা আমাদেরকে কাজে লাগাতে চান একথা বলে ফোনটা করেছিলো কেন সানি?' জবাবের অপেক্ষা না করে নিজে নিজেই বললো কিশোর, 'নিশ্চয় নিজেদেরকে সন্দেহমুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন। অপরাধী প্রায়ই ভাবে, এই বুঝি কেউ তাকে সন্দেহ করে বসলো। আপনারও হয়েছিলো সেই অবস্থা। আপনি ধরেই নিয়েছিলেন, আমরা আপনাকে সন্দেহ করছি। শিওর হওয়ার জন্যেই আসলে সেদিন ওকে দিয়ে ফোন করিয়ে আমাদের বাড়িতে ডেকে এনেছিলেন? তাই না?'

আস্তে মাথা ঝাঁকালো শুধু ডলি।

'মোহর যে রাতে চুরি করেছেন,' বলে গেল কিশোর, 'সে রাতে আপনিই গাড়ি চালিয়েছিলেন। আপনার আব্বা ভুলে বাক্সটা ফেলে রেখে চলে গেলেন। এই ফাঁকে আপনি তুলে নিলেন বাক্সটা। এতোই ছোট ওটা, যে জানে সে ছাড়া অন্ধকারে আর কারও চোখে পড়ার নয়। লুকিয়ে ফেললেন বাক্সটা। তারপর ভাঙলেন গাড়ির কাঁচ। ভাবখানা এমন, যেন অন্য কেউ এসে ভেঙে দিয়ে গেছে। গাড়ির কাঁচ ভাঙা যাচ্ছিলো কয়েক মাস ধরে, সেটা জানা ছিলো আপনার। সময় মতো সুযোগটা কাজে লাগিয়েছেন।'

চুপ করে রইলো ডলি।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললো কিশোর। 'এইই হয়। ড্রাগের নেশা এমনই ভয়ঙ্কর সে জিনিস পাওয়ার জন্যে সব কিছু করতে রাজি মানুষ। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। নিজের বাপের জিনিসও চুরি করতে বাধেনি আপনার। আপনার

জন্যে সত্যিই দুঃখ হচ্ছে আমার, মিস খান! মুদ্রাটা কি বিক্রি করে ফেলেছেন?'

মাথা নাড়লো ডলি। এখনও বিক্রি করতে পারেনি।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর, 'তো, এখন কি জিনিসটা বের করে দেবেন? দেখতাম।'

নীরবে উঠে দাঁড়ালো ডলি।

তার পেছনে চললো সবাই।

সোজা পাশের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো মেয়েটা। এগোলো স্যাটেলাইট ডিশের দিকে। ওটার কাছে এসে থামলো। কারো দিকে না তাকিয়ে ঝুঁকে বসে হাত ঢুকিয়ে দিলো ডিশের নিচে। টেপ দিয়ে আটকানো রয়েছে মুদ্রাটা। টেনে টেপ ছিঁড়ে খুলে আনলো ওটা। বাড়িয়ে দিলো কিশোরের দিকে।

আঠার

বিকেলে বাগানে চেয়ার পেতে বসেছে সবাই। আরিফ সাহেব, ওসি সাহেব, তিন গোয়েন্দা আর কচি। মামী রান্নাঘরে ব্যস্ত। কাঁচ ভাঙার রহস্য নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। বেশির ভাগ কথা কিশোরই বলছে। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছেন ওসি সাহেব।

'আচ্ছা, কিশোর,' জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'কি ভুলটা করেছিলো ডলি, যে জন্যে তোমার সন্দেহ হলো কাঁচ যে ভাঙে সে মোহর চোর নয়?'

'দুটো কারণে,' জবাব দিলো কিশোর। 'প্রথমত, পেছনের কাঁচ ভেঙেছে ডলি। আর দ্বিতীয় কারণ, ওদের গাড়িটা টয়োটা নয়। রনটু শুধু টয়োটার কাঁচই ভাঙতো। এ ব্যাপারটা জানা ছিলো না ডলির। ফলে ভুলটা করে বসেছে। বুঝে গেলাম একটা কপিক্যাট ক্রাইম ঘটেছে। পেছনের সীটে রাখা ছিলো বাক্সটা, তাই সেদিকের কাঁচটাই ভেঙেছে সে। কিন্তু রনটু ভাঙতো সামনের কাঁচ, উইণ্ডশীল্ড।'

'আনাড়ি কপিক্যাট,' মুচকি হাসলেন আরিফ সাহেব। 'বোকার মতো কাজ করে ধরাটা পড়লো।'

'আরও একটা বোকামি করেছে আমাদের ফোন করে। এরকম করেই ধরা পড়ে অপরাধী, এ-তো জানা কথাই। আকবর সাহেবের বাড়ি গিয়ে দুটো ব্যাপার জানলাম। একঃ আকবর সাহেব আমাদেরকে তদন্তে নিয়োগ করতে বলেননি। তাঁর সঙ্গে এ ব্যাপারে কোনো আলোচনাই করেনি ডলি আর সানি।'

'আর দ্বিতীয় ব্যাপারটা?' মুসার প্রশ্ন।

'হাফ-হাতা ব্লাউজ পরেছিলো সেদিন ডলি, নিশ্চয় মনে আছে তোমাদের?'

'কি জানি!' মাথা চুলকালো মুসা।

মাথা নাড়লো রবিন, 'না, খেয়াল করিনি। কিন্তু তাতে কি?'

'গোয়েন্দাগিরি করছো এতোদিন, খেয়াল করা উচিৎ ছিলো,' সুযোগ পেয়েই খানিকটা উপদেশ ঝেড়ে দিলো গোয়েন্দাপ্রধান। 'ডলির হাতে ইঞ্জেকশনের সুচের

দাগ। প্রথমে অবাক হয়েছিলাম। পরে সন্দেহ জাগলো। ধীরে ধীরে বুঝে ফেললাম, কে, কেন চুরি করেছে মুদ্রাটা।'

দরজায় দেখা দিলেন মামী। ডেকে বললেন, 'এই কিশোর, তোর ফোন।'

'ফোন?' ভুরু কুঁচকালো মুসা। 'এখন আবার কে ফোন করলো?'

'দেখে আসি,' উঠে দাঁড়ালো কিশোর।

কয়েক মিনিট পরে ফিরে এলো হাসিমুখে। চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে তার দিকে তাকালো মুসা, রবিন আর রুচি।

'দাওয়াত,' খবরটা জানালো কিশোর। 'দাওয়াত দিয়েছে গোড়ানের ছেলেরা। একটা ক্লাব করেছে ওরা, নাম দিয়েছে *তিন গোয়েন্দা ক্লাব*।'

'কি বলেছো?' জানতে চাইলো রুচি, 'যাবে?'

'নিশ্চয় যাবো। আগামী তেরো-চোদ্দ দিন প্রত্যেকটা পাড়ায় গিয়ে সবার সঙ্গে পরিচয় করবো। ওরা যে টেলিফোনের মাধ্যমে একটা অন্যায় কাজ বন্ধ করতে সাহায্য করেছে সে গল্প বলতে হবে না ওদেরকে?'

'কাল আমাকেও নিয়ে যেও, একদিন ফার্মে কাজ না করলে কিছু হবে না,' বললো রুচি। ওর হাতে শোভা পাচ্ছে পিকআপের চাবি।

'নিশ্চয়।'

'সুখেই আছো,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ওসি সাহেব। 'ইস্, বিশটা বছর যদি কমে যেতো বয়স আমার, ভিড়ে যেতাম তোমাদের দলে! এই কাজকর্ম, দায়িত্ব, টেনশন আর ভালো লাগে না!'

'তুমি তো তা-ও আরামেই আছো,' একই রকম দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আরিফ সাহেবও। 'কাজ করে সময় পার করে দাও। আমার কি অবস্থা ভাবো তো। সময় একদম কাটতে চায় না।' কিশোরের দিকে তাকালেন তিনি। অনেকটা অনুরোধের সুরেই বললেন, 'এই কিশোর, কাল আমাকেও নিয়ে যাস তোদের সঙ্গে। গাড়িও পাবি, বিনা বেতনে একজন ড্রাইভারও। কি, নিবি আমাকে?'

'নেবো, মামা।'

-: শেষ :-

জলকন্যা

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ১৯৯১

'গেল-রে, গেল, আবার হারালো!' চিৎকার করে চত্বর ধরে ছুটে এলো মহিলা। 'কিটুটা আবার গায়েব!' মহিলার বয়েস অল্প। সুন্দরী। চোখেমুখে ভয়ের ছাপ। 'মিস্টার ডেক্সার, ওকে খুঁজে পাচ্ছি না!'

বেঞ্চে বসে তিন কিশোরের সঙ্গে গল্প করছেন মিস্টার ডেক্সার। বিরক্ত ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন। 'দুত্তোর! একটা মুহূর্তের জন্যে কি স্থির থাকতে পারে না ছেলেটা!'

উঠে এগিয়ে গেল মহিলার দিকে। 'এতো অস্থির হচ্ছো কেন, নিনা? ডব তো সঙ্গেই রয়েছে তার। ও-ই দেখবে।'

'ডব যায়নি, ঘুমোচ্ছে। মুহূর্তের জন্যে চোখ সরিয়েছিলাম কিটুর ওপর থেকে, অমনি পালালো!'

পরস্পরের দিকে তাকালো বেঞ্চে বসা তিন কিশোর।

'আপনার ছেলে?' মহিলাকে জিজ্ঞেস করলো একজন। তার মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল। সুন্দর দুই চোখে বুদ্ধির ছটা। 'বয়েস কতো?'

'পাঁচ,' জবাব দিলো নিনা। 'একা একা গেল, কোথায় যে হারায়...

'বেশি দূরে যায়নি,' বাধা দিয়ে বললেন ডেক্সার। 'দেখি, ওশন ফ্রন্টের দিকটায় খুঁজে। তুমি ওদিকে যাও, আমি মেরিনার দিকে যাচ্ছি। পেয়ে যাবো।'

দুজন দুদিকে খুঁজতে চলে গেল।

'পাঁচ বছর,' বললো তিনজনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম বয়স্ক কিশোরটি। হালকা-পাতলা রোগা শরীর তার। 'কিশোর, কাণ্ডটা দেখেছো! আজব চরিত্র এখানে। পাঁচ বছরের একটা বাচ্চাকে একা ছাড়লো কিভাবে?'

'অজান্তে পালালে কি করবে?' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো কিশোর পাশা।

তিন বন্ধু মিলে ক্যালিফোর্নিয়ার ভেনিস শহরটা দেখতে এসেছে ওরা। শুধু দেখতে এসেছে বললে ভুল হবে, কাজও আছে এই উপকূলীয় শহরে। বাজারের পার্কিং লটে সাইকেল রেখে হেঁটে এসেছে চওড়া সৈকতের কিনারে। দেখার অনেক কিছু আছে এখানে। কারনিভল চলছে। খোলা জায়গায় দড়াবাজির খেলা চলছে। সাইকেলের খেলা থেকে শুরু করে সার্কাসের আরও নানা রকম খেলা দেখাচ্ছে কয়েকটা মেয়ে। বাঁশি বাজাচ্ছে স্ট্রীট মিউজিশিয়ান। তার কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে এক আইসক্রীমওয়ালা। আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কয়েকজন ভাঁড়।

একধারে গম্ভীর মুখে বসে লোকের ভাগ্য গণনা করছে এক জ্যোতিষ।

উৎসব চলছে ভেনিসের পথে। খেলা যেমন চলছে, তেমনি চলছে মদ আর জুয়ার আড্ডা। এক জায়গায় বসে একটা বোতল থেকেই পালা করে মদ খাচ্ছে তিন ভবঘুরে। হই চই শোনা গেল। কি ব্যাপার? একটা লোককে পুলিশে ধরেছে, বেআইনী ড্রাগ বিক্রি করছিলো সে। আরেক দিকে বগলে একটা বাক্স নিয়ে দৌড় দিলো একটা লোক। তার পেছনে *চোর! চোর! ধরো! ধরো!* বলে চিৎকার করে ছুটলো আরেকজন। নিশ্চয় কোনো দোকানের মালিক।

ভেনিসের মজার উৎসব সম্পর্কে যেমন শুনেছে কিশোর, তেমনি এর বদনামও অনেক শুনেছে সে। সৈকতের কাছে পিয়ারের নিচে বাস করে অনেক না-খেতে-পাওয়া মানুষ। চোর, গুণ্ডা, বদমাশের স্বর্গ হয়ে উঠেছে জায়গাটা। পাঁচ বছরের একটা বাচ্চাকে এখানে ঘুরতে দেয়া নিতান্তই বিপজ্জনক।

বন্ধুদের দিকে তাকালো কিশোর। একটা কিছু সিদ্ধান্ত নেবে সে, এই আশায়ই তার দিকে চেয়ে রয়েছে রবিন আর মুসা। নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করছে।

হাসি ফুটলো অবশেষে গোয়েন্দা প্রধানের মুখে। বললো, 'মনে হচ্ছে, আরেকটা কেস এসে গেল হাতে। চলো, আমরাও খুঁজি।'

ওশন ফ্রন্ট ধরে এগোলো তিনজনে। বৃদ্ধ মিস্টার ডেজার কিংবা কিটুর মায়ের চেয়ে খোঁজার ব্যাপারে অভিজ্ঞতা তাদের অনেক বেশি, ফলে ওদের কাজটাও হলো অনেক নিখুঁত। খোলা দরজা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলো। তাকালো স্তূপ হয়ে থাকা ময়লার ওপাশে। খালিপায়ে সৈকতে হাঁটাহাঁটি করছে অনেক ছেলেমেয়ে, ওদের সঙ্গে কথা বললো। ওশন ফ্রন্টে এসে পড়া সমস্ত গলি উপগলিতে খুঁজলো। এমনকি স্পীডওয়ে আর প্যাসিফিক অ্যাভেনিউও বাদ দিলো না।

ওরকম একটা নিরালা পথেই এক বাড়ির বারান্দায় বসে থাকতে দেখা গেল ছেলেটাকে। একটা বাদামী রঙের বেড়ালের সঙ্গে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত। আলোচনাটা চলছে একতরফা। বকবক করে যাচ্ছে ছেলেটা, আর বেড়ালটা চোখ মুদে আদর খাচ্ছে। ছেলেটার চুল আর চোখ দুইই কালো, নিনার মতো।

এগিয়ে গেল কিশোর। 'এই, তোমার নাম কিটু?'

জবাব দিলো না ছেলেটা। ধীরে ধীরে পিছিয়ে গিয়ে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো।

'তুমি এখানে,' আবার বললো কিশোর। 'আর তোমার মা ওদিকে খুঁজে মরছে। চলো।'

আরেক মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলো ছেলেটা। তারপর হাত বাড়িয়ে দিলো, 'আচ্ছা।'

কিটুর হাত ধরে তাকে নিয়ে চললো কিশোর। সাথে চললো রবিন আর মুসা। চত্বরে আসতেই প্রথম দেখা হলো মিস্টার ডেজারের সঙ্গে। চোখেমুখে দারুণ উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠার ছাপ। তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে এসে কিটুর হাত চেপে ধরে

চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এই দুষ্টু ছেলে, কোথায় গিয়েছিলি! তোর মা ওদিকে পাগল হয়ে গেছে!'

পাগল মা-ও এসে হাজির হলো। প্রথমে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো, তারপর গেল রেগে। কাঁধ ধরে জোড়ে জোড়ে ঝাঁকি দিয়ে বললো, 'এই, কোথায় গিয়েছিলি! বল, কোথায়! না বলে আবার যদি যাস...!' কি করবে কথাটা উহ্য রাখলো নিনা।

এই হুমকি মোটেও গায়ে মাখলো না কিটু। তবে তর্ক না করার মতো বুদ্ধি তার আছে। চুপ করে রইলো।

নিজেদের পরিচয়, অর্থাৎ নাম বললো তিন গোয়েন্দা। কিটুর মা-ও তার পরিচয় জানালো। পুরো নাম নিনা হারকার। ছেলেকে ফিরে পেয়ে উৎকণ্ঠা দূর হয়ে গেছে। হঠাৎ তাই হালকা হয়ে গেল মেজাজ। ছেলেদেরকে নিয়ে চলে এলো সেই চত্বরে, যেখানে খানিক আগে গল্প করছিলো তিন গোয়েন্দা। চত্বর দিয়ে ঘিরে ইংরেজী U অক্ষরের মতো করে গড়ে উঠেছে অনেকগুলো পাকা বাড়ি। ইউ-র দুই প্রান্তে বেশ কিছু দোকানপাট। বাঁয়ের প্রথম দোকানটার দিকে এগোলো নিনা। বইয়ের দোকান ওটা, নাম *রীডারস হেভেন*।

ভেতরে খরচের খাতা দেখছেন বছর ষাটেকের এক বৃদ্ধ। নাম হেনরি বোরম্যান। পরিচয় করিয়ে দিলো নিনা। ভদ্রলোক তার বাবা। দুজনে মিলে বইয়ের দোকানটা চালায়।

মায়ের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দরজার কাছে শুয়ে থাকা একটা বিশাল কুকুরের দিকে এগিয়ে গেল কিটু। ওটার নামই ডব, বুঝতে অসুবিধে হলো না গোয়েন্দাদের। ডবের ধমনীতে বইছে মিশ্র রক্ত। বাবার জাত গ্রেট ডেন, মা লাব্রাডর। কিটুকে এগোতে দেখে নড়েচড়ে উঠে বসলো, থুতনি রাখলো ছেলেটার কাঁধে।

'দেখছিস কি রকম করছে!' নিনা বললো। 'ওকে ফেলে যেতে লজ্জা করে না তোর?'

'ও ঘুমোচ্ছিলো। কারো ঘুম ভাঙানো কি ঠিক?'

'বড় বড় কথা শিখেছে! আরেক দিন ওরকম করে কোথাও যাবি তো বুঝবি মজা।'

দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন মিস্টার ডেজার। কাঁধ দিয়ে তাঁকে ঠেলে সরিয়ে ভেতরে ঢুকলো মাঝবয়েসী একজন লোক। চেহারাটা ভালোই, কিন্তু পাথরের মতো কঠিন করে রেখেছে। চোখ গরম করে কিটুর দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়ে বললো, 'টুথপেস্ট দিয়ে আমার জানালায় তুমি ছবি এঁকেছো?'

জবাব না দিয়ে ডবের পেছনে সরে গেল কিটু।

'কিটু!' ভীষণ রেগে গেল নিনা। 'এতো শয়তান হয়েছিস তুই!'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন বোরম্যান। 'তাই তো বলি, আমার টুথপেস্টের কি হলো!'

'আবার যদি এরকম করো, পুলিশের কাছে যাবো বলে দিলাম, হ্যাঁ!' হুমকি দিলো আগন্তুক।

'সরি, মিস্টার ক্যাম্পার,' ছেলের হয়ে মাপ চাইলো মা, 'আর ওরকম হবে না...'

'না হলেই ভালো। এতো লাই দিলে ছেলে মাথায় উঠবেই। একটু-আধটু শাসন দরকার।'

তার খুদে মনিবকেই গালমন্দ করা হচ্ছে, এটা বুঝে গেল ডব। ব্যাপারটা পছন্দ হলো না তার। চাপা গরগর করে উঠলো।

'এই কুত্তা, চুপ!' ধমক দিয়েই বুঝলো ক্যাম্পার, ভুল করে ফেলেছে। জ্বলে উঠেছে বিশাল কুকুরটার চোখ। দোকান থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল সে।

মায়ের দিকে তাকিয়ে হাসি মুছে গেল কিটুর। মা হাসছে না। এমনকি নানাও না। কুকুরটার পাশে বসে ওকে জড়িয়ে ধরলো সে।

'হয়েছে, আর মুখ ওরকম করতে হবে না!' খেঁকিয়ে উঠলো নিনা। 'দেখো না, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না! লোক আর পাসনি, বাড়িওলার জানালায় গেছিস ছবি আঁকতে। ঘাড়টি ধরে যখন বের করে দেবে তখন বুঝবি।'

চুপ করে রইলো কিটু। তারপর উঠে রওনা দিলো দোকানের পেছন দিকে। একটা টেবিলের নিচে কিছু খেলনা পড়ে আছে, সেদিকে। সঙ্গী হলো ডব।

সেদিকে তাকিয়ে আনমনে বিড়বিড় করলো নিনা, 'মিনিট পনেরো শান্ত থাকলে হয়। কি ছেলেরে বাবা!'

কিটুকে খুঁজে বের করে দেয়ার জন্যে আরেকবার তিন গোয়েন্দাকে ধন্যবাদ দিলো নিনা। তার বাবা এক বোতল করে সোডা খেয়ে যাবার আমন্ত্রণ জানালেন। খুশি হয়েই তাতে সায় দিলো ছেলেরা। কারণ এই অঞ্চলে কাজ আছে ওদের। আমেরিকান সভ্যতার ওপর গবেষণা করতে এসেছে রবিন, ইস্কুলের ম্যাগাজিনে লিখবে। তাকে সাহায্য করছে কিশোর আর মুসা।

'শহর এলাকার কথাই বেশি লিখবো,' বোরম্যানকে জানালো রবিন। 'যেসব জায়গার পরিবর্তন খুব বেশি হচ্ছে। ভাবছি ভেনিস থেকেই শুরু করবো।'

মাথা ঝাঁকালেন বোরম্যান।

আনন্দে টেবিলে থাবা মারলেন ডেক্সার। 'ঠিক জায়গায় এসেছো। কেবলই বদলাচ্ছে ভেনিস, সেই গড়ে ওঠার পর থেকেই। এতো বিভিন্ন ধরনের লোকের আনাগোনা এখানে...পরিবর্তনটা হচ্ছেই সে-কারণে।'

'কালকে প্যারেড দেখতে আসছো তো?' নিনা জিজ্ঞেস করলো।

'নিশ্চয়ই,' রবিন বললো। 'ফোর্থ অভ জুলাই প্যারেডের কথা অনেক শুনেছি। সুযোগ যখন পেলাম, না দেখে কি আর ছাড়ি।'

'হ্যাঁ, দেখারই মতো,' বোরম্যান বললেন। 'এরকম প্যারেড আর কোথাও হয় না। তবে গণ্ডগোল হয় ভীষণ। যাচ্ছে তাই কাণ্ড ঘটে যায়।'

চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে বন্ধুদের দিকে তাকালো রবিন। জানালার বাইরে তাকিয়ে রয়েছে মুসা। লাল স্কার্ট পরা এক তরুণী হেঁটে যাচ্ছে, তাকেই দেখছে গোয়েন্দা সহকারী। তরুণীকে উদ্দেশ্য করে কি যেন বলছে এক বখাটে ছোকরা। চোখের পলকে ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো মেয়েটা। সোজা গিয়ে ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দিলো ছোকরার গালে। ব্যস, শুরু হয়ে গেল গোলমাল। দেখতে দেখতে আরও কয়েকটা ছেলে এসে দাঁড়ালো সেখানে। দল হয়ে গেল দুটো। তর্ক শুরু হলো দুই দলে। অবস্থা দেখে মুসার মনে হলো, হাতাহাতিতেও গড়াতে পারে ব্যাপারটা।

'মেয়েটার নাম মিস লিয়ারি গুন,' ডেজার বললেন। 'প্রায়ই আসে সৈকতে। এলেই একটা না একটা গোলমাল বাধায়।'

'খাইছে! এই রকম কাণ্ড হয় এখানে! হরহামেশাই যদি এই অবস্থা হয়, প্যারেডের সময় না জানি কি ঘটে! নাহ্, প্যারেডটা না দেখলেই নয়। আসবো, কাল অবশ্যই আসবো।'

'আমিও আসবো,' ঘোষণা করলো কিশোর পাশা।

দুই

পরদিন সকালে সৈকতের কাছে পৌঁছতেই তীক্ষ্ণ একটা শব্দ কানে এলো।

চমকে উঠলো মুসা, 'গুলি নাকি?'

'না, বাজি,' বললো কিশোর।

'গুলির মতোই লাগলো। প্যারেডের হট্টগোল শুরু হয়ে গেল তাহলে।'

কংক্রীটের চত্বরটা লোকে বোঝাই। নানা রকম মানুষের ভিড়। ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছোট ছেলেমেয়ের দল। অসংখ্য ছাতার নিচে গিয়ে ঠাঁই নিয়েছে বুড়োরা। আইসক্রীম খাচ্ছে। ছোট ঠেলাগাড়িতে করে শিশুদের ঠেলে নিয়ে চলেছে মায়েরা। তাদের কারো কারো পায়ে পায়ে রয়েছে কুকুর—এক কিংবা একাধিক। বাজনা বাজিয়ে লোকের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করছে স্ট্রীট মিউজিশিয়ানরা। একটা ভ্যানের পেছন থেকে কাপড়ে তৈরি বিচিত্র সব জিনিস নামাচ্ছে কয়েকজন বিচিত্র পোশাক পরা মানুষ।

সঙ্গে ক্যামেরা এনেছে রবিন। একের পর এক ছবি তুলছে। লাল গাউন পরা মিস লিয়ারি গুনকে দেখে তার ছবি তুললো। অ্যাকর্ডিয়ন বাজাচ্ছে একটা লোক। দুই কাঁধে বসে আছে উজ্জ্বল রঙের দুটো কাকাতুয়া। আর বাজনার তালে তালে নাচছে মেয়েটা।

পানির দিক থেকে ঠেলাগাড়ি ঠেলে আনছে একজন লোক। গাড়িটাতে বোঝাই বোতল আর ক্যান। তার পেছন পেছন আসছে দুটো নেড়ি কুকুর। যেখানে সেখানে কোকাকোলা আর লেমোনেডের খালি বোতল ছুঁড়ে ফেলছে লোকে। লোকটা

সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আবর্জনা ফেলার জায়গায় নিয়ে গিয়ে ফেলে আসবে। গাড়ি থামিয়ে বোতল বা ক্যান তোলার জন্যে লোকটা থামলেই বাধ্য ছেলের মতো দাঁড়িয়ে যাচ্ছে কুকুর দুটো।

'ওর নাম বরগু,' ছেলেদের পেছন থেকে বলে উঠলো একটা কণ্ঠ। ফিরে তাকিয়ে দেখলো ওরা, মিস্টার ডেজার কথা বলছেন। 'খুব ভালো মানুষ। এরকম কমই দেখা যায়। কারো সাতেপাঁচে নেই, নিজের মতো থাকে। কষ্ট করে যা রোজগার করে, কুকুর দুটোর সঙ্গে ভাগাভাগি করে খায়। ভালো, সত্যি ভালো লোক,' শেষের বাক্যটা মাথা নেড়ে বললেন তিনি।

বরগুকে দেখতে লাগলো ছেলেরা। গাড়িটা ঠেলে নিয়ে গিয়ে এক জায়গায় রাখলো লোকটা। তারপর সৈকতের একটা কাফের সামনে পাতা একটা বেঞ্চিতে বসলো। পকেট থেকে বের করলো একটা হারমোনিকা। তার দিকে মুখ করে কুকুর দুটো বসলো পায়ের কাছে। বাজনা শোনার আশায় খাড়া করে ফেলেছে কান।

বাজাতে আরম্ভ করলো বরগু। শুরুটা হলো খুব নিচু খাদ থেকে। মোলায়েম সুর, চড়তে লাগল ধীরে ধীরে। তারপর অবাক কাণ্ড! একটা দুটো করে ছেলে-মেয়েরা আসতে লাগলো। ঘিরে বসলো তাকে।

অপরিচিত সুর। ভারি মিষ্টি। কান পেতে শুনছে তিন গোয়েন্দা। ভালো লাগছে ওদের। বাচ্চাদেরও লাগবে, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

মাত্র কয়েক মিনিট বাজিয়েই উঠে পড়লো বরগু। হারমোনিকা পকেটে ভরে আবার চললো তার ঠেলাগাড়ির দিকে। কুকুর দুটো চললো তার পেছনে। নিতান্ত নিরাশ হয়েই যেন উঠে পড়ে আবার যার যার মতো চলে গেল ছেলেমেয়েরা।

'সব সময়ই এরকম হয়?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর। 'বাচ্চারা ছুটে আসে?'

'সব সময়,' জবাব দিলেন ডেজার। 'বরগুর নাম রেখেছি আমরা ভেনিসের বংশীবাদক। 'হ্যামিলনের সেই বাঁশিওয়ালার মতোই বাঁশি বাজিয়ে বাচ্চাদের টেনে নিয়ে আসার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে তার।'

হাঁটতে শুরু করলো আবার তিন গোয়েন্দা। ওদের সঙ্গী হলেন ডেজার। প্রচুর বাজি-পটকা পোড়ানো হচ্ছে সৈকতের ধারে। চত্বরের ওপরে উড়ে এসেও ফাটছে দু-একটা। ওরা বইয়ের দোকানের কাছাকাছি হতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো কিটু। নজর সামনের চত্বরে জনতার ভিড়ের দিকে। ডবও রয়েছে তার সঙ্গে। পা বাড়ালো ছেলেটা। কুকুরটা ছায়ার মতো সেঁটে রইলো তার সঙ্গে। হাঁটার আড়ষ্টতা দেখেই বোঝা যায় অনেক বয়েস। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে।

'আবার দেখি একা একা বেরোলো ছেলেটা,' মুসা বললো।

'অসুবিধে নেই,' ডেজার বললো। 'ডব রয়েছে সঙ্গে...'

বাধা দিয়ে রবিন বললো, 'ছেলেটা এরকমই করে নাকি...কালকের মতো...'

'করে। একদণ্ড স্থির থাকতে পারে না। বলে বলে হদ্দ হয়ে গেছে তার মা। কিছুতেই কথা শোনাতে পারে না। দোকানে থাকতেই চায় না কিটু। বেরিয়ে যায়

কুকুরটাকে নিয়ে। সারা সৈকতে ছোটাছুটি করে। খেলে বেড়ায়। তবে হারিয়ে যায় না। ডব সঙ্গে থাকলে কোনো ভয় নেই। ওর মা বলেছে, এই সেপ্টেম্বরেই ইস্কুলে ভর্তি করে দেবে। দুষ্টুমি অনেক কমবে তখন।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালো মুসা। 'সময়ই পাবে না দুষ্টুমি করার।'

সব ব্যাপারেই যেন দ্রুত আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে ছেলেটা। প্যারেডের কোন কিছুই তাকে ধরে রাখতে পারলো না। ভিড় থেকে সরে গিয়ে চত্বরের একধারে একটা বাড়ির দেয়ালের গায়ে বল ছুঁড়ে ছুঁড়ে খেলতে শুরু করলো। বাড়িটা অনেক পুরানো। তিনতলা। দুই পাশে নতুন গড়ে ওঠা দোকানপাটগুলো ওই প্রাচীনতার সঙ্গে কেমন যেন বেমানান।

'বেশ পুরানো,' রবিন বললো। ডেজারকে জিজ্ঞেস করলো, 'ইতিহাস-টিতিহাস আছে নাকি এটার?'

'নিশ্চয় আছে। ওটার নাম *মারমেড ইন*...'

'জলকন্যা!' বাংলায় বিড়বিড় করলো কিশোর।

'অ্যাঁ! কি বললে?'

'না, কিছু না।'

আবার আগের কথার খেই ধরলেন ডেজার, 'ওটার নামেই চত্বরটার নাম রাখা হয়েছে, *মারমেড কোর্ট।* আগে বাড়িটা সরাইখানা ছিলো। ভেনিস সম্পর্কে লিখতে গেলে ওটার কথা অবশ্যই লিখতে হবে তোমাকে। ছবি তুলে নাও।'

ছবি তুলতে লাগলো রবিন। কিশোর আর মুসা ভালো করে দেখতে লাগলো চত্বরটা, আগের দিন দেখার সুযোগ পায়নি। পশ্চিম দিকে খোলা, পুরানো হোটেলটা থেকে স্পষ্ট চোখে পড়ে সাগর। কোর্টের উত্তরে লম্বা একটা দোতলা বাড়ি, নিচতলায় দোকানপাট। এটাতেই রয়েছে রীডারস হেভেন। একটা ঘুড়ির দোকান আছে, নাম *ব্লু স্কাই*। ওটার পাশে আরেকটা ছোট দোকানের নাম *হ্যাপি বাইইং*। জানালার কাছে শো কেসে সাজানো রয়েছে নানা রকম রঙিন পাথর, খনিজ দ্রব্য আর রুপার তৈরি নানা রকম অলঙ্কার। হোটেল আর এই দোকানটার মাঝের কোণ থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে আরেকটা দোকানের প্রবেশপথের কাছে। ওটার নাম *মারমেড গ্যালারি,* ঠিক হ্যাপি বাইইঙের ওপরে।

'মিস্টার ক্যাম্পার ওটার মালিক,' ডেজার জানালেন। 'মারমেড কোর্ট আর হোটেলটাও তাঁরই। গ্যালারির পাশে ওই যে, বইয়ের দোকানের ওপরের অ্যাপার্টমেন্টটায় থাকেন।'

চত্বরের অন্যান্য বাড়িগুলোর দিকে নজর ফেরালো এবার ওরা। চত্বরের পুরো পুব প্রান্ত জুড়ে রয়েছে মারমেড ইন। দক্ষিণে রয়েছে আরও কিছু দোতলা বাড়ি। নিচতলায় দোকান, ওপরতলায় বাসা। হোটেলের গা ঘেঁষে রয়েছে বড় একটা কাফে, নাম *ওশন ফ্রন্ট স্ন্যাকস।* আর সৈকতের শেষে পানির একেবারে ধার ঘেঁষে রয়েছে আরেকটা দোকান। *উয়েয়ার সামথিং* এটার নাম। সুতো, উল থেকে শুরু

করে সেলাই আর বোনার যাবতীয় সরঞ্জাম পাওয়া যায় এখানে।

খোয়া বিছানো রাস্তা, ফোয়ারা, ঘাসের চাপড়া আর ফুলের টব দিয়ে সুদৃশ্য করে সাজানো হয়েছে চত্বরটা। কাফের সামনে সিমেন্টে বাঁধানো এক বিশাল বেদির মতো উঁচু জায়গা, ছোটখাটো চত্বরই বলা চলে ওটাকে। তাতে চেয়ার-টেবিল সাজানো। শুকনো, রোগা, কালো চুলওয়ালা একজন মানুষ ঘুরে ঘুরে টেবিল থেকে এঁটো বাসন-পেয়ালাগুলো তুলে নিয়ে রাখছে একটা ট্রেতে। দেখে মনে হয়, বহুদিন ঘুম কিংবা গোসল কপালে জোটেনি তার। ওখানেই দেখা গেল কিটুকে। বেদির ওপর উঠে কিনারে গিয়ে লাফ দিয়ে নিচে পড়ছে। আবার উঠছে, আবার পড়ছে। কাছে বসে খুদে বন্ধুর খেলা দেখছে ডব, আর নীরব ভাষায় বাহবা দিচ্ছে যেন।

'এই ছেলে!' হঠাৎ ধমক দিয়ে বললো রোগাটে লোকটা, 'অনেক হয়েছে! থামো এবার!'

মন খারাপ হয়ে গেল কিটুর। বেদি থেকে নেমে বইয়ের দোকানের দিকে রওনা হলো।

'অতোটুকুন একটা ছেলের সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করলো!' লোকটার আচরণ ভালো লাগেনি মুসার। 'কি এমন ক্ষতি করে দিচ্ছিলো?'

'ভদ্রতা এখনও শেখেনি,' ডেজার বললেন। 'ওর নাম রাগবি ডিগার। লোকটোক না পেয়ে শেষে ওকেই রেখেছে হেনরি আর শেলি লিসটার। কাফেটা ওদেরই।'

'ওই বাড়িটাও কি মিস্টার ক্যাম্পারের?' রবিন জানতে চাইলো।

'হ্যাঁ। দেখছো না দুপাশের বাড়িগুলো নতুন। শুধু মাঝের সরাইখানাটা পুরানো। উনিশশো বিশ সালে যখন এখানে সবে বসতি শুরু হয়েছিলো তখনকার তৈরি। শহরটার নাম যে ভেনিস রাখা হয়েছে তার কারণও আছে। ইটালির ভেনিসের মতোই এখানেও রয়েছে প্রচুর খাল। আর এগুলো দেখতেই আগে অনেক লোক আসতো এখানে। ছুটির দিনে দলে দলে আসতো হলিউড থেকে। মারমেড ইনে উঠতো তারা, খাল দেখতো, সাগরে সাঁতার কাটতো। তারপর ধীরে ধীরে এখানকার আকর্ষণ কমে গেল লোকের কাছে। পয়সাওয়ালারা চলে যেতে লাগলো মালিবুতে। শেষে লোকজন আসা প্রায় বন্ধই হয়ে গেল একসময়। লালবাতি জ্বললো সরাইখানাটার। জায়গাটা তখন ব্রড ক্যাম্পার কিনে নিয়ে দুপাশে নতুন বাড়ি তুললো। আমরা ভেবেছিলাম পুরানো বাড়িটারও সংস্কার করবে। কিন্তু কিছুই করলো না। হাতই দিলো না ওটাতে।'

'ব্রড ক্যাম্পার!' হঠাৎ তুড়ি বাজালো কিশোর। 'চিনেছি! কাল দেখেই চেনা চেনা লেগেছিলো, মনে করতে পারছিলাম না। এখন মনে পড়েছে। অভিনেতা।'

'কই, নামও তো শুনিনি কখনও,' মুসা বললো।

'হ্যাঁ, অভিনেতাই ছিলো ক্যাম্পার,' কিশোরের কথায় সায় জানিয়ে বললেন ডেজার। 'অনেকদিন হলো অভিনয় ছেড়ে দিয়েছে, তোমাদের জন্মেরও আগে

থেকে। কিশোর, তুমি চিনলে কি করে? টেলিভিশনে দেখেছো?'

'সিনেমার পোকা ও,' হেসে বললো রবিন। 'হলিউডের ছোট থিয়েটারগুলোতে পুরানো ছবি দেখতে যায় মাঝে মাঝেই।'

মুচকি হাসলো মুসা। 'ও নিজেও অভিনয় করেছে এক সময়। মোটুরাম।'

চোখ কপালে উঠলো ডেজারের। 'মাই গুডনেস! তুমিই *মোটুরাম!* ভালো, ভালো, খুব ভালো! ইউ আর আ জিনিয়াস!'

রক্ত জমলো কিশোরের মুখে। অতীতের এই নামটা শুনতে একটুও ভালো লাগে না তার। টিভি সিরিয়াল *পাগল সংঘ*-তে ওই নামে অভিনয় করেছিলো, এই স্মৃতি মনে পড়লেই তেতো হয়ে যায় মন। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্যে বললো, 'গ্যালারিটা তাহলে ব্রড ক্যাম্পারই চালায়?'

'হ্যাঁ। ছবি, চীনামাটি আর রুপার তৈরি নানা রকম জিনিস, এসব বিক্রি করে।'

কাফে আর উয়েয়ার সামখিণ্ডের ওপরে একটা ব্যালকনি দেখালেন ডেজার। 'দুটো অ্যাপার্টমেন্ট আছে ওখানে। একটাতে আমি থাকি। আর ওই যে সাগরের দিকে মুখ করা, ওটাতে থাকে মিস জেলডা এমিনার। খুব ভালো মহিলা।'

মিস্টার ডেজারের পড়শীর বয়েস সত্তর। ব্যালকনি থেকে সিঁড়ির রেলিং বেয়ে আস্তে আস্তে নেমে আসতে লাগলেন। পরনের গাউনটা বর্তমান ফ্যাশনের তুলনায় অনেক বেশি ঢোলা। ঝুলও বেশি। হ্যাটের চারপাশে বসানো কাপড়ের তৈরি লাল গোলাপ।

'গুড মরনিং মিস এমিনার,' ডেজার বললেন। 'আসুন। এরা আমার ইয়াং ফ্রেণ্ড।' একে একে নাম বলে বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি।

'কিশোর পাশা!' উচ্চারণটা ঠিকমতো করতে পারলেন না মহিলা। 'চমৎকার নাম তো! ওরকম শুনিনি।'

'ও বাংলাদেশী।' বুঝিয়ে বললেন ডেজার, 'একটা কাজে এসেছে এখানে। রিসার্চ ওঅর্ক। ভেনিস সম্পর্কে লিখবে ইস্কুলের ম্যাগাজিনে।'

'ভেনিস? নাকি শুধু মারমেড কোর্ট?'

অবাক হলো রবিন। 'মারমেড কোর্টেই এতো কিছু জানার আছে নাকি?'

'অনেক, অনেক,' মিস এমিনার বললেন। 'এই মারমেড ইন থেকেই নিরমা হল্যাণ্ড নিখোঁজ হয়েছিলো।'

শূন্য দৃষ্টিতে তাকালো রবিন আর মুসা।

'অনেক দিন আগের কথা, তাই না?' ডেজারের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করলেন মিস এমিনার। জবাবের অপেক্ষা না করেই বললেন, 'তখন ভেনিসের খুব জমজমাট অবস্থা। এখানে প্রায়ই থাকার জন্যে আসতো নিরমা। এক রোববারে সকালে উঠে সাঁতার কাটতে বেরিয়েছিলো। তারপর থেকে গায়েব, আর দেখা যায়নি।'

ভুরু কোঁচকালো কিশোর। 'গল্পটা আমিও শুনেছি।'

'তা তো শুনবেই। হলিউডের অনেকেই জানে এই গল্প। নিরমার লাশ পাওয়া

যায়নি। ফলে রঙ চড়িয়ে নানা গল্প বলতে লাগলো লোকে। কেউ বললো ভাসতে ভাসতে উপকূলের দিকে চলে গিয়েছিল ও। অ্যারিজোনার ফিনিক্সে গিয়ে উঠেছিলো। তারপর থেকে বাস করছে ওখানকার এক পোলট্রি ফার্মে। কেউ বা বললো সাগর থেকে উঠে লুকিয়ে লুকিয়ে এসে আবার মারমেড ইনে ঢুকেছিলো নিরমা। একটা ঘরে আটকে রেখেছিলো নিজেকে। কারণ হঠাৎ জানতে পেরেছিলো, এক ভয়ঙ্কর রোগে আক্রান্ত হয়েছে সে। যে রোগের কথা জানলে আঁতকে উঠবে লোকে। মানুষের সামনে বেরিয়ে তাদের ঘৃণার পাত্র হতে চায়নি।'

মিস এমিনার থামতেই ডেজার বললেন, 'লোকে বলে হোটেলে নাকি ভূতের উপদ্রব আছে। আর ভূতটা হলো নিরমা হল্যাণ্ডের। কথাটা আমিও বিশ্বাস করি।'

'দূর, কিসের ভূতটুত!' হাত নেড়ে উড়িয়ে দিলেন যেন মিস এমিনার।

'কিছু একটা আছেই!' জোর দিয়ে বললেন ডেজার। 'রাতে জানালায় আলো দেখেছি। কাউকে ঢুকতেও দেখা যায় না, বেরোতেও না। তারমানে ভেতরেই থাকে কেউ। ব্রড ক্যাম্পার হয়তো জানে ব্যাপারটা। সে জন্যেই তেমনি রেখে দিয়েছে হোটেলটা। মেরামত করে ঠিকঠাক করছে না।'

'কেন, ভূতের ভয়ে?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'না,' বিরক্তি দেখা দিলো মিস এমিনারের চোখে। 'হয়তো পাবলিসিটি চাইছে। যাও না, গিয়ে ওকেই জিজ্ঞেস করো না। গ্যালারিতে আছে।'

ক্যাম্পারের রাগ দেখেছে রবিন। আমতা আমতা করে বললো, 'যাবো··· এখন?···তিনি হয়তো এখন ব্যস্ত।'

'কথা বলার সময় পাবে না, এতোখানি ব্যস্ত সে কোনো কালেই থাকে না,' হঠাৎ রেগে গেলেন মিস এমিনার। লোকটাকে যে দুচোখে দেখতে পারেন না, বোঝা গেল। 'নিজের ঢাকঢোল পেটানোর সুযোগ পেলে আর কিছুই চায় না। গিয়ে খালি বলে দেখো না, ইস্কুলের ম্যাগাজিনে তার নাম ছাপবে। লাফিয়ে উঠবে সাক্ষাৎকার দেয়ার জন্যে।'

ক্যাফের দিকে এগোলেন মিস এমিনার।

ডেজার হাসলেন। 'প্যারেড শুরু হতে দেরি আছে এখনও। কথা বলতে ইচ্ছে করলে যেতে পারো।'

কোর্টের উত্তরে সিঁড়ির দিকে এগোলো ছেলেরা একবার দ্বিধা করে লম্বা একটা দম নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে আরম্ভ করলো রবিন। বদমেজাজী লোকটার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছেও করছে, আবার সাহসও পাচ্ছে না। সমস্যাই বটে!

তিন

মারমেড গ্যালারির উঁচু ছাত, সাদা দেয়াল। ছেলেরা ঢুকতেই কোথাও একটা ঘণ্টা বাজলো। চারপাশে তাকালো ওরা। উজ্জ্বল রঙের পর্দা। আবলুস আর রোজউড

কাঠ কুঁদে তৈরি নানারকম চমৎকার ভাস্কর্য রয়েছে। আর আছে দেয়ালে ঝোলানো ছবি এবং কাঁচের সুদৃশ্য বাক্সে রাখা চীনামাটির তৈরি নানারকম সুন্দর সুন্দর জিনিস। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হয়েছে রুপা কিংবা রঙিন কাঁচে তৈরি অনেক ধরনের ফুলদানী।

দরজার পাশে বিরাট জানালাটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে চীনামাটির তৈরি একটা তরুণী জলকন্যার মূর্তি। ফুট দুয়েক লম্বা। অর্ধেক-মানুষ-অর্ধেক-মাছ ওই কল্পিত জীবটি হাসছে। বেশ একটা খেলা খেলা ভাব। মাছের লেজের ওপর ভর রেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুহাতে ধরে রেখেছে একটা সাগরের ঝিনুক।

'কি চাই?' তপ্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো ব্রড ক্যাম্পার। কোমর সমান উঁচু একটা কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট একটা ভাঁড়ার ঘরমতো করা হয়েছে ওখানটায়। একটা সিংক আছে, ক্যাবিনেট আছে। ব্রাশ আর ঝাড়ু রাখার আলমারিটা রাখা হয়েছে ঘরের ডান কোণ ঘেঁষে।

আবার দ্বিধা করলো রবিন, একবার ভাবলো বেরিয়েই যায়। লোকটার গোমড়া মুখ দেখেই বুকের মধ্যে কেমন করছে তার।

কিন্তু কিশোর এগিয়ে গেল ভারিক্কি চালে। পরিচয় দিলো, 'আমি কিশোর পাশা। কাল দেখা হয়েছিলো আমাদের। কিটুদের বইয়ের দোকানে আপনার কথা অনেক শুনেছি, তাই দেখা করতে এলাম।'

তার শেষ কথাটায় অনেকখানি নরম হলো ক্যাম্পার। সেটা বুঝতে পেরে ভরসা পেলো কিশোর। রবিনকে দেখিয়ে বললো, 'আমার বন্ধু রবিন মিলফোর্ড। ইস্কুলের ম্যাগাজিনে একটা আর্টিকেল লিখবে। তথ্য দরকার। আমরা শুনলাম, ভেনিসের একজন বিশিষ্ট লোক আপনি।'

'অ্যাঁ! হ্যাঁ, তা ঠিক,' দেয়ালের ধারে রাখা কয়েকটা চেয়ার দেখালো ক্যাম্পার। 'তা বসো না তোমরা, দাঁড়িয়ে কেন?' একেবারে বদলে গেছে। নিজেও একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে, খুব সতর্কভাবে শব্দ চয়ন করে ভেনিস সম্পর্কে বলতে শুরু করলো, 'বহুদিন থেকেই মারমেড কোর্টের ব্যাপারে ইনটারেস্টেড ছিলাম আমি। ভেনিসে সাঁতার কাটতে আসতাম। সাইকেল চালানোর রাস্তাও তখন ছিলো না এখানে। সৈকতের ধারে ছোট ছোট কয়েকটা বীচ হাউস ছিলো, প্রায় ধসে গিয়েছিলো ওগুলো। খালের পাড় আগাছায় ভর্তি।

'এই সময় একদিন শুনলাম মারমেড ইন বিক্রি হবে। খোঁজ নিয়ে জানলাম, দাম খুব বেশি না, আমার সামর্থ্যের মধ্যেই। সামনের জায়গাটা সহ কিনে ফেললাম হোটেলটা। ছোটবেলায় নিরমা হল্যাণ্ডের ভক্ত ছিলাম আমি। হোটেলটা কিনে খুব ভালো লাগলো। মনে মনে গর্ব হতে লাগলো—আমার প্রিয় অভিনেত্রী যেখানে তাঁর শেষ রাতটা কাটিয়েছেন, সেটার মালিক হতে পেরেছি আমি।'

এক এক করে তিন কিশোরের মুখের দিকে তাকালো ক্যাম্পার। 'নিরমা হল্যাণ্ডের কথা নিশ্চয় জানো?'

'জানি,' মাথা ঝাঁকালো রবিন।

'জায়গাটা যখন কিনেছিলাম,' ক্যাম্পার বললো, 'শুধু সরাইখানা আর সামনে কাঁটাতারের বেড়া দেয়া একটা চত্বর ছাড়া আর কিছু ছিলো না এখানে। দুপাশের নতুন বিল্ডিং দুটো আমি বানিয়েছি। সামনের জায়গাটা আমি সাজিয়েছি। থাকবোই যখন ঠিক করেছি, একটু গোছগাছ করে না নিলে কি চলে। আর করেছি বলেই তো আবার লোকজন আসতে আরম্ভ করেছে। অনেক গণ্যমান্য লোক আছে তাদের মধ্যে।'

নিজের বক্তৃতায় নিজেই সন্তুষ্ট হয়ে হাসলো ক্যাম্পার। 'দেখে নিও, একদিন এই ভেনিস একটা শহরের মতো শহর হবে। সবার মুখে মুখে ফিরবে এর নাম। পতিত জায়গাগুলো সব ঠিকঠাক হবে। গড়ে উঠবে নতুন নতুন বাড়িঘর। দাম অনেক বেড়ে যাবে এই মারমেড কোর্টের।'

ক্যাম্পার থামতেই কিশোর বলে উঠলো, 'সরাইখানাটার কি হবে? মেরামত করবেন?'

'এখনো মনস্থির করিনি। একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। হয়তো পুরোটাই ভেঙে ফেলে নতুন করে গড়তে হবে। কিন্তু এটা একটা ইতিহাস, ভাঙতে মন চায় না।'

খোলা দরজার দিকে তাকালো ক্যাম্পার। 'প্যারেড আসছে।' ছেলেদের দিকে ফিরলো আবার। 'তা আর কিছু জানার আছে?'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলো ওরা। বেরিয়ে যেতে বলা হচ্ছে ওদের। ক্যাম্পারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলো।

শূন্য চত্বর। সবাই গিয়ে ভিড় করেছে প্যারেড যেখানে হচ্ছে সেখানটায়। জোরে জোরে বাজছে এখন বাজনা। বাজনা না বলে হর্ন, ড্রাম আর বাঁশির কান ঝালাপালা করা মিশ্র শব্দ বললেই বোধহয় মানায় ভালো।

তিন গোয়েন্দাও এগোলো সেদিকে। সৈকতে বাজি পুড়ছে এখনও। ফাটছে পটকা। শুরু হলো প্যারেড। আসলেই, ওরকম প্যারেড আর কখনো দেখেনি ওরা। ড্রাম বাজার তালে তালে ইস্কুলে দল বেঁধে যে রকম প্যারেড করে ওরা সে রকম নয়। লোকে মার্চ করছে ঠিকই, তবে যার যার মতো করে। কেউ নির্দেশ দেয়ার নেই, নির্দেশ মানারও কেউ নেই। পোশাকও ইচ্ছে মতো পরেছে সবাই। শার্ট-প্যান্ট তো বটেই, বেদিং স্যুট এমনকি শাড়িও পরেছে কেউ কেউ। কেউ পরেছে বিচিত্র আলখেল্লা, বুকের কাছে গোল গোল আয়না সেলাই করে লাগিয়ে নিয়ে। মোট কথা, যার যা পরনে আছে, তাই নিয়ে নেমে পড়া যায় ওই প্যারেডে।

'খাইছে!' বিড়বিড় করে বললো মুসা, 'কাণ্ড দেখেছো! মনে হয় ন্যাংটো হয়ে নেমে গেলেও কেউ কিছু মনে করবে না!'

তার কথার জবাব দিলো না কেউ। রবিন ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত। কিশোর তাকিয়ে রয়েছে কিটুর দিকে। কয়েক ফুট দূরে মায়ের কাঁধে চড়ে প্যারেড দেখছে। সেদিক থেকে মুখ ফেরাতে চোখে পড়লো, ওশন ফ্রন্টে তাঁর প্রিয় বেঞ্চটায় গিয়ে বসেছেন মিস্টার ডেজার।

বেশিক্ষণ কাঁধে থাকতে ভালো লাগলো না কিটুর। জোর করে নেমে পড়লো। মায়ের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড় দিলো চত্বরের দিকে। 'এই, এই কোথায় যাচ্ছিস!' চেঁচিয়ে ডাকলো নিনা। 'খবরদার, ক্যাম্পারের বাড়ির ধারেকাছেও যাবি না!'

'আচ্ছা।' ফিরে তাকালো না কিটু। দৌড়ে চলে গেল। পেছনে গেল ডব।

প্যারেড চলছে। শুধু আজকের দিনের জন্যে ওশন ফ্রন্টে গাড়ি ঢোকার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

আরও কিছুক্ষণ পর, কিশোরের কানে এলো নিনা বলছে, 'কিটুটা গেল কোথায়?'

মারমেড কোর্টের দিকে গেল নিনা। ফিরে এলো একটু পরেই। 'বাবা?' ডাকলো সে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে।

'বাবা, কোথায় তুমি?'

বেরিয়ে এলেন হেনরি বোরম্যান।

'বাবা, কিটুকে খুঁজে পাচ্ছি না!'

'আছে কোথাও,' মেয়ের হাত চাপড়ে দিয়ে বললেন বৃদ্ধ। 'ডব আছে তো সঙ্গে?...কিছু হবে না।'

কিন্তু মায়ের উদ্বেগ কাটলো না। শেষে মেয়েকে নিয়ে কোর্টের দিকে এগোলেন বোরম্যান, নাতিকে খোঁজার জন্যে।

ডেকে ডেকে সারা হয়ে গেল দুজনে, কিন্তু না মিললো কিটুর সাড়া, না দৌড়ে এলো ডব।

কোর্টের নিচতলার দোকানগুলোতে খুঁজলেন বোরম্যান। ব্যালকনিতে বেরিয়ে এলো ক্যাম্পার। কাফের মালিক বেরিয়ে এলো তার দোকানের সামনের বেদিতে। কিটুর কথা জিজ্ঞেস করতে ঘাড় নাড়লো দুজনেই। দেখেনি।

এইবার ভয় ফুটলো নিনার চোখে। 'বাবা, আবার হারিয়েছে! হারিয়ে গেছে!'

'আহ্, এতো অস্থির হোস কেন?' সান্ত্বনা দিলেন বাবা। 'পাওয়া যাবেই।'

আরেকবার কিটুকে খুঁজতে বেরোলো তিন গোয়েন্দা। আগের দিনের মতো করেই খুঁজতে শুরু করলো। তবে এদিন ভিড়ের কারণে খোঁজাটা ততো সহজ হলো না। মারমেড কোর্ট থেকে পাঁচ কি ছয় ব্লক দূরে এসে দাঁড়িয়ে গেল ওরা। ধসে পড়া পুরানো একটা অ্যাপার্টমেন্টের ভাঙা সিঁড়িতে জিরিয়ে নিতে বসলো।

'পেলাম না তো,' রবিন বললো। 'হয়তো ফিরে গেছে। বইয়ের দোকানে, মায়ের কাছে। গিয়ে দেখা যাক, কি বলে?'

'চলো,' উঠে দাঁড়ালো মুসা। 'খামোকাই বোধহয় প্যারেডটা মিস করলাম।'

কিশোর কথা বলছে না। সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। অস্থির।

কি ভেবে উঠে দাঁড়ালো রবিন। এগিয়ে গেল বাড়িটার একপাশে। বড় একটা রাবিশ বিন দেখে উঁকি দিলো তার ভেতরে। চেঁচিয়ে উঠলো পরক্ষণেই, 'এই, জলদি দেখে যাও!'

'কি, কি হয়েছে!' ছুটে গেল মুসা।

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে রবিনের মুখ। 'একটা কুকুর...ডব...মনে হয় মরে গেছে!'

চার

বিকেল বেলা পুলিশ এলো কিটুকে খুঁজতে। সমস্ত ওশন ফ্রন্ট চষে ফেলা হলো, কিন্তু ছেলেটাকে পাওয়া গেল না।

পুলিশ যখন খুঁজছে, তখন মারমেড কোর্টে ক্যাফের বারান্দায় বসে অপেক্ষা করছে তিন গোয়েন্দা। ওদের সঙ্গে রয়েছেন ডেজার। শেষ বিকেলে মিস এমিনার এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিলেন। বললেন, 'সাংঘাতিক কাণ্ড!'

মহিলার কথায় শঙ্কা ফুটলো মুসার চোখে। বোধহয় ভূতের কথা মনে পড়ে গেছে। বিড়বিড় করে বললো, 'কিসে যে মারলো কুকুরটাকে। তবে আমার মনে হয় কিটু ভালোই আছে।'

'জোর দিয়ে বলা যায় না। সব সময় একসঙ্গে থাকতো দুজনে। ডবকে যে মেরেছে তাকে নিশ্চয় দেখেছে কিটু। চিৎকার করেছে। হয়তো বাধা দেয়ারও চেষ্টা করেছে। আর সেটা করে থাকলে...' কথাটা শেষ করলেন না তিনি, শুধু মাথা নাড়লেন।

'আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন,' একমত হলো কিশোর। 'কিটুকে কেউ কিছু করতে এলে ডবের তাকে ছেড়ে দেয়ার কথা নয়। আর সেটা করতে গিয়েই নিশ্চয় খুন হয়েছে বেচারা।'

'পুলিশের ধারণা,' রবিন বললো, 'গাড়ি চাপা পড়েছে কুকুরটা। সাধারণ অ্যাক্সিডেন্ট। মরে যাওয়ার পর লোক জানাজানি করে আর ঝামেলা করেনি ড্রাইভার। চুপচাপ রাবিশ বিনে লাশটা ফেলে দিয়ে পালিয়েছে।'

'তাহলে কিটু বাড়ি ফিরলো না কেন?' প্রশ্ন তুললো কিশোর।

এই সময় বইয়ের দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন বোরম্যান। পিছে পিছে এলো নিনা। শুকনো, ফ্যাকাসে চেহারা। দুজনেরই চোখ ওশন ফ্রন্টের দিকে। সৈকতে এখন লোকের ভিড় নেই। পাশের একটা রাস্তা থেকে এসে চত্বরে ঢুকলো একটা গাড়ি। মারমেড কোর্টের ঠিক সামনে এসে থামলো। দুজন লোক নামলো, একজনের হাতে ভিডিও ক্যামেরা।

'টেলিভিশনের লোক,' ডেজার বললেন। 'নিনার সাক্ষাৎকার নেবে মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, তাই তো।'

নিনার মুখের কাছে মাইক্রোফোন ধরে আছে একটা লোক।

এই সময় বেরোলো ব্রড ক্যাম্পার। গ্যালারি থেকে নেমে গিয়ে দাঁড়ালো নিনার পাশে। তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে কাঁধে হাত রাখলো।

'হায়রে কপাল!' কপাল চাপড়ালেন মিস এমিনার। 'ক্যামেরার সামনে

দাঁড়ানোর লোভটাও ছাড়তে পারলো না। বেহায়ার হাড্ডি।'

'ওকে আপনি দেখতে পারেন না,' কিশোর বললো।

'না, পারি না। ওরকম একটা ছোটলোককে কেউ দেখতে পারে নাকি?'

'আমার কিন্তু অতোটা খারাপ মনে হয় না,' ডেক্সার বললেন।

'আপনি লোক চেনেন না, মিস্টার ডেক্সার, তাই একথা বলছেন। ওটা একটা পাজীর পা ঝাড়া!'

যাকে নিয়ে এতো সমালোচনা সে ওদিকে বেশ জমিয়ে ফেলেছে রিপোর্টারদের সঙ্গে। সাক্ষাৎকারটা এখন মূলতঃ সে-ই দিয়ে চলেছে।

'বেশরম কোথাকার!' ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন মিস এমিনার।

টেলিভিশনের লোকেরা চলে গেলে তিন গোয়েন্দাও উঠলো। বাড়ি যাবে। বইয়ের দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে নিনা। কাঁদছে। কি মনে হলো তিন কিশোরের, কাছে এগিয়ে গেল। পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার কার্ড বের করে দিয়ে বললো, 'এটা রাখুন। আমাদের ঠিকানা। সাহায্যের প্রয়োজন হলে ডাকবেন।'

কার্ডটা পড়লো নিনা। 'তোমরা গোয়েন্দা?'

'হ্যাঁ,' মুসা বললো। 'অনেক জটিল রহস্যের সমাধান আমরা করেছি। বিশ্বাস না হলে রকি বীচের পুলিশকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।'

'না না, বিশ্বাস করছি। পুলিশ খুঁজছে তো এখন, খুঁজুক। আশা করি বের করে ফেলবে।' বললো বটে, কিন্তু নিনার কণ্ঠ শুনে মনে হলো না খুব একটা ভরসা রাখতে পারছে পুলিশের ওপর।

গোধূলির ম্লান আলোয় সাইকেল চালিয়ে রকি বীচে ফিরে চললো তিন গোয়েন্দা। মনে ভাবনা। হারানো ছেলেটার কথাই ভাবছে।

'আস্ত শয়তান!' সাইকেল চালাতে চালাতে বললো মুসা। 'নইলে ওরকম একটা কুকুরকে মারে!'

'আমার মনে হয় অ্যাক্সিডেন্টই,' রবিন বললো। 'কিশোর, তোমার কি মনে হয়?'

'বুঝতে পারছি না,' জবাব দিয়ে আবার চিন্তায় ডুবে গেল গোয়েন্দাপ্রধান।

রাত দশটায় টিভির খবরে নিখোঁজ সংবাদটা দেখলো সে। ড্রইং রুমে বসে আছে। রাশেদ পাশা আর মেরিচাচীও আছেন ওখানে।

নিনাকে একলা দেখা গেল কিছুক্ষণের জন্যে। তার পরেই এসে উদয় হলো ব্রড ক্যাম্পার। বললো, 'আমরা সবাই দোয়া করি, ভালো ভাবে ফিরে আসুক ছেলেটা। খুব লক্ষ্মী ছেলে। মারমেড কোর্টের সবাই তাকে ভালোবাসে।'

'আশ্চর্য!' টেলিভিশনের পর্দায় স্থির হয়ে আছে মেরিচাচীর দৃষ্টি। 'বয়েস এতো কম লাগছে কেন ক্যাম্পারের? শরীর-স্বাস্থ্যের দিকে কড়া নজর রেখেছে দেখছি!'

'কিছু মানুষের শরীরই থাকে ওরকম,' রাশেদ চাচা মন্তব্য করলেন। 'সহজে ভাঙে না।'

পর্দা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল ক্যাম্পার। ঘোষককে দেখা গেল। বললো সে, 'এখনও কিটু হারকারের খোঁজ মেলেনি। তার সম্পর্কে কেউ কিছু জানতে পারলে স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কিটুর বয়েস পাঁচ, তিন ফুট ছয় ইঞ্চি লম্বা, কালো চুল, পরনে জিনসের প্যান্ট, গায়ে লাল-নীল ডোরাকাটা টি শার্ট।'

কিটুর একটা ফটোগ্রাফ দেখানো হলো। ছবিটা তেমন স্পষ্ট নয়। ভালো ওঠেনি, কিংবা নষ্ট হয়ে গেছে। এরপর অন্য কথায় চলে গেল ঘোষক।

'আহারে, বেচারি,' নিনার জন্যে আফসোস করলেন মেরিচাচী। 'কতো না জানি কান্নাকাটি করছে এখন!'

রাত হয়েছে। উঠে ঘুমাতে চলে গেলেন চাচা-চাচী। কিশোর একা বসে বসে ভাবতে লাগলো। এভাবে গায়েব হয়ে গেল কি করে ছেলেটা? লোকজন তো কম ছিলো না তখন। নিশ্চয় কারো না কারো নজরে পড়েছে।

পরদিন সকালেও নিখোঁজ রইলো কিটু। নাস্তার পর রান্নাঘরের কাজে চাচীকে সাহায্য করলো কিশোর। তারপর বেরিয়ে এলো বাইরে। ঢুকলো এসে হেডকোয়ার্টারে। ঢুকতেই টেলিফোন বাজলো। রিসিভার তুলে কানে ঠেকালো। ভেসে এলো নিনা হারকারের কণ্ঠ, 'হালো, কিশোর পাশা?'

'বলুন?'

'কিশোর,' কান্না জড়ানো গলায় বললো নিনা, 'সারা রাত বাবা খোঁজাখুঁজি করেছে। পুলিশও অনেক খুঁজেছে। পায়নি...' ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো সে।

'কাঁদবেন না। পাওয়া যাবেই। আমরাও খুঁজবো।'

'সে জন্যেই ফোন করেছি। প্লীজ, যদি আসো!...তোমাদের অনেক প্রশংসা করেছেন ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার।'

কিশোর বুঝতে পারলো, রকি বীচ পুলিশ স্টেশনে খবর নিয়েছে নিনা। বললো, 'আপনি ভাববেন না। রবিন আর মুসাকে নিয়ে এখনই আসছি।'

পাঁচ

বইয়ের দোকানে একা বসে আছে নিনা হারকার। চোখের কোণে কালি পড়েছে। হাত কাঁপছে অল্প অল্প। তিন গোয়েন্দাকে দেখেই বলে উঠলো, 'নাহ্, কোনো খোঁজ নেই! কিচ্ছু না! পুলিশ এখনও খুঁজছে। ডবের পোস্ট মর্টেম করেছে। খোদাই জানে, কেন!'

'কিভাবে মরেছে বোঝার জন্যে,' কিশোর বললো।

'বুঝলে কি হবে?'

'মৃত্যুটা কি করে হয়েছে জানা থাকলে অনেক সময় হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে সুবিধা হয়। তদন্ত করতে যাচ্ছি আমরা। মারমেড কোর্ট থেকেই শুরু

করবো, যেখানে ডবের লাশটা পাওয়া গেছে।'

'কি লাভ? পুলিশ কোনো জায়গাই বাদ রাখেনি। সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।'

'তবু চেষ্টা করবো। সব কথা আমাদেরও জানতে হবে। এমন কিছু জানাতে পারে আমাদেরকে কেউ, যা পুলিশকে বলতে ভুলে গেছে। হয় ওরকম। কিটুর ব্যাপারেও খোঁজ খবর নেবো যতোটা পারা যায়। কাল তাকে আমরা কোর্টে দেখেছি। নিশ্চয় কেউ না কেউ বেরোতে দেখেছে। ঠিক না?'

'তা দেখতে পারে।'

তদন্ত করতে বেরোলো তিন গোয়েন্দা। প্রথমে কথা বললো ঘুড়ির দোকানের লম্বা, রোগাটে লোকটার সঙ্গে। তার নাম জনি মিউরো। মারমেড কোর্ট থেকে কিটুকে বেরিয়ে আসতে দেখেছে সে। তারপর কোথায় গেছে বলতে পারলো না।

'দোকান থেকে বেরিয়ে কোর্টের সামনে গিয়েছিলাম,' মিউরো বললো, 'প্যারেড দেখতে। মিনিটখানেকের বেশি থাকিনি। কিটুকে দেখলাম বেরিয়ে আসছে। সঙ্গে ডব। কুত্তাটা সব সময় তার সঙ্গে থাকতো।'

'আপনার দোকানের দরজা খোলা ছিলো?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর। 'এমনও তো হতে পারে সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে ও?'

মাথা নাড়লো মিউরো। 'পেছনের দরজায় ডেড-বোল্ট লক লাগানো, দেখছো না? বেরোতে হলে ওটা খুলতে হতো তাকে। নাগাল পেতে হলে উঠতে হতো চেয়ারে। খুলে বেরিয়ে গেলে খোলা থাকতো দরজাটা। আমার চোখে অবশ্যই পড়তো। চালাকি করে চেয়ার সরিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে হয়তো বেরিয়ে যেতে পারতো, তাহলে সহজে আমার চোখে পড়তো না ব্যাপারটা। কিন্তু কোনো জিনিস একবার সরিয়ে আবার আগের জায়গায় নিয়ে রাখবে কিটু? অসম্ভব! যেখানে যা নিয়ে যাবে সেখানেই ফেলে রেখে যাবে।'

রক স্টোরের মালিক মিস জারগনও একই রকম কথা বললো। প্যারেডের সময় দোকান ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছিলো, কিন্তু কিটু বা অন্য কাউকেই দোকানে ঢুকতে দেখেনি। তাছাড়া দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়েছিলো। 'এখানে দরজা খোলা রেখে বেরোবো! মাথা খারাপ!' বললো সে। 'চোরের যা উৎপাত! এক মিনিটে ফাঁকা করে দেবে দোকান।'

'কিটুর কথা আর কি বলবো? কিভাবে পালিয়েছে ও-কি একটা বলার ব্যাপার হলো? ও ওভাবেই পালায়। চোখের পলকে। এই আছে তো এই নেই। নিশ্চয় ভিড়ের ভেতর থেকে মানুষের পায়ের ফাঁক দিয়েই বেরিয়ে চলে এসেছিলো।'

'আসলে, কোন দিকে গেছে ও বোঝার চেষ্টা করছি। কেউ না কেউ হয়তো দেখেছে। কুকুরটা সঙ্গে ছিলো তো, চোখে না পড়ার কথা নয়।'

কুকুরের কথায় কেঁপে উঠলো মিস জারগন। 'বোলো না, বোলো না, লোকটা একটা পিশাচ। নইলে ওরকম একটা বুড়ো জানোয়ারকে ওভাবে মারতে পারে!'

'ডবকে কে মেরেছে এখনো জানি না আমরা।' তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বের করে দিলো কিশোর, 'আমাদের ফোন নম্বর। যদি কিছু মনে পড়ে আপনার, দয়া করে জানাবেন।'

ব্লক স্টোর থেকে বেরিয়ে সুতোর দোকানে চললো ওরা।

মিসেস কেলান শান্ত, ভদ্র। সুন্দর চুল। সুতোর দোকানটার মালিক। কিটুকে তিনি দেখেছেন আগের দিন। তবে তখনো দোকান থেকে বেরোননি। 'জানালা দিয়েই প্যারেড দেখছিলাম,' বললেন তিনি। 'ছেলেটা যে কোথায় গেল, দেখিনি। নিনা বেচারির জন্যে কষ্ট লাগছে। ছেলে হারালে মায়ের কি কষ্ট হয় বুঝি তো।'

এরপর ক্যাফেতে এসে ঢুকলো তিন গোয়েন্দা। কফি আর পেস্ট্রি খাচ্ছে কয়েকজন লোক। খাবার সরবরাহ করছে হেনরি লিসটার। ছেলেরা ঢুকে তাকে প্রশ্ন শুরু করতেই ওদেরকে রান্নাঘরে স্ত্রীর কাছে এনে রেখে গেল সে। যা জবাব দেয়ার শেলিই দিক।

'কাল এখানে আসেনি কিটু,' শেলি জানালো। 'মাঝে মাঝে আসতো আমাদের এখানে। মায়ের নাম করে ফাঁকি দিয়ে কেকটেক নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতো। কয়েক দিন দিয়েছি। পরে যখন বুঝে গেলাম, আর দিতাম না।'

'প্যারেড শুরু হওয়ার পর আর ওকে দেখেননি, মা?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'না। ব্যস্ত ছিলাম। আমাদের রেগুলার ওয়েইটার রাগবিটা তখন বেরিয়ে গেছে। না জানিয়ে মাঝে মাঝেই গায়েব হয়ে যায় ও।'

শেলি লিসটারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলো তিন গোয়েন্দা। চত্বর পেরিয়ে এসে মারমেড গ্যালারির সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলো। ভেতরেই পাওয়া গেল মালিককে।

'কিটুর কথা জানতে এসেছো কেন?' কিশোরের প্রশ্নের জবাবে পাল্টা প্রশ্ন করলো ব্রড ক্যাম্পার। 'তোমরা তো ইস্কুলের ম্যাগাজিনের তথ্য সংগ্রহ করছিলে। হঠাৎ এই নতুন কৌতূহল কেন?'

রবিন জবাব দিলো, 'আজ আমরা তথ্য সংগ্রহ করছি না। মিসেস হারকারকে সাহায্য করতে এসেছি।'

'তোমরা আর কি সাহায্য করবে? যা করার পুলিশই তো করছে। এসব কাজে ওরা তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি দক্ষ।'

'তবু মিসেস হারকার আমাদের সাহায্য চেয়েছেন,' কিশোর বললো। একটা কার্ড বের করে দেখালো ক্যাম্পারকে।

'বাহ! গোয়েন্দা!' কিছুটা টিটকারির সুরেই বললো ক্যাম্পার।

'হ্যাঁ,' মুসা বললো। 'অনেক রহস্যের সমাধান আমরা করেছি।'

'তাই? ভালো। তা কি জানতে চাও?'

'জানতে চাই, কাল কিটু কি কি করেছে,' কিশোর বললো। 'ও কোনদিকে

গেছে জানতে পারলে সুবিধে হতো। প্যারেড শুরু হওয়ার পর কোথায় গেছে, বলতে পারবেন?'

'না। তবে যেদিকেই যাক, যা-ই ঘটুক তার, এখানে কিছু ঘটেনি। কুত্তাটা গাড়ির নিচে পড়ে মরেছে, শুনেছো তো? মারমেড কোর্টে তো গাড়িই নেই, এখানে মরে কিভাবে?'

'তা ঠিক। আমি একথা বলতে চাইছি না। আমার কথা, কোর্টে দেখা গেছে কিটুকে। অনেকেই দেখেছে। তারপর হঠাৎ করে একেবারে লাপাত্তা, কারো চোখেই পড়লো না, এটা বিশ্বাস করা কঠিন।' পেছনের একটা দরজা দেখিয়ে বললো কিশোর, 'সামনে দিয়ে ঢুকে ওখান দিয়ে বেরিয়ে যায়নি তো?'

বলতে বলতে গিয়ে ঠেলা দিলো পাল্লায়। তার হাতের ছোঁয়া লাগতেই খুলে গেল ওটা। দেখা গেল সিঁড়ি নেমে গেছে বাড়ির পেছন দিকে। পাশের বাড়ির সামনে গাড়ি পার্কিঙের জায়গা। একটা রাস্তা চলে গেছে ওশন ফ্রন্টের সমান্তরালে, ওটারই নাম স্পীডওয়ে। খোয়া বিছানো, সরু, এবড়ো-খেবড়ো পথ। পার্কিং লটে ঢোকার জন্যে গুঁতোগুঁতি করছে ড্রাইভাররা।

পাল্লাটা ভেজিয়ে দিলো কিশোর। 'দরজার ছিটকানি লাগান না?'

'ঘর বন্ধ করে বেরোনোর আগে লাগিয়ে যাই। দিনের বেলা খোলাই রাখি। গ্যারেজে যেতে হয়, ডাস্টবিনে ময়লা ফেলতে যেতে হয়। কতোবার খুলবো ছিটকানি?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সামনের দরজার কাছে ফিরে এলো কিশোর। ছোট একটা ঘণ্টা আছে। ইলেকট্রিক বীমের সাহায্যে সুইচ অন হয়। কিশোরের শরীরে ওই বীম বাধা পেতেই বেজে উঠলো ঘণ্টাটা। 'কোমর সমান,' বিড়বিড় করলো সে। 'বেল না বাজিয়ে সহজেই বীমের নিচে দিয়ে চলে যেতে পারে কিটু। আপনি ক্ষণিকের জন্যে এখান থেকে সরলেও চলে যেতে পারে, পলকে।'

শূন্য দৃষ্টিতে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলো ক্যাম্পার। তারপর হাসলো। 'ও, গত হপ্তায় এভাবেই ঢুকেছিল তাহলে! তাই তো বলি, জিনিসপত্র সব ছড়িয়ে ফেলে রেখে গেল, ঘণ্টা বাজলো না কেন?'

'বীম এড়িয়ে যে ওটুকু একটা বাচ্চা ছেলে ঢুকতে পারে, খেয়ালই করেননি কখনও?' বিশ্বাস করতে পারছে না কিশোর।

'ন্-নাহ্!'

ওরা যখন কথা বলছে, মুসা তখন ঘুরে ঘুরে দেখছে গ্যালারিটা। বড় ডিসপ্লে উইণ্ডোর সামনে রাখা বেদিটার কাছে এসে হতাশ হলো সে। শূন্য বেদি ক্যাম্পারকে জিজ্ঞেস করলো, 'জলকন্যাটা কি বেচে দিয়েছেন?'

'না...' দ্বিধা করলো ক্যাম্পার। 'কাল চুরি হয়ে গেছে। একজন খদ্দেরকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, তখন। ওটা কেন চুরি করলো বুঝলাম না। এর চেয়ে অনেক দামী জিনিস আছে এখানে।'

'হুঁ,' আনমনে বললো কিশোর।

'দুনিয়ার যতো আজেবাজে লোক এসে হাজির হয় এই বীচে,' বিরক্ত কণ্ঠে বললো ক্যাম্পার। 'কুত্তাটার কথাই ধরো। অহেতুক মেরে রেখে গেল ওটাকে।'

'সত্যিই গাড়ি চাপা পড়ে মরেছে কিনা তাই বা কে জানে,' রবিন বললো। 'পুলিশ নাকি জানার জন্যে পোস্ট মর্টেম করতে নিয়ে গেছে।'

'তাই?'

দীর্ঘ নীরবতা। ছেলেদের কথা শোনার অপেক্ষা করলো যেন ক্যাম্পার। শেষে বললো, 'যদি তা-ই হয়...'

বাধা দিয়ে কিশোর বললো, 'আচ্ছা, হোটেলে ঢোকেনি তো কিটু? জানালা খোলা ছিলো হয়তো, কিংবা দরজার তালা ভাঙা...'

'না,' জোর দিয়ে বললো ক্যাম্পার। 'ভালোমতো আটকে রাখি আমি, যাতে বাইরের কেউ ঢুকতে না পারে। কখন কি নষ্ট করে ফেলে, না আগুনই লাগিয়ে দেয়, ঠিক আছে কিছু?'

'কাল পুলিশ ওখানে খুঁজেছিলো?'

'নিশ্চয়ই। তালা খুলে দিয়েছিলাম। ওরাও দেখেছে, বহুদিন ওখানে কেউ ঢোকেনি।'

'ভালোমতো খুঁজেছো তো?'

রেগে গেল ক্যাম্পার। 'অনেক হয়েছে! কাজ আছে আমার। তোমাদের প্রশ্ন শেষ হয়ে থাকলে...'

বেরিয়ে এলো ছেলেরা। কিন্তু ওরা অর্ধেক সিঁড়ি নামতেই পেছন থেকে ডাকলো ক্যাম্পার। রাগ পড়ে গেছে। দরজায় দাঁড়ানো মানুষটাকে এখন কেমন বয়স্ক আর বিধ্বস্ত লাগছে।

'সরি,' বললো সে, 'মেজাজ ঠিক রাখতে পারিনি। ছোটবেলায় আমার একজন বন্ধু হারিয়ে গিয়েছিলো। লাঞ্চের পরেও ক্লাসে এলো না। ওকে খুঁজতে বেরোলাম। আমিই খুঁজে পেয়েছিলাম। তখন আইওয়াতে থাকি। ওখানেই জন্মেছি আমি। ভালোমতো চিনি শহরটা। শহরের বাইরে পুরানো একটা গর্ত ছিলো। বৃষ্টির পানিতে ভরে গিয়েছিলো সেটা। দেখলাম, তাতে ভাসছে লাশটা।'

'বেচারা!' জিভ দিয়ে চুকচুক করে দুঃখ প্রকাশ করলো কিশোর।

চত্বর ধরে এগোলো ওরা। ক্যাফের বারান্দায় দেখা গেল মিস জেলডা এমিনারকে। কফি খাচ্ছেন। ওদেরকে দেখেই বলে উঠলেন, 'এতো দেরি করলে! তোমাদের জন্যেই বসে আছি। এসো, একটা জিনিস দেখাবো।'

ছয়

হেনরি লিসটারকে ডেকে আনলেন মিস এমিনার। বললেন, 'দুপুর হয়ে আসছে।

নিশ্চয় খিদে পেয়েছে ওদের। আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাবে। চিকেন স্যাণ্ডউইচই দাও। আমাকে বাদ দিয়ে। আজকাল আর হজম করতে পারি না। বয়েস হয়ে গেছে।' আর কি খাওয়ার মজা আছে!'

'স্যাণ্ডউইচ নিয়ে আসছি,' বলে চলে গেল লিসটার।

'তোমাদের বয়েসে,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন মিস এমিনার, 'লোহা খেয়ে হজম করে ফেলেছি। টন কে টন পেনি ক্যাণ্ডি গিলেছি। লিকোরাইস হুইপ, টুটসি রোলস, কিচ্ছু বাদ দিতাম না।' চেয়ারে সোজা হয়ে বসে দুঃখটা ঝেড়ে ফেললেন যেন তিনি। 'ভালো কথা, ক্যাম্পার কি বললো?'

হঠাৎ এই প্রসঙ্গ পরিবর্তনে কিশোরও সোজা হয়ে বসলো।

'নিনাকে সাহায্য করতে এসেছো তোমরা, তাই না?' আবার বললেন মিস এমিনার। 'তোমাদেরকে যে ফোন করেছে, একথা সকালেই বলেছে আমাকে। আমারও অনুরোধ, ওর জন্যে কিছু করো। মেয়েটা খুব ভালো। এখানে ভালো লোকের বড় অভাব। বেশির ভাগই তো অসভ্য!'

পেছন ফিরে তাকালেন মিস এমিনার। ভেজা কাপড় নিয়ে এসে টেবিল মুছতে লাগলো রাগবি ডিগার। উজ্জ্বল রোদে আরো বেশি রোগা লাগছে তাকে। গালে লাল লাল দাগ, সেগুলোর মধ্যে থেকে নারকেল গাছের জটলার মতো চুল গজিয়েছে খাড়া হয়ে। কনুয়ের কাছে আঠা আঠা কি যেন লেগে রয়েছে। অ্যাপ্রনের নিচে টি-শার্টটা ময়লা।

'স্বাস্থ্য বিভাগ ওর খবর জানে কিনা ভাবি মাঝে মাঝে!' নাক কুঁচকালেন মিস এমিনার। 'সে-ও ওদের একজন!'

'কাদের একজন?' জানতে চাইলো রবিন।

'অসভ্যদের!' রবিনের দিকে ঝুঁকে খাটো গলায় বললেন মিস এমিনার। 'স্পীডওয়ের ওধারে ভাঙাচোরা বাড়ি আছে কয়েকটা, একটাতে থাকে ও। চোর-ডাকাত, ফকির-টকিরের আড্ডা ওখানে। ওদেরকে দিয়ে সবই সম্ভব। অল্পবয়েসী একটা মেয়ে থাকে...'

থেমে গেলেন মিস এমিনার। শক্ত হয়ে গেছে ঠোঁট। ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন, 'অসভ্যের একশেষ একেকটা! বাপ-মা যে কোথায় ওদের, খোদাই জানে! কোথায় জন্ম, কোথায় বড় হয়, কে জানে! তারপর আর কোনো জায়গা না পেয়ে এসে ঢোকে এই ভেনিসে!'

কাফে থেকে বেরিয়ে এলো হেনরি লিসটার। হাতে ট্রে। তাতে স্যাণ্ডউইচ, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, আর কোকা কোলা। টেবিলে সাজিয়ে দিয়ে চলে গেল। তার পেছনে গেল রাগবি ডিগার।

'ডিগারকে,' নিচু গলায় বললেন মিস এমিনার, 'দেখতে পারতো না কিটু।'

কিশোর বললো, 'অনেকেই তো কিটুকে দেখতে পারে না, তার দুষ্টুমির জন্যে।'

'না না, আমি কাউকে দোষ দিচ্ছি না,' তাড়াতাড়ি বললেন মিস এমিনার। 'চত্বরে যে কটা দোকান মালিক আছে, কিটুর নিখোঁজ হওয়ার পেছনে তাদের কারোই হাত নেই। প্যারেড শুরু হওয়ার সময় আমার ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। মিস্টার মিউরোকে দেখেছি। রক মিউজিক পছন্দ করে যে মহিলা, মিস জারগন, তাকে দেখেছি। প্যারেড দেখতে চত্বরের দিকে এগোচ্ছিল ওরা। ব্রড ক্যাম্পারকেও দেখেছি। তার অ্যাপার্টমেন্ট আর গ্যালারির মাঝখানে পায়চারি করেছে কয়েকবার। তারপর কিটু আর ডবকে দৌড়ে ঢুকতে দেখলাম।'

'ও!' হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠলো গোয়েন্দাপ্রধান। 'ওশন ফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর তাহলে দেখেছেন! গুড! কি কি দেখেছেন?'

'বেশি কিছু না। ঠিক ওই সময় আমার চুলার টাইমারটা অফ হয়ে গেল। চুলায় কেক ছিলো। তাড়াতাড়ি নামাতে গেলাম। আবার জানালার কাছে ফিরে এসে কিটু বা ডব কাউকেই দেখলাম না। অন্তত চত্বরে ছিলো না তখন, এটা ঠিক। তবে রাগবি ডিগার ছিলো।'

আবার বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে ডিগার। মিস এমিনারের শেষ কথাটা কানে গেল। তাঁর দিকে তাকিয়ে কুঁচকে গেল ভুরু। কোমরে দুহাত রেখে দাঁড়ালো। 'আমি কি করেছি?' তার এক হাতে ব্যাণ্ডেজ, কব্জির ঠিক ওপরে।

সামান্যতম চমকালেন না মিস এমিনার, নরম হলেন না। জবাব দিলেন, 'গতকাল প্যারেডের সময় দেখলাম মিস্টার মিউরোর দোকান থেকে বেরোচ্ছো। আমার কাছে সেটা অদ্ভুত লেগেছে। খেলনা কিংবা ঘুড়ির ব্যাপারে কোনোদিন কোনো আগ্রহ দেখিনি তোমার। অবাক লেগেছে সে কারণেই। এরা কিটুকে খুঁজতে সাহায্য করছে,' তিন গোয়েন্দাকে দেখিয়ে বললেন তিনি। 'ভাবলাম...'

'কি ভাবলেন! কি ভাবলেন?' চেঁচিয়ে উঠলো ডিগার। 'আমি কিচ্ছু করিনি! আপানার কি মনে হয়, খেলনার লোভ দেখিয়ে ওকে ধরে নিয়ে গেছি? পাগল হয়ে গেছেন আপনি!'

বারান্দায় বেরিয়ে এলো লিসটার। শুনে ফেলেছে কথা। 'কাল তুমি ঘুড়ির দোকানে ঢুকেছিলে?'

'ঢুকেছিলাম। একটা চীনা ঘুড়ির দাম দেখতে। জানালার কাছে যেটা রেখেছিলো।'

'শুধু এ জন্যেই?'

'তাহলে আর কি জন্যে?' আবার রেগে উঠলো ডিগার।

কড়া চোখে তার হাতের ব্যাণ্ডেজের দিকে তাকিয়ে মিস এমিনার বললেন, 'হাতে কি হলো? কুকুরে কামড়ে দিয়েছে, তাই না? আজ সকালে শেলির সঙ্গে বলছিলে, আমি শুনেছি। তোমার নিজের কুকুরে কামড়েছে?'

'আপনি...আপনি...' রাগে কথা আটকে গেল ডিগারের।

'আমি কি? নাক গলাচ্ছি? বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছি? হ্যাঁ, দেখাচ্ছি। দেখাবো,' খুব

সন্তুষ্ট মনে হচ্ছে মিস এমিনারকে।

'দেখুন, বেশি বাড়াবাড়ি করবেন না। ভালো হবে না…'

'এই, চুপ করো!' ধমকে উঠলো লিসটার। 'আর একটা কথাও বলবে না!'

'আহ্, কি আরম্ভ করলে তোমরা!' শেলিও ধমক লাগালো। 'লোকে শুনলে কি বলবে!' একটানে গা থেকে অ্যাপ্রনটা খুলে টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গটমট করে চত্বরে নেমে পড়লো সে। চলে যাবে।

অ্যাপ্রনটা তুলে নিয়ে লিসটার বললো, 'মিস এমিনার, মাঝে মাঝে আপনি একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলেন। আমিও করি। খেলনার দোকানে না হয় কাল ঢুকেইছে রাগবি, তাতে কি হয়েছে? অন্যায় তো কিছু করেনি।'

'দুজনেই বাড়াবাড়ি করি, তাই না?' মুখ কালো করে বললেন মিস এমিনার। 'কোর্টের আশেপাশে যারা থাকে, সবারই জিনিসপত্র চুরি যাচ্ছে, তোমারও ক্যাশবাক্স থেকে টাকা চুরি হচ্ছে। এর পরও ডিগারকে ভালো বলবে?'

'ইয়ে…আমার…' আমতা আমতা করতে লাগলো লিসটার। মাথা ঝাঁকালো। তারপর কোনো জবাব খুঁজে না পেয়ে গিয়ে আবার ঢুকলো কাফের ভেতরে।

বিজেতার হাসি হাসলেন মিস এমিনার। 'স্বভাব কি আর সহজে বদলায় মানুষের। ডিগারই বা কি করে বদলাবে। যাকগে, কুকুরের কামড়ের কথায় আসা যাক। রাস্তার কয়েকটা নেড়ি কুত্তা গিয়ে বাস করে ওর সঙ্গে।'

'নেড়ি কুত্তা!' মহিলার কথা শেষ হওয়ার আগেই বলে উঠলো মুসা। 'তাহলে কামড়ে দিতেও পারে।'

'তা পারে। তবে সে সত্যি কথা বলছে কিনা কে জানে?'

চুপ করে মিস এমিনারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে তিন গোয়েন্দা।

'ধরা যাক, নেড়ি কুত্তায় কামড়ায়নি,' বলতে লাগলেন তিনি। 'হয়তো অন্য কোনো কুকুর, যেটার খুদে মনিবের ক্ষতি করতে যাচ্ছিলো ডিগার। ব্যস, মনিবকে বাঁচাতে কুকুরটা দিয়েছে ওকে কামড়ে। একটা কথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে, জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে ডিগারের খুব ভাব। কি করে যেন চোখের পলকে খাতির করে ফেলে। কুকুর-বেড়াল সব কিছু। আগে কখনও তাকে কোনো কিছুতে কামড়েছে বলে শুনিনি।'

'এটাই আমাদের দেখাবেন বলেছিলেন?' কিশোর জিজ্ঞেস করলো। 'ডিগারের ব্যাণ্ডেজ?'

মাথা ঝাঁকালেন মিস এমিনার।

'হুঁ,' কিশোর বললো। 'বড় বেশি কাকতালীয়!'

কফির কাপে চুমুক দিলেন মহিলা। কাপটা নামিয়ে রেখে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। 'তা ক্যাম্পারের সঙ্গে কেমন কাটলো?'

আরও কিছু বলার আছে তাঁর, বুঝতে পেরে চুপ করে রইলো কিশোর।

'নিশ্চয় নিজের সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা দিতে চেয়েছে,' মিস এমিনার

বললেন। 'তা-ই করে সব সময়। কাল টেলিভিশনের লোকের সামনে কি রকম বেহায়ার মতো গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, দেখোনি?'

'দেখেছি। হয়তো সত্যিই সাহায্য করতে চাইছে। এই ঘটনাটা ছেলেবেলার আরেকটা দুর্ঘটনার কথা নাকি মনে পড়িয়ে দিয়েছে তার। আপনি জানেন, ছেলেবেলায় তার এক বন্ধু হারিয়েছিলো? তারপর গর্তের পানিতে ভাসতে দেখা যায় ছেলেটার লাশ?'

'ওর বন্ধু?' ন্যাপকিনে ঠোঁট মুছলেন মিস এমিনার। 'আমি তো শুনেছি ওর ছোট ভাই। এখন আবার বন্ধু হয়ে গেল কিভাবে? কি জানি, ভুলও শুনে থাকতে পারি। আর কিছু জানার আছে তোমাদের?'

মাথা নাড়লো ছেলেরা। নেই। লাঞ্চ খাওয়ানোর জন্যে ধন্যবাদ জানালো। বারান্দা থেকে নেমে নিজের অ্যাপার্টমেন্টের দিকে চলে গেলেন তিনি।

মৃদু শিস দিয়ে উঠলো মুসা।'বাপরে বাপ, মহিলা বটে!'

চত্বরে ঢুকলো একজন লোক। মলিন চেহারা। পরনের পোশাকটা বেঢপ রকমের ঢলঢলে, বেমানান। একটা ঠেলাগাড়ি ঠেলতে ঠেলতে আসছে। পেছনে আসছে একজোড়া মাংরল কুকুর। কাফের বারান্দার কাছে পৌঁছে কুকুর দুটোকে বসতে বললো লোকটা। বাধ্য ছেলের মতো সিঁড়ির গোড়ায় বসে পড়লো জানোয়ার দুটো। ঠেলাটা ওখানে রেখে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো লোকটা।

কয়েক মিনিট পরে কাফে থেকে বেরোলো সে। হাতে একটা বড় ঠোঙা। তার পেছনে বেরোলো হেনরি লিসটার। ঠেলা নিয়ে লোকটা সরে যাওয়ার পর বললো, 'জঞ্জালের মধ্যে নিশ্চয় কিছু কুড়িয়ে পেয়েছে বরগু। আট ডলারের পেস্ট্রি কিনে নিয়ে গেল। কল্পনাই করা যায় না!'

মিস এমিনারের ঘরের দিকে তাকালো সে। গলা নামিয়ে বললো, 'ওই মহিলার ব্যাপারে সাবধান। যদি পছন্দ করে তোমাদের, ভালো। না করলে সর্বনাশ করে দেবে। সাংঘাতিক মহিলা!'

লিসটার কাফেতে গিয়ে ঢুকলো।

মুসা বললো বিড়বিড় করে, 'সেটা আমরাও বুঝেছি। ডিগারকে যেভাবে আক্রমণ করলো! জবাবই দিতে পারলো না বেচারা!'

'হ্যাঁ,' একমত হলো কিশোর। আনমনে চিমটি কাটলো নিচের ঠোঁটে। 'কুকুরের দেখছি ছড়াছড়ি এখানে। বরগুর সঙ্গে কুকুর। ডিগারের সঙ্গে কুকুর। জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে তার এতো ভাব, তা-ও কামড় খেলো কুকুরের? কিটুর ছিলো কুকুর। সেটা নিয়ে বেরোলো, তারপর গায়েব। কুকুরটাকে পাওয়া গেল ডাস্টবিনে...'

বাধা দিয়ে বললো মুসা, 'ডিগারের ওপর চোখ রাখা দরকার, কি বলো?'

'অন্তত ওর ব্যাপারে আরেকটু খোঁজখবর নেয়া তো অবশ্যই দরকার,' মুসার

কথার পিঠে বললো রবিন। 'স্পীডওয়ের ওধারে ডাঙা বাড়িতে থাকে।...এসো, যাই।'

সাত

বাড়িটা খুঁজে বের করতে একটুও অসুবিধে হলো না। সামনের সিঁড়ির ওপর বসে ঝিমোচ্ছে তখন ডিগার। মারমেড ইনের পেছনে এসে দাঁড়ানো ছেলেদের দেখতে পেলো না সে। চট করে একটা গাড়ির আড়ালে লুকিয়ে পড়লো ওরা।

চুপ করে দেখছে তিন গোয়েন্দা। বেশ কিছুক্ষণ কিছুই ঘটলো না। নীরব হয়ে আছে ভাঙা বাড়িটা। তারপর স্পীডওয়ে ধরে এগিয়ে এলো একজন মানুষ। সঙ্গে একটা কুকুর। ওটার গলায় বাঁধা দড়ির এক মাথা ধরে রেখেছে। ডিগারের ঘরের পেছনে বেড়ার কাছ থেকে একসঙ্গে গলা ফাটিয়ে ঘাউ ঘাউ করে উঠলো কয়েকটা কুকুর।

লাফ দিয়ে উঠলো ডিগার। চিৎকার করে বললো, 'এই চুপ চুপ! থাম!'

এক মুহূর্ত থমকালো আগন্তুক। তারপর কুকুরটাকে নিয়ে উঠে গেল ডিগারের বারান্দায়।

'কী?' ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলো ডিগার।

কুকুর নিয়ে এসেছে যে লোকটা সে মাঝবয়েসী। ভদ্র। মাথা জুড়ে টাক। চোখে ভারি পাওয়ারের চশমা। ডিগারের কর্কশ কণ্ঠ শুনে পিছিয়ে গেল এক পা। অস্বস্তি জড়ানো কণ্ঠে বললো, 'শুনলাম, কুত্তা পছন্দ করো তুমি। তাই নিয়ে এসেছি। বীচফ্রন্ট মার্কেটের সামনে রাবিশ বিনে ঢোকার চেষ্টা করছিলো। ধরে নিয়ে এসেছি। নিশ্চয় খুব খিদে পেয়েছে এটার।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কুকুরটাকে দেখলো ডিগার। 'দো-আঁশলা।'

'কয় আঁশলা জানি না। তবে তুমি...'

'আমাকে দেখে কি মনে হয়?' খেঁকিয়ে উঠলো ডিগার। 'কুত্তার দালাল? নাকি এতিম জানোয়ারের জন্যে এতিমখানা খুলেছি?'

অবাক হয়ে গেল লোকটা। 'কিন্তু...ওরা যে বললো, কু-কুকুর পছন্দ করো তুমি...'

'তাহলে ওদের কাছেই যাও!' গজগজ করতে লাগলো ডিগার। 'কুত্তা আর কুত্তা! এমন জানলে কে পালতো! যাও, যে চুলো থেকে এনেছো, সেখানেই নিয়ে ফেলে দাও। যাও!'

ধমক খেয়ে পিছিয়ে এলো লোকটা। কুকুরটাকে নিয়ে আবার নামলো পথে। টেনে নিয়ে চললো।

হঠাৎ পুরানো বাড়ির বারান্দা থেকে ডাক শোনা গেল, 'এই রাগবি, কি হয়েছে?'

'কিছু না।'

একটা মেয়ে বেরিয়ে এসেছে। বয়েস বিশ-বাইশ হবে। কালো চুল। পরনে স্কেটারদের পোশাক। স্কেটিং করতে যাচ্ছে বোধহয়। 'কিছু না মানে কি? শুনলাম তো চেঁচামেচি করছো।' এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলো কি যেন। 'নাহ্, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। কতো আর মিথ্যে বলবে?'

'এই চুপ, চুপ, আস্তে!' দ্রুত চারপাশে চোখ বোলালো ডিগার।

'ছেলেটার খোঁজ নিতে পুলিশ এসেছিলো। তোমার কুত্তাগুলোর কথা জিজ্ঞেস করলো। মিথ্যে বললাম। এখন দুর্ব্যবহার করে লোকটাকে তাড়ালে। সে কি ভাববে? রেখে দিলে কি এমন হতো?'

'কি হতো না হতো সেটা আমার ব্যাপার। তোমাকে মাতব্বরি করতে বলেছে কে?'

'দেখো, ধমক দিয়ে কথা বলবে না আমার সঙ্গে!' মেয়েটাও রেগে গেল। 'আর আমি থাকছি না এখানে। মিথ্যে কথা বলার দায়ে শেষে আমাকেও নিয়ে গিয়ে গারদে ভরবে পুলিশ।'

দুপদাপ করে গিয়ে ঘরে ঢুকলো মেয়েটা। জানালা দিয়ে শব্দ আসছে। তিন গোয়েন্দার কানে এলো, কাঠের সিঁড়িতে পা ফেলার মচমচ আওয়াজ। দুড়ুম-দাড়ুম আওয়াজ হলো এরপর। নিশ্চয় ড্রয়ার টানাটানি করছে। খানিক পরেই আবার বেরিয়ে এলো মেয়েটা। আঁটো পোশাকের ওপর ঢোলা, লম্বা হাতাওয়ালা গাউনের মতো পোশাক চাপিয়েছে।

'এই, নরিনা...' বলতে গিয়ে বাধা পেলো ডিগার।

'আমি আর এসবের মধ্যে নেই,' হাতে একটা বেতের ঝুড়ি নরিনার। সেটাতে জিনিসপত্র উপচে পড়ছে। তার মানে যথাসর্বস্ব যা ছিলো, সব নিয়ে চলে যাচ্ছে সে। সিঁড়ি বেয়ে গিয়ে রাস্তায় নামলো।

মেয়েটাকে চলে যেতে দেখলো ডিগার। পার্কিং লটের দিকে ফিরতে চোখ পড়লো ছেলেদের ওপর। 'এই, এই কি চাও তোমরা?'

আর লুকিয়ে থেকে লাভ নেই। বেরিয়ে এলো কিশোর। স্পীডওয়ে পেরিয়ে এগোলো বাড়িটার দিকে। তাকে অনুসরণ করলো রবিন আর মুসা। 'ভাবছি, আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন,' কিশোর বললো। 'আপনি হয়তো জানেন...'

'ছুঁচোগিরি করতে এসেছো! জলদি ভাগো! নইলে কুত্তা লেলিয়ে দেবো। যত্তোসব!' রাগে গরগর করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো ডিগার। কিশোরের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল মেয়েটা যেদিকে গেছে সেদিকে।

'পিছু নেবো নাকি?' নিজেকেই যেন প্রশ্নটা করলো কিশোর।

'নেয়া উচিত,' মুসা বললো। 'মেয়েটার কথা শুনলে তো? পুলিশের ভয়েই পালাচ্ছে। তারমানে কিছু একটা অন্যায় করেছে।'

'শোনো, শোনো,' ওদেরকে থামালো রবিন। 'বাড়িটায় আরও কেউ আছে।'

কান পাতলো তিনজনেই। একটা লোকের গলা শোনা গেল। কথা বললো, থামলো, তারপর আবার বলতে লাগলো।

'নিশ্চয় টেলিফোন,' রবিন বললো আবার। 'এক কাজ করো। তোমরা ডিগারের পিছু নাও। আমি থাকি। দেখি, কে বেরোয়?'

কথাটা পছন্দ হলো কিশোরের। মুসাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি রওনা হলো প্যাসিফিক অ্যাভেনিউর দিকে। দক্ষিণে অনেকখানি এগিয়ে গেছে ততোক্ষণে ডিগার। নতুন কিছু অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং আর একটা বোট ম্যারিনা আছে ওদিকে। দূর থেকে তাকে অনুসরণ করলো কিশোর আর মুসা।

মারমেড কোর্ট থেকে আধমাইল দূরে ছোট একটা মার্কেটে ঢুকলো ডিগার।

'দূর, লাভ হলো না,' মুসা বললো। 'খাবার-টাবার কিনবে বোধহয়।'

'হয়তো। দেখা যাক।'

মার্কেটের পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে রইলো ওরা। কাঁচের পাল্লার ভেতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছে ডিগারকে। গোশতের বাক্স থেকে কিছু নিয়ে সোজা স্ট্যাণ্ডের কাছে চলে গেল সে।

চট করে একটা গাড়ির আড়ালে বসে পড়লো দুজনে। বেরিয়ে এলো ডিগার। আবার দক্ষিণে এগোলো, ম্যারিনার দিকে। কিছু দূর এগিয়ে মোড় নিয়ে একটা গলিতে ঢুকলো। এগোলো একটা রেস্টুরেন্টের দিকে।

রেস্টুরেন্টটার নাম *মুনশাইন* । বেশ উঁচু দরেরই মনে হচ্ছে। পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল মার্সিডিজ, ক্যাডিলাক আর জাগুয়ার গাড়ি। ওগুলোর মাঝখান দিয়ে এগোলো ডিগার। মাঝে মাঝে থেমে লাথি মারে গাড়ির টায়ারে।

'ব্যাটা টায়ার চোর!' মন্তব্য করলো মুসা। 'ভালো চাকা খুঁজছে।'

'আমার মনে হয় না। দেখো।'

একটা হুডখোলা কনভারটিবলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ডিগার। সীটের ওপর একটা সেইন্ট বার্নার্ড কুকুর বসে আছে। গলার শেকলটা স্টিয়ারিং হুইলের সঙ্গে বাঁধা। কুকুরটার চোখে চোখে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ ডিগার। তারপর কথা বলতে আরম্ভ করলো।

উঠে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে লাগলো কুকুরটা।

হাতের ব্যাগ থেকে গোশত বের করে ওটার দিকে বাড়িয়ে ধরলো ডিগার। গোশত শুঁকলো সেইন্ট বার্নার্ড। চাটলো। তারপর খেতে শুরু করলো।

'কুত্তা চোর!' ফিসফিসিয়ে বললো মুসা।

চুপ করে রইলো কিশোর। দেখছে।

দেখতে দেখতে কুকুরটার সঙ্গে খাতির করে ফেললো ডিগার। গাড়ির দরজা খুলে শেকল খুলতে শুরু করলো।

আর চুপ করে থাকতে পারলো না মুসা। লাফিয়ে উঠে দৌড় দিলো। সিঁড়ি বেয়ে উঠে ঢুকে পড়লো রেস্টুরেন্টের ভেতর। প্রথমে আবছা অন্ধকার একটা

হলওয়ে। তারপরে উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত ডাইনিং রুম। দরজার ভেতরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললো সে, 'এই যে শুনছেন? বার্নার্ড কুকুরটা কার? চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে তো!'

ঘরের একধারে চেয়ারে বসা একজন লালমুখো মানুষ লাফ দিয়ে উঠে এলো। মুসার পাশ কাটিয়ে দমকা হাওয়ার মতো বেরিয়ে চলে গেল।

রাস্তায় নেমে পড়েছে তখন ডিগার। ব্যাগের গোশতের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে খুশিমনে তার পাশে পাশে চলেছে কুকুরটা।

পিছু নেয়ার চেষ্টাও করলো না কুকুরের মালিক। দুই আঙুল মুখে পুরে সিটি বাজালো।

থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালো বিশাল কুকুরটা।

আবার সিটি বাজালো লোকটা।

হঠাৎই ডিগারের ব্যাপারে সমস্ত আকর্ষণ হারিয়ে ফেললো যেন সেইন্ট বার্নার্ড। দৌড় দিলো মনিবের দিকে।

হাত থেকে শেকলটা খুলে ফেলার চেষ্টা করলো ডিগার। পারলো না। শক্ত করে পেঁচিয়ে নিয়েছিলো শেকলের এক মাথা, টান লেগে আরও শক্ত হয়ে এঁটে গেল। হ্যাঁচকা টানে পেছনে বাঁকা হয়ে গেল তার শরীর। চিৎকার করে সামলানোর চেষ্টা করলো কুকুরটাকে। পারলো না। রাস্তায় চিত হয়ে পড়ে গেল সে। তাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চললো সেইন্ট বার্নার্ড।

'এই থাম!' চেঁচিয়ে চলেছে ডিগার, 'এই থাম···

অবশেষে কব্জির প্যাঁচ খুলে গেল। গড়িয়ে গিয়ে একটা ল্যাম্প পোস্টে বাড়ি লেগে থেমে গেল ডিগারের দেহটা।

বড় বড় কয়েক লাফে পার্কিং লট পেরিয়ে গিয়ে মনিবের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লো কুকুরটা। তার হাত চাটতে শুরু করলো।

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালো ডিগার। সারা গায়ে ধুলো আর মাটি। কাপড় ছিঁড়েছে। কয়েক জায়গায় ছড়ে গেছে চামড়া। শাঁই করে রাস্তার মোড় ঘুরে তার পাশে এসে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষলো একটা পেট্রোল কার। লাফ দিয়ে নেমে এলো একজন পুলিশ অফিসার। 'এই, কি হয়েছে তোমার? ব্যথা পেয়েছো?'

দৌড় দিলো ডিগার। পার্কিং লট থেকে চলে গেল পানির ধারে। একটা মুহূর্ত দ্বিধা করলো না। ঝাঁপ দিয়ে পড়লো পানিতে। অফিসারকে বোকা বানিয়ে সাঁতরে চললো খোলা সাগরের দিকে।

কুকুরের মনিবের পাশ দিয়ে বারান্দা থেকে নেমে এলো মুসা। কিশোরের দিকে এগোলো। একটা মার্সিডিজের গায়ে হেলান দিয়ে হো হো করে হাসছে গোয়েন্দা-প্রধান। হাসতে হাসতে পানি বেরিয়ে গেছে চোখ দিয়ে। তার হাসিটা সংক্রমিত হলো মুসার মধ্যে। বললো, 'দারুণ একটা খেল দেখালো! একেবারে পানিতে ফেলে ছেড়েছে। কদ্দিন পর গোসল করলো কে জানে!'

হাসি কমে এলো অবশেষে কিশোরের। জোরে জোরে দম নিয়ে বললো, 'এসো, যাই। রবিন কি করছে দেখিগে।' বলেই আবার হা হা করে হেসে উঠলো।

আট

পার্কিং লটে একটা গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করছে রবিন। খোলা জানালা দিয়ে কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে, কিন্তু কথা বোঝা যাচ্ছে না। আরেকটু এগিয়ে যাবে? বাড়ির সামনের সিঁড়িতে গিয়ে বসবে? নাকি পেছনের বেড়ার ভেতরে চলে যাবে?

ঠিক এই সময় একসঙ্গে ঘেউ ঘেউ করে উঠলো কুকুরগুলো। নাহ্, ভেতরে ঢোকা অসম্ভব। কিছু একটা দেখে চিৎকার করছে ওগুলো।

সামান্য সরতেই ট্রাকটা চোখে পড়লো রবিনের। বাড়ির পাশের ড্রাইভওয়েতে পার্ক করা, বেড়ার বাইরে, একটা খোলা জায়গার ঠিক নিচে।

ট্রাকের পেছনে বস্তা আর বিছানার পুরানো গদি ফেলে রাখা হয়েছে কয়েকটা। নিশ্চয় কাঁচের জিনিসপত্র বহন করে ট্রাকটা। গদি আর বস্তার ওপর সাজিয়ে রাখা হয় যাতে না ভাঙে। নোংরা, ময়লা গদিগুলো। কিন্তু দ্বিধা করার সময় নেই। একছুটে চলে এলো ট্রাকের পেছনে। উঠে পড়লো। লুকিয়ে পড়লো একটা গদির তলায়।

'হ্যাঁ,' বাড়ির ভেতরের লোকটার কথা এখন পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে রবিন। 'লোকটা উন্মাদ। কি যে করে বসবে ঠিক নেই। সর্বনাশ হয়ে যাবে তখন। সে জন্যেই আরেকটা জায়গা খুঁজছি। এরই মধ্যে দুবার ঘুরে গেছে পুলিশ। জেনে যাবেই।'

একটু বিরতি দিয়ে অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললো লোকটা, বড় ব্যাপার নয় মানে! অনেক বড় ব্যাপার! রাবিশ বিনে ফেলে রাখা কুত্তাটার কথা শোনোনি?'

শক্ত হয়ে গেল রবিন। ডবের কথা বলছে।

'আরে ঠিকই আছি আমি, ঠিকই আছি,' বলে যাচ্ছে লোকটা। 'পাগল হইনি। যা-ই বলো, আমি থাকছি না। এখন যাচ্ছি, কিছু টাকা জোগাড় করতে পারি কিনা দেখি। দরকার আছে।'

আবার নীরবতা। তারপর লোকটা বললো, 'ঠিক আছে। যা হয় হবে। স্লেভ মার্কেট তো আছেই।'

অবাক হলো রবিন। স্লেভ মার্কেট?

রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ হলো। শুয়েই আছে রবিন। দরজা লাগানোর আওয়াজ হলো। তারপর বারান্দায় পদশব্দ।

শঙ্কিত হলো রবিন। লোকটা পেছনে আসবে না তো? না, এলো না। ট্রাকের দরজা খুলে উঠে বসলো একজন। গর্জে উঠলো ইঞ্জিন। ঝাঁকুনি দিয়ে চলতে শুরু করলো ট্রাক। ড্রাইভওয়ে থেকে রাস্তায় এসে উঠলো, বোঝা গেল।

অস্থির ভাবনা চলেছে রবিনের মাথায়। একবার ভাবলো লাফিয়ে পড়ে। পরে

ভাবলো, দেখাই যাক না কোথায় যায়? লোকটা কে? ডিগারের রুমমেট? বিপদের আশঙ্কা করছে লোকটা, টেলিফোনে তার আলাপ থেকেই বোঝা গেছে। কার কাছ থেকে বিপদ? ডিগার? কিটুর ব্যাপারে কি কিছু জানে? তার আচরণ নিঃসন্দেহে সন্দেহজনক।

নিশ্চয় এখন রহস্যময় স্লেভ মার্কেটে চলেছে লোকটা। হয়তো ওখানে কিটুর নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সূত্র পাওয়া যাবে।

ট্রাক চলেছে। মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে মুখ বের করে দেখছে রবিন। শহরের রাস্তা, দোকান-পাট চোখে পড়ছে। সব অপরিচিত।

অবশেষে থামলো ট্রাক। ইঞ্জিন বন্ধ হলো। ড্রাইভার বেরিয়ে যাওয়ার সময় মচমচ শব্দ উঠলো ট্রাকের সামনের অংশে।

লোকটা কি পেছনে আসবে? লাফিয়ে উঠে ঝাঁপ দিয়ে মাটিতে পড়ার জন্যে তৈরি হলো রবিন।

কিন্তু এবারেও পেছনে এলো না লোকটা। তার পদশব্দ সরে যেতে লাগলো। যানবাহনের আওয়াজ কানে আসছে। বেশ ভিড়। আস্তে মাথা তুলে ট্রাকের পাশ দিয়ে উঁকি দিলো রবিন। চওড়া একটা জায়গার মধ্যে দিয়ে অনবরত আসছে যাচ্ছে নানারকম গাড়ি। রাস্তার দুই ধারে সারি সারি দোকানপাট। পথের পাশে এক জায়গায় জটলা করছে কিছু লোক। প্রায় সবাই বিশাল দেহী, পরনে কাজের পোশাক। কারো কারো পায়ে ভারি বুট, কারো মাথায় শক্ত হ্যাট। কালো চামড়ার লোক আছে, বাদামী চামড়ার আছে, বিভিন্ন দেশের মানুষ ওরা।

পথের মোড়ে একটা গাড়ি এসে থামলো। দ্রুত কয়েকজন লোক গিয়ে ড্রাইভারকে ঘিরে দাঁড়ালো, কথা শুরু করে দিলো একসঙ্গে। এই সুযোগে টুক করে নেমে পড়লো রবিন। সরে গেল ট্রাকের কাছ থেকে।

শ'খানেক গজ দূরে একটা নিচু দেয়াল দেখে তার ওপর উঠে বসলো। কৌতূহলী চোখে দেখতে লাগলো লোকগুলোকে।

একটু পর পরই এসে মোড়ের কাছে গাড়ি থামছে। জটলার মধ্যে থেকে কিছু লোক যাচ্ছে বসা লোকের সঙ্গে কথা বলতে। কোনো কিছু নিয়ে মনে হয় দর কষাকষি করছে। কথায় বনলে উঠে বসছে গাড়িতে, না বনলে সরে আসছে।

একজন লোক এসে রবিনের পাশে বসলো। ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে আপনমনেই মাথা নাড়লো। তারপর তাকালো রবিনের দিকে, 'এই ছেলে, কি চাই তোমার এখানে? কাজ?'

বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইলো রবিন। 'আমি···এই হাঁটতে হাঁটতে···ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। একটু জিরিয়ে নিচ্ছি। আপনি কি কাজ খুঁজতে এসেছেন?'

মাথা ঝাঁকালো লোকটা। 'আমরা সবাই সে জন্যেই এসেছি। এটা স্লেভ মার্কেট। নাম শোনোনি?'

'না। সাংঘাতিক কাণ্ড! দাস ব্যবসা কি এখনও হয় নাকি?'

হাসলো লোকটা। 'আরে না না, ওরকম কিছু না। শ্রমিকরা আসে এখানে কাজের জন্যে। দাঁড়িয়ে থাকে। যাদের কাজ করানো দরকার, তারাও আসে, দামদর করে লোক নিয়ে যায়। হয়তো দেয়াল ধোয়ানোর দরকার পড়লো তোমার, বাগানের ঘাস সাফ করানো দরকার পড়লো, চলে আসবে স্লেভ মার্কেটে। লোক পেয়ে যাবে।'

ডেনিম শার্ট আর রঙচটা জিনস পরা মোটা একজন লোক জটলা থেকে বেরিয়ে হেঁটে গেল ট্রাকটার কাছে। সামনের দরজা খুলে এক প্যাকেট সিগারেট বের করলো ভেতর থেকে। তারপর আবার গিয়ে দাঁড়ালো জটলায়। রবিন আন্দাজ করলো, এই লোকটাই ডিগারের রুমমেট।

মোড়ের কাছে এসে থামলো একটা নীল বুইক। বেরিয়ে এলো একজন লোক। বেশ ভালো স্বাস্থ্য, ধূসর পুরু গোঁফ। পরনে হালকা রঙের স্ল্যাকস, গায়ে গাঢ় রঙের শার্ট। মাথায় নাবিকের টুপি। চোখে কালো চশমা।

'দেখলে?' রবিনকে বললো তার পাশে বসা লোকটা। 'এখানে প্রায়ই আসে ও। এমন শ্রমিক ভাড়া করে নিয়ে যায়, যার ট্রাক আছে।'

ডিগারের রুমমেটের কাছে এগিয়ে গেল টুপিওয়ালা। কথা বলতে লাগলো দুজনে। অবশেষে মাথা ঝাঁকালো রুমমেট। নিজের ট্রাকে গিয়ে উঠলো। নীল গাড়ির পেছনে পেছনে চালিয়ে চলে গেল।

'নিয়ে গেল,' বললো রবিনের সঙ্গী।

আনমনে মাথা ঝাঁকালো রবিন। খুব হতাশ হয়েছে। ভেবেছিলো এখানে এসে কোনো জরুরী সূত্র পেয়ে যাবে। ওসব কিছুই পায়নি, শুধু জানলো স্লেভ মার্কেটে শ্রম বেচাকেনা হয়। আর বসে থেকে লাভ নেই। দেয়াল থেকে নেমে রাস্তা ধরে এগোলো। সৈকত থেকে কয়েক মাইল দূরে এই জায়গা, মোড়ের একটা সাইন বোর্ড দেখে বুঝলো। জায়গাটার নাম ল্যাব্রিয়া।

নয়

'কোথায় ছিলে এতোক্ষণ?' মুসা জিজ্ঞেস করলো।

মারমেড কোর্টে উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছে সে আর কিশোর।

সব খুলে বললো রবিন।

'হুঁ,' কিশোর বললো, 'স্লেভ মার্কেটের কথা আমিও শুনেছি। আমাদের কেসের সাথে বোধহয় সম্পর্ক নেই এর। একটা ব্যাপার বোঝা গেল, ডিগারের ঘরে আরও লোক থাকে। কিটুর হারানোর পেছনে ওদের কোনো হাত না থাকলেও হয়তো ডিগারের আছে।'

'আচ্ছা,' মুসা বললো, 'ওই পুরানো বাড়িটাতে আটকে রাখেনি তো কিটুকে?'

মাথা নাড়লো রবিন। 'মনে হয় না। পুলিশকে ভীষণ ভয় পায় ডিগারের

রুমমেটরা। কিটুকে ওখানে নিয়ে গেলে বহু আগেই পালাতো ওরা। নাহ্, কিটু নেই ওখানে। তবে আমার মনে হচ্ছে কুকুরগুলো সাধারণ কুকুর নয়।'

'হতেও পারে,' কিশোর বললো। সেইন্ট বার্নার্ডটা চুরি করতে গিয়ে কি রকম হেনস্তা হয়েছে ডিগার, রবিনকে বললো সে। আবার হাসতে আরম্ভ করেছে।

হাসলো মুসাও। বললো, 'লোকটার অবস্থা যদি তখন দেখতে!'

হাসি মুছতে পারছে না কিশোরও। বললো, 'যথেষ্ট হয়েছে, চলো বাড়ি যাই। হেডকোয়ার্টারে কাজ আছে।'

বুকশপের সামনে থেকে পার্ক করা সাইকেলের তালা খুলছে ওরা, এই সময় সৈকতের দিক থেকে এলো ব্রড ক্যাম্পার। তিন গোয়েন্দাকে দেখেই ভারিক্কি করে তুললো চেহারা। জিজ্ঞেস করলো, 'খবর আছে?'

'না, এখনও কিছু পাইনি,' জবাব দিলো কিশোর।

দরজায় এসে দাঁড়ালো নিনা হারকার।

সহানুভূতি দেখিয়ে তাকে বললো ক্যাম্পার, 'এতো ভয় পেও না। ছেলেটা দুষ্টুমি বেশি করে তো, হয়তো তোমাকে ভয় দেখানোর জন্যেই এখন কোথাও গিয়ে লুকিয়েছে। নির্জন দ্বীপে বন্দি লং জন সিলভার। বইটা পড়েছো নিশ্চয়?'

'না, পড়িনি,' মাথা নাড়লো নিনা।

'তাই? তাহলে হয়তো পু সেজেছে, চলে গেছে উত্তর মেরুতে। কিংবা বাক রোজার সেজে উড়ে গেছে অন্য কোনো গ্রহে। যা উল্টোপাল্টা কল্পনা না তোমার ছেলের। অবশ্য যদি কোথাও চিত হয়ে...' চুপ হয়ে গেল ক্যাম্পার।

বুঝে ফেলেছে ছেলেরা। ও বলতে চেয়েছে 'কোথাও চিত হয়ে যদি পানিতে না ভাসে।'

রক্ত সরে গেল নিনার মুখ থেকে। তাকিয়ে রয়েছে ক্যাম্পারের দিকে।

'ওহ্হো,' তাড়াতাড়ি বললো ক্যাম্পার, 'দেখো, কি বলতে কি বলে ফেললাম। কখন যে মুখ ফসকে যায়। আসলে...আসলে...ছোটবেলায় দেখেছি তো ভুলতে পারি না। আমার ছোট ভাইটা খেলতে খেলতে গিয়ে...এরপর থেকে বাচ্চা ছেলে হারালেই আমার ওই এক ভয়। কষ্ট দিয়ে ফেলেছি তোমাকে, কিছু মনে করো না।'

চুপ করে রইলো নিনা। দুচোখ থেকে গাল বেয়ে নেমে আসছে পানি।

আর কিছু বললো না ক্যাম্পার। গ্যালারির দিকে রওনা হলো।

সেদিন বিকেলে হেডকোয়ার্টারে মিলিত হলো তিন গোয়েন্দা।

রবিন আর মুসা ঢুকে দেখলো, ট্রেলারের বুক শেলফ বই ঘাঁটছে কিশোর। ওদেরকে দেখে মুখ ফেরালো।

'রেফারেন্স বই খুঁজছি পুরানো সিনেমার ওপর।'

কিশোরের সিনেমা-প্রীতির কথা জানা আছে অন্যদের। চুপ করে রইলো।

'গত বসন্তে হলিউডের সানডাউন থিয়েটারে পুরানো কিছু ব্যারি ব্রীম ছবি

দেখিয়েছিলো,' কিশোর বললো। 'ব্রীমের কথা মনে আছে? হেনরী হকিনস সিরিজে গোয়েন্দার অভিনয় করেছিলো।'

মুখ বাঁকালো মুসা। 'কি যে বলো। তখন তো জন্মই হয়নি আমাদের, দেখবো কি করে?'

'জন্মের আগের ছবি জন্মের পরে দেখতে অসুবিধে হয় না। যাকগে, ব্রীমের কিছু ছবিকে এখন ক্লাসিক হিসেবে ধরা হয়। চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হয় ওই ছবি। একটা ছবির কাহিনী ছিলো একটা ছেলেকে নিয়ে, যে দশ লাখ ডলারের মালিক হয়েছিলো উত্তরাধিকার সূত্রে। তার পর পরই একটা ডোবায় তার লাশ ভাসতে দেখা যায়। এরপর একের পর এক খুন হতে থাকে মানুষ। উত্তরাধিকার সূত্রে ওই টাকা যার হাতেই যায় সে-ই খুন হয়ে যায়।'

'ডোবায় ভাসছিলো?' ভুরু কোঁচকালো মুসা।

'ব্রড ক্যাম্পারের ভাইয়ের মতো!' বললো রবিন।

'কিংবা তার বন্ধুর মতো,' কিশোর বললো। 'কোনটা সত্যি সে-ই জানে। বই ঘাঁটছি সে জন্যেই। ব্রীমের ছবির কোনো স্টিল মেলে কিনা দেখছি।'

শেলফ থেকে পুরানো একটা বই নামিয়ে আনলো কিশোর। ডেস্কের ওপর রেখে পাতা ওল্টাতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর থেমে গিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, 'এই তো, পেয়েছি!'

ছবিটার নাম *স্ক্রীম ইন দা ডার্ক।* একটা রহস্য কাহিনী নিয়ে করা। বইয়ের ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ডোবায় ভাসছে একটা বাচ্চা ছেলের লাশ। পাড়ে দাঁড়িয়ে গলা বাড়িয়ে সেটা দেখছে একজন আর্দালী।

দেখার জন্যে কিশোরের কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে এলো মুসা আর রবিন।

আরেকটা ছবিতে দেখা গেল, ডোবার পাড়ে এসে ভিড় করেছে অনেক লোক। পানির একেবারে ধারে বসে লাশটাকে ধরার জন্যে হাত বাড়িয়েছে আর্দালী। ধরতে তাকে বাধা দিচ্ছে ডিটেকটিভ হেনরী হকিনস, অর্থাৎ ব্যারি ব্রীম। তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে দুজন পুলিশ। একজনের বয়েস খুবই কম—কিশোরই বলা চলে। মাথার টুপিটা খুলে হাতে নিয়েছে সে। বেশ সুন্দর চেহারা।

'খাইছে! এ তো ব্রড ক্যাম্পার!'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'আমার মনে হচ্ছিলো, এই ছবিতেই ক্যাম্পারকে দেখেছি। তাই বই বের করলাম, শিওর হওয়ার জন্যে।'

'লোকটা মিথ্যুক!' বিরক্তিতে কুঁচকে গেল রবিনের নাক। 'না ছিলো ছোট ভাই তার, না ছিলো বন্ধু। গল্পটা বলেছে ও, কারণ…কারণ…' বলতে না পেরে থেমে গেল সে।

'রহস্যটা এখানেই,' আনমনে বললো কিশোর। 'এরকম গল্প কেন বলতে গেল ক্যাম্পার? তার নিজের জীবনে সত্যি সত্যি ঘটেনি তো ও রকম কিছু?'

'আল্লাহ্ই জানে,' হাত ওল্টালো মুসা। 'কিন্তু বেশি কাকতালীয় হয়ে যাবে

না?'

'তা হবে। যদি মিথ্যেই বলে, তাহলে পুরানো একটা ছবির গল্প চুরি করে বলতে যাবে কেন?'

'রহস্যই!' মাথা দোলালো রবিন। 'একটা কারণ হতে পারে। ছবির ওই দৃশ্যটা বোধহয় তার খুব মনে ধরেছিলো। কিটুর ওপর সেটা চালিয়ে দিয়ে এক ধরনের আনন্দ পাচ্ছে। ওরকম স্বভাবের লোক আছে।'

কিছু বলতে যাচ্ছিলো কিশোর, এই সময় টেলিফোন বাজলো। রিসিভার তুলে নিলো কিশোর, 'বলুন?'

'কিশোর পাশা?'

'মিস এমিনার!' প্রায় চিৎকার করে বললো কিশোর। অবাক হয়েছে। তাড়াতাড়ি ফোনের লাইনের সঙ্গে লাগানো স্পীকারের সুইচ অন করে দিলো যাতে রবিন আর মুসাও শুনতে পারে।

'নিনার কাছে তোমাদের ফোন নম্বর পেয়েছি। ইন্টারেসটিং নিউজ আছে। পুলিশকে বলতে পারতাম, কিন্তু ওরা গুরুত্ব দেবে বলে মনে হয় না। তাই তোমাদেরকেই ধরলাম।'

'কি হয়েছে?'

'ওশন ফ্রন্টে হাঁটতে গিয়েছিলাম। ব্রড ক্যাম্পারকে দেখলাম গ্যালারি থেকে বেরিয়ে আসছে, হাতে একটা কাগজের লম্বা প্যাকেট।'

'বলুন বলুন!'

'তার আচরণ ভালো লাগেনি আমার। উসখুস করছিলো, আর এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলো। দেখেও না দেখার ভান করলাম। মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে রইলাম সাগরের দিকে।'

'তারপর?'

'ভেনিস পিয়ারের দিকে চলে গেল সে। পিছু নিলাম।'

'তারপর?'

'কিছুদূর এগিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল সে। এমন ভান করলো, যেন সূর্যাস্ত দেখছে। তারপর আরেকটু এগিয়ে পিয়ারের আড়ালে চলে গেল। আবার যখন বেরিয়ে এলো, দেখি হাতের প্যাকেটটা নেই।'

'কি ধরনের প্যাকেট? কতো ভারি হবে? কি রকম...'

'কিটুর লাশ ছিলো ভাবছো তো? না, তা নয়। বেশি বড় না, ভেতরে অন্য কিছু ছিলো।'

'কি ছিলো?'

'সেটা জানতে হবে তোমাদের।'

'নিনাকে কিছু বলেছেন?'

'মাথা খারাপ! বয়েস হয়েছে বটে, কিন্তু চিন্তা-ভাবনা এখনও ভালোই করতে

পারি।'

'আপনি কিছু আন্দাজ করতে পারেন, কি ছিলো ভেতরে?'

'নাহ্!... ঠিক আছে, রাখলাম।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, মিস এমিনার।'

লাইন কেটে গেল।

'যাক,' খুশি হয়ে বললো মুসা, 'স্কুবা ডাইভিঙের একটা সুযোগ বোধহয় মিললো। বস্তাটা নিশ্চয় পানিতে ফেলেছে ব্যাটা।'

দশ

পরদিন সকালে সৈকতে পৌঁছলো তিন গোয়েন্দা। রোলস রয়েসে করে ওদেরকে নিয়ে এসেছে হ্যানসন। ধূসর, কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল। লোকজন বেশি নেই ওশন ফ্রন্টে।

'পরে ভিড় হবে,' হ্যানসনকে বললো কিশোর। 'এখন অল্প আছে। সুবিধেই হয়েছে আমাদের।'

পিয়ারের পার্কিং লটে গাড়ি ঢোকালো হ্যানসন। পেছনের সীটে হেলান দিয়ে আছে মুসা। গাড়ি থামতেই ডুবুরির পোশাক পরতে আরম্ভ করলো। বেরোলো গাড়ি থেকে। তার পিঠে এয়ার ট্যাংক বাঁধতে সাহায্য করলো রবিন আর কিশোর। পরে মুখে মাউথপীস লাগিয়ে পানিতে নেমে গেল মুসা।

ও কয়েক ফুট যেতে না যেতেই কনুই দিয়ে কিশোরের গায়ে গুঁতো দিলো রবিন। হাত তুলে দেখালো।

ওশন ফ্রন্টে এসে হাজির হয়েছে ডিগারের রুমমেট। সৈকতের পিজ্জা স্ট্যাণ্ডের কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে। পিজ্জা আর সফট ড্রিংক দিয়ে নাস্তা করছে।

'আশ্চর্য!' অবাক হয়ে বললো হ্যানসন। 'এই সময়ে পিজ্জা!'

আরেক দিক থেকে ঠেলা ঠেলতে ঠেলতে এসে উদয় হলো বরও। পেছনে আসছে নিতান্ত বাধ্য ছেলের মতো কুকুর দুটো। পিজ্জা স্ট্যাণ্ডের কাছে এসে কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়ানো সেলসম্যানকে ইশারা করলো সে।

পিজ্জা শেষ করে কাউন্টারের কাছ থেকে সরে এলো রুমমেট। স্পীডওয়ের দিকে চললো।

'এই, মুসার ওপর চোখ রাখার দরকার নেই,' রবিন বললো। 'আমি যাচ্ছি ওর পিছে। দেখি কোথায় যায়?'

সাগরের দিকে তাকালো আবার কিশোর। ডুব দিচ্ছে মুসা। মুহূর্তে তলিয়ে গেল মাথাটা।

'ঠিক আছে,' রবিনকে বললো গোয়েন্দাপ্রধান, 'যাও। হুঁশিয়ার থাকবে। ওরা কতোটা খারাপ লোক জানি না এখনও। সাবধান!'

'থাকবো।' এগিয়ে গেল রবিন। পিজা স্ট্যাণ্ডের পাশ কাটাচ্ছে সে, এই সময় বেরিয়ে এলো বরগু। হাতে একটা কাগজের ঠোঙা। ঠেলা গাড়িতে ঠোঙাটা রেখে গাড়ি ঠেলে নিয়ে এগোলো আবার যেদিক থেকে এসেছিলো সেদিকে।

'রবিনের সাহায্য লাগবে?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করলো হ্যানসন। 'যাবো নাকি ওর পেছনে?'

হাসলো কিশোর। গোয়েন্দাগিরি করে হ্যানসনও আনন্দ পায়, সে-জন্যেই যেতে চাইছে। বললো, 'লাগবে না।'

হতাশ মনে হলো শোফারকে। মারমেড কোর্টের ওধারে হারিয়ে গেল রবিন। মুসার দিকে নজর ফেরালো কিশোর আর হ্যানসন। পানির ওপরে দেখা যাচ্ছে একসারি বুদবুদ, মুসা কোন দিকে চলছে বুঝিয়ে দিচ্ছে।

ধীরে ধীরে সাঁতরে চলছে মুসা, তলদেশের সামান্য ওপর দিয়ে। পানি তেমন পরিষ্কার না। ঘোলা। ক্যাম্পারের ছুঁড়ে দেয়া প্যাকেটটা এই পানিতে খুঁজে বের করতে পারবে কিনা সন্দেহ হলো তার। তাছাড়া পরিত্যক্ত জিনিসের অভাব নেই এখানে। বোতল, ক্যানেস্তারা, আরও হাজারো রকম জিনিসে বোঝাই হয়ে আছে সাগরের তলদেশ। একটা চটের পোঁটলা দেখে সেটা ধরে টান দিলো সে। বেরিয়ে পড়লো বাতিল একটা ডুবুরির পোশাক। সেটা ছেড়ে আবার আগে বাড়লো সে।

পিয়ার বাঁয়ে রেখে এগোচ্ছে মুসা।

হঠাৎ একটা নড়াচড়া টের পেয়ে মাথা ঘোরালো। ডানে নড়ছে কিছু। তলদেশ ধরে যেন ঠেলে এগিয়ে এলো কিছুদূর ওটা, তারপর ওপরে উঠলো।

হাঙর!

বিশাল হাঙরের হাঁ করা মুখে তীক্ষ্ণ দাঁতের সারি দেখতে পেলো মুসা। অলস ভঙ্গিতে সাঁতরাচ্ছে, কোনো তাড়া নেই। থেমে গেছে মুসা। নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেলেছে। একেবারে স্থির হয়ে ভাসছে। হাঙর সম্পর্কে নানারকম তথ্য ভিড় করে আসছে মনে।

কোনো কোনো হাঙর মানুষ দেখলেই আক্রমণ করে। তবে বেশির ভাগই করে না। এটা কি করবে? অনেক সময় জোর শব্দ কিংবা চিৎকার শুনলে ঘাবড়ে গিয়ে সরে যায় হাঙর।

জোর শব্দ? এমন শব্দ বলতে একমাত্র মুসার হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি। দশ ফুট পানির তলায় কি করে জোরালো আওয়াজ করবে? চিৎকার করতে পারবে না। পানির ওপরে যেমন হাত নেড়ে দাপাদাপি করে শব্দ করা যায়, নিচে সেটাও পারা যায় না।

একটা পাথরের দিকে আস্তে হাত বাড়ালো মুসা। তুলে নিলো। আরেকটা লাগবে। দুটো ঠোকাঠুকি করলে শব্দ হবে, কিন্তু তাতে কি পালাবে হাঙর?

আওয়াজ না করলে কিছু বোঝা যাবে না। কে জানে, ওই আওয়াজে না

পালিয়ে বরং রেগে গিয়ে এসে আক্রমণ করে বসবে।

কিন্তু চেষ্টা তো করে দেখতে হবে। আবার হাত বাড়ালো মুসা। হাতে লাগলো গোল, শক্ত একটা জিনিস।

দুঃস্বপ্ন দেখছে যেন মুসা।

হঠাৎ আতঙ্কের ঠাণ্ডা শিহরণ বয়ে গেল তার শিরদাঁড়া বেয়ে।

এগিয়ে আসছে হাঙরটা।

এগারো

ডিগারের রুমমেটকে অনুসরণ করে চলছে রবিন।

পুরানো বাড়ির সিঁড়িতে লোকটা পা রাখতেই পেছনের বেড়ার ভেতর থেকে কুকুরের চিৎকার শোনা গেল। পার্কিং লটে একটা গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে কি ঘটে দেখতে লাগলো রবিন।

পেছনে দরজা খোলার শব্দ হলো। ফিরে তাকালো সে।

গ্যালারির পেছনের দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে ব্রড ক্যাম্পার। পরনে একটা হালকা নীল রঙের স্ল্যাকস। গায়ে একই রঙের শার্ট। নেমে আসছে সিঁড়ি বেয়ে।

লোকটার অলক্ষ্যে থেকে তার ওপর নজর রাখলো রবিন।

স্পীডওয়ে পেরিয়ে ওশন ফ্রন্টের দিকে চললো ক্যাম্পার।

ডিগারের বাড়িতে কিছু ঘটছে না। বোধহয় ঘটবেও না, ভেবে, ক্যাম্পারের পিছু নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলো রবিন। লোকটা বেশ কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর আড়াল থেকে বেরোলো সে। পিছু নিলো।

বেশ কিছুটা আগে রয়েছে ক্যাম্পার। উত্তরে চলেছে দ্রুত পায়ে। মারমেড কোর্টের পরে আরও পাঁচ ব্লক এগোলো, তারপর ঢুকে পড়লো একটা গলিতে।

পিছে লেগে রইলো রবিন। গলিটার নাম ইভলিন স্ট্রীট। পথের পাশে পুরানো বাড়িঘর। কোথাও কোথাও গাড়ি আছে। পুরানো মডেলের পুরানো গাড়ি। বারান্দায় খেলছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। পথে আর বাড়িঘরের ফাঁকে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে কুকুর।

পুরানো একটা অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকলো ক্যাম্পার।

রবিন ভাবছে, এখানে কেন এসেছে লোকটা? এরকম জায়গায় তার বন্ধু-বান্ধব আছে?

বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। নিচু হয়ে জুতোর ফিতে বাঁধার ভান করলো। চোখের কোণ দিয়ে দেখছে বাড়ির ভেতরে কি আছে। খোলা দরজা দিয়ে একটা ছোট চত্বর চোখে পড়লো। কোনো মানুষ দেখা গেল না।

আবার সোজা হয়ে রাস্তা পেরিয়ে এলো রবিন। লুকিয়ে থেকে চোখ রাখার জন্যে একটা সুবিধেমতো জায়গা খুঁজছে। একটা উঁচু বারান্দায় খেলছে দুটো

ছেলে। ওটার সিঁড়িতে এসে বসলো সে। যেন ওদেরই একজন।

বসে আছে তো আছেই। অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে কি যে হচ্ছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে একেবারে শূন্য, নির্জন। জানালার ভারি পর্দাগুলোর কোনোটাই সরা তো দূরের কথা, সামান্য কাঁপছেও না।

মিনিটের পর মিনিট কাটছে।

পনেরো মিনিট পর একটা গাড়ি বেরিয়ে এলো বাড়িটার পাশ থেকে। নীল বুইক। তীক্ষ্ণ হলো রবিনের দৃষ্টি। চেনা চেনা লাগছে গাড়িটা। ড্রাইভিং সীটে বসা আরোহীকেও চেনা লাগছে।

ঠিক! স্লেভ মার্কেটে দেখেছিলো আগের দিন! এই লোকটাই ডিগারের রুমমেটকে ট্রাকসহ ভাড়া করেছিলো। সেই একই টুপি মাথায়। চোখে কালো চশমা। পুরু গোঁফ।

রাস্তায় উঠে পুব দিকে মোড় নিলো গাড়িটা। গতি বাড়িয়ে চলে গেল।

নোটবুক বের করে নম্বর প্লেটের নম্বর আর বাড়িটার নম্বর লিখে ফেললো রবিন। নোটবুক বন্ধ করে ভাবতে লাগলো—বুইকের ওই আরোহীর সঙ্গেই দেখা করতে এসেছে নাকি ক্যাম্পার? লোকটার সঙ্গে ডিগারের কোনো রকম যোগাযোগ আছে? নাকি যোগাযোগটা ডিগারের রুমমেটের সঙ্গে? স্লেভ মার্কেটে রুমমেটকে ভাড়া করার ব্যাপারটা কি শুধুই কাকতালীয় ঘটনা?

এভাবে এখানে বসে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না। ক্যাম্পার বেরিয়ে তাকে দেখলেই বুঝে যাবে, নজর রাখছে রবিন।

উঠে অন্য কোথাও সরে যাওয়ার জন্যে জায়গা খুঁজলো সে। পেলো না। পায়ে পায়ে আবার এগিয়ে গেল অ্যাপার্টমেন্ট হাউসটার কাছে। কেমন যেন রহস্যময় লাগছে। কোনো নড়া নেই চড়া নেই শব্দ নেই। যেন ভূতের বাড়ি, মানুষ বাস করে না এখানে।

কয়েকবার দ্বিধা করে শেষে বাড়িটার আরও কাছে চলে এলো রবিন। দরজার বেল বাজালো। কেউ এলো না।

আরকটা দরজার আরেকটা বেল বাজালো। জবাব নেই। তৃতীয় আরেকটা বাজিয়েও সাড়া পাওয়া গেল না।

একটা জানালার কাছে এসে নাক চেপে ধরলো কাঁচের গায়ে। কাঠের মেঝে চোখে পড়লো। নির্জন। ধুলোয় ঢাকা। কয়েকটা খালি বাক্স পড়ে রয়েছে। বাড়িতে কেউ আছে বলে মনে হয় না। আলো জ্বলছে না। নিশ্চয় বিদ্যুৎ নেই। আর সে কারণেই হয়তো বেলের সুইচ টিপেও লাভ হয়নি, ঘন্টা বাজেনি।

কিন্তু ক্যাম্পার গেল কোথায়?

সদর দরজা দিয়েই তো ঢুকেছিল...

হঠাৎ দম বন্ধ করে ফেললো রবিন। বুঝে ফেলেছে! সদর দরজা দিয়ে ঢুকেছে বটে, কিন্তু বাড়ির ভেতরে নেই ক্যাম্পার, বেরিয়ে গেছে পেছনের কোন দরজা

দিয়ে। তারপর গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেছে। নীল বুইক! আলগা গোঁফ লাগিয়ে নিয়েছে। মাথায় নাবিকের টুপি। চোখে কালো চশমা।

পেছনে ভারি বুটের শব্দ হলো। ঝট করে ফিরে তাকালো সে। চমকে গেল।

বিশালদেহী একজন মানুষ। মাঝবয়েসী। টাকা মাথা। খপ করে রবিনের হাত চেপে ধরে বললো, 'এই ছেলে, এখানে কি?'

শুকনো গলায় জানালো রবিন, 'ইস্কুলের ম্যাগাজিনের জন্যে রিসার্চ করছি, তথ্য সংগ্রহ করছি।' নিজের কানেই বেখাপ্পা শোনালো কথাটা।

লোকটাও বিশ্বাস করলো না। ধমক দিয়ে বললো, 'মিছে কথা বলার আর জায়গা পাওনি! ওই সিঁড়িতে বসে বসে চোখ রাখছিলে, দেখেছি আমি। তারপর উঠে এসেছো চুপি চুপি। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়েছো। নিশ্চয় চুরির মতলব?'

'না না, আপনি ভুল করছেন!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। 'আমি চোর নই! লোকের সঙ্গে কথা বলতেই এসেছি।...বেলপুশ টিপলাম। কেউ এলো না।'

হাতের চাপ সামান্য ঢিল হলো।

এই সুযোগে এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড় দিলো রবিন।

'এই থামো! থামো বলছি!' চিৎকার শুরু করলো লোকটা। 'নইলে ভালো হবে না...'

রবিন কি আর দাঁড়ায়? ঝেড়ে দৌড়াতে লাগলো।

বারো

মুসার মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে হাঙর।

হুমকির ভঙ্গিতে নামলো একবার। সঙ্গে করে ছুরি আনা উচিত ছিলো, আফসোস করলো মুসা। যখন ভাবলো, এইবার হামলা চালাবে, ঠিক তখনই হঠাৎ নাক উঁচু করে উঠে গেল ওটা। কয়েক ফুট উঠে দ্রুতগতিতে চলে গেল গভীর পানির দিকে।

যাক, বাঁচা গেল। আবার দম নিতে আরম্ভ করলো মুসা।

শক্ত কি যেন ধরে রয়েছে, মনে পড়লো এখন। পাথর নয় জিনিসটা। শক্ত, গোল, পিচ্ছিল কি যেন। ঘোলাটে পানিতেও চিনতে অসুবিধে হলো না তার। একটা জলকন্যার মাথা। চীনামাটির তৈরি। নিশ্চয় ব্রড ক্যাম্পারের হারানো জলকন্যা! টুকরো টুকরো হয়ে সাগরের তলায় ছড়িয়ে রয়েছে মূর্তিটার অন্যান্য অংশ। এখনো কোনো কোনোটাতে জড়িয়ে রয়েছে ছেঁড়া বাদামী কাগজ।

এই তাহলে ব্যাপার! মূর্তিটাকেই এনে পানিতে ফেলে গেছে ক্যাম্পার! কিন্তু কেন?

কয়েকটা টুকরো তুলে নিয়ে যাবে কিনা ভাবছে সে, এই সময় চোখের কোণে আবার দেখলো নড়াচড়া। কি ওটা, ভালো করে দেখার জন্যে থামলো না।

প্রয়োজনও মনে করলো না। তার দৃঢ় বিশ্বাস, হাঙরটাই ফিরে এসেছে।

তীরের দিকে পাগলের মতো সাঁতরে চললো সে। অল্প পানিতে পৌঁছে উঠে দাঁড়ালো। দৌড়ানোর চেষ্টা করলো। ঝুপঝুপ, থপথপ, নানা রকম শব্দ করতে করতে কোনোমতে এসে উঠলো কিনারে। ধপ করে বসে পড়লো বালিতে। তারপর একেবারে চিৎপাত।

'কি হয়েছে?' কানের কাছে বেজে উঠলো হ্যানসনের কণ্ঠ।

'হাঙর!' মাস্ক খুলে ফেলেছে মুসা, হাঁপাতে হাঁপাতে জবাব দিলো।

শিস দিতে দিতে খোশমেজাজে এগিয়ে এলো একজন লাইফগার্ড। চিত হয়ে থাকা মুসার ওপর কিশোর আর হ্যানসনকে উপুড় হয়ে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করলো, 'কি ব্যাপার?'

উঠে বসলো মুসা। 'হাঙর!'

'তাই নাকি? ঠিক আছে, রিপোর্ট করবো। খবরদার, আর নামবে না।'

'পাগল! আরও নামি!'

মুসাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলো কিশোর। এখনও জলকন্যার মাথা ধরে রেখেছে গোয়েন্দা সহকারী। সেটা কিশোরের হাতে দিয়ে গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ালো পোশাক বদলানোর জন্যে। কাপড় বদলে ফিরে এসে দেখলো পিয়ারের একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে রয়েছে কিশোর। মূর্তির মাথাটা দেখছে। 'এটাই তাহলে পানিতে ফেলেছিলো ক্যাম্পার?'

'তাই তো মনে হয়,' মুসা বললো। 'বাকি টুকরোগুলোও আছে।'

'কেন করলো একাজ?'

'আল্লাহ্ই জানে!' হাত ওল্টালো মুসা। 'মিছে কথা বলার ওস্তাদ লোকটা। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না, ফেললোই যখন, পানিতে কেন? রাবিশ বিন কি করেছিলো?'

'নিশ্চয় তার ভয়, কেউ দেখে ফেলবে।'

'কি হতো দেখলে? কার এতো ঠেকা পড়েছে একটা ভাঙা মূর্তি নিয়ে মাথা ঘামানোর?'

পাশে দাঁড়িয়ে কথা শুনছিলো হ্যানসন। কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে বললো, 'মিস্টার ক্যাম্পারকে কয়েকবার এখানে ওখানে নিয়ে গেছি গাড়ি চালিয়ে। হলিউডের অনেক পার্টিটার্টিতে যায়। অদ্ভুত আচরণ করে তখন। সিনেমার ডায়লগ নকল করে কথা বলে। বিখ্যাত অভিনেতাদের ভাবভঙ্গি নকল করে। আস্ত একটা ভাঁড়। পানিতে মূর্তি ছুঁড়ে ফেলাটাও তেমন একটা অভিনয়ের নকল কিনা কে জানে।'

'লোকটার স্বভাব-চরিত্র আসলেই যেন কেমন!' মুসা বললো। 'কেমন মেকি মেকি!'

'ঠিক বলেছেন!'

'কিশোর,' বলতে গিয়ে থেমে গেল মুসা। ওশন ফ্রন্টের দিকে তাকিয়ে আছে

কিশোর। মুসাও তাকালো। দেখলো, ছুটে আসছে রবিন।

কাছে এসে ধপ করে কিশোরের পাশে বসে পড়লো সে। যা জেনে এসেছে, বলার জন্যে আর তর সইছে না। বললো, 'ডিগার, তার রুমমেট আর ক্যাম্পারের মধ্যে একটা যোগাযোগ রয়েছে।'

ইভলিন স্ট্রীটে কি ঘটেছে, খুলে বললো সব রবিন। সব শেষে আবার বললো, 'আমি শিওর, ও ব্রড ক্যাম্পারই।'

'খাইছে!' মুসা বললো, 'ছদ্মবেশ নিয়েছে ব্যাটা!'

স্তব্ধ হয়ে গেছে কিশোর। আরও কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বললো, 'তুমি বলছো নির্জন বাড়িতে ঢুকে ছদ্মবেশ নিয়ে নীল বুইক চালিয়ে চলে গেছে? গোপন কোনো উদ্দেশ্যে? কাল একই রূপ ধরে গিয়েছিলো স্লেভ মার্কেটে?'

'আমি শিওর।'

'হুঁম্‌ম্! ওই বুইকটার মালিককে বের করা দরকার।'

'নম্বর নিয়েছি আমি,' নোটবুক বের করলো রবিন।

সেটা নিতে নিতে কিশোর বললো, 'নির্জন বাড়ি, না?'

'হ্যাঁ।'

'ক্যাপ্টেন ফ্লেচারকে বলতে হবে। গাড়িটা কার বের করে দেবেন।'

'ফোন করবে?'

'না। নিজে যাবো।'

লাঞ্চ সেরে কিশোর আর হ্যানসন রওনা হয়ে গেল। রবিন আবার ফিরে গেল মারমেড কোর্টে। গ্যালারিতে ক্যাম্পার ফিরেছে কিনা দেখতে। মুসা গেল ডিগারের ওপর চোখ রাখতে। তার বাড়ির কাছে গিয়ে পথের পাশের একটা ঝোপে লুকিয়ে বসে রইলো।

কোস্ট হাইওয়ে ধরে উত্তরে চলেছে রোলস রয়েস। আধ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে গেল রকি বীচ পুলিশ স্টেশনে। জরুরী কাজে ব্যস্ত ইয়ান ফ্লেচার। কিশোরকে দেখে মুখ তুললেন। 'আরে কিশোর? কি ব্যাপার?'

'একটা বুইক সেডানের মালিক কে জানতে চাই। নম্বর নিয়ে এসেছি। ভেনিস বীচের একটা গ্যারেজে রাখা হয় ওটা।'

'ভেনিস বীচ?' চোখ সরু হয়ে এলো ফ্লেচারের। 'ওই বাচ্চা ছেলেটা…কি যেন নাম…হারিয়ে গেছে। তার কেসে জড়াওনি তো?'

'হ্যাঁ, স্যার, ওই কেসই। ছেলেটার নাম কিটু। তার মায়ের অনুরোধেই তদন্ত করছি।'

'কেন, লস অ্যাঞ্জেলেসের পুলিশকে বিশ্বাস করতে পারছে না তার মা?'

'না স্যার, তা নয়। নিনা হারকার মনে করছে, আমরা অন্য ভাবে সাহায্য করতে পারবো…'

বাধা দিয়ে বললেন চীফ, 'দেখো, কিশোর, খুব সাবধান। একটা ছেলের

জীবনের ঝুঁকি রয়েছে, ভুল যাতে না হয়। তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

'জানি, স্যার। নিজে নিজে কিছুই করতে যাবো না। তেমন বুঝলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেবো, কথা দিচ্ছি।'

কিশোরের কাছ থেকে গাড়ির নম্বরটা নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে গেলেন চীফ। কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এলেন। হাতে এক টুকরো কাগজ। 'ব্রড ক্যাম্পার নামে এক লোকের নামে গাড়ির রেজিস্ট্রেশন। ঠিকানা, ফোর এইটি এইট, ওশন ফ্রন্ট, ভেনিস।'

'হুঁমম!' মাথা দোলালো কিশোর।

'এরকমই কিছু আশা করেছিলে, তাই না?'

আবার মাথা ঝাঁকালো কিশোর।

'বেশ, এবার ক্যাম্পারের সম্পর্কে সব বলো তো।'

'এখনও সময় হয়নি, স্যার।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের চোখে চোখে তাকিয়ে রইলেন চীফ। হাসলেন। 'ঠিক আছে, চাপাচাপি করবো না। তবে মনে রেখো, কোনো রকম ঝুঁকি নেবে না। কিছু দেখলেই পুলিশকে খবর দেবে।'

'দেবো, স্যার।'

আবার ভেনিসে ফিরে এলো ওরা। মারমেড কোর্টের পেছনে কিশোরকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল হ্যানসন। বলে গেল ঘন্টাখানেক পর ফিরবে। কাফের বারান্দায় বসে থাকতে দেখা গেল রবিনকে। হাতে একটা খালি গেলাস। কোকা কোলা খেয়েছে।

'আধ ঘন্টা আগে গ্যালারি খুলেছে ক্যাম্পার,' জানালো সে।

'ইভলিন স্ট্রীটে ওর গাড়িটাই দেখেছিলে,' বললো কিশোর।

'আমারও তাই মনে হয়েছিলো। নিনা হারকারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বললো, একটা জাগুয়ার চালায় ক্যাম্পার। তার বাড়ির পেছনের গ্যারেজে রাখে গাড়িটা। আরেকটা গাড়ি আর ছদ্মবেশ নেয়ার তার দরকার হলো কেন?'

জবাব দিতে পারলো না কিশোর। বসে পড়লো বারান্দায়।

একটু পর ফিরে এলো মুসা। বললো, 'ডিগারের পিছু নিয়েছিলাম। কুকুরের রহস্য জেনেছি। মুক্তিপণ দাবি করে না সে, পুরস্কার আদায় করে। দেখলাম, একটা সান্তা মনিকার কপি কিনলো। শুধু বিজ্ঞাপনগুলো দেখে ফেলে দিলো কাগজটা। সুযোগ করে ওটাও দেখলাম। একটা বিজ্ঞাপনের ওপর পেন্সিল দিয়ে দাগ দেয়া। সাদা-কালো একটা স্প্যানিয়েল কুকুরের জন্যে একশো ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। কিছুদিন আগে হারিয়ে গেছে কুকুরটা। কাগজটা ফেলে দিয়ে বাড়ির পেছন থেকে একটা সাদা-কালো স্প্যানিয়েল বের করে আনলো ডিগার, নিয়ে গেল ওশন পার্কের একটা বাড়িতে। বেল টিপতে দরজা খুলে দিলো এক মহিলা। তাকে দেখে দৌড়ে গিয়ে গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো কুকুরটা, চেটেচুটে অস্থির করে দিলো।

ডিগারকে কিছু টাকা এনে দিলো মহিলা। প্রায় নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরলো ডিগার।'

থেমে দম নিলো মুসা। তারপর বললো, 'কিন্তু এর সঙ্গে কিটুর নিখোঁজের সম্পর্ক কি বুঝতে পারছি না। ডবকে নিশ্চয় আটকাতে চায়নি ডিগার, ওই কুত্তা আটকে কোনো লাভ হতো না।'

জবাব দিলো না কিশোর। ঘন ঘন চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে। হঠাৎ মুখ তুললো। 'হতে পারে, অন্য দিকে সরে যাচ্ছি আমরা। হয়তো কিটুর হারানোর সঙ্গে ক্যাম্পারের কোনো হাতও নেই। ডিগার হয়তো এতে জড়িত নয়। ছেলেটা ভীষণ দুষ্টু, হয়তো নিজে নিজেই গিয়ে কোথাও আটকা পড়েছে।'

সরাইখানাটা দেখিয়ে বললো সে, 'কোনো ফাঁকফোকর দিয়ে মাটির তলার ঘরে ঢুকে যেতে পারে। খোলা জানালা দিয়ে গিয়ে সেলারে ঢুকে বসে থাকতে পারে। পুলিশ অবশ্য খোঁজ করেছে, কিন্তু ওরা কি সমস্ত জায়গা তন্ন তন্ন করে খুঁজতে পেরেছে? হোটেলটা ছাড়াও এখানে অসংখ্য জায়গা আছে, যেখানে একটা বাচ্চা ছেলে আটকা পড়তে পারে।'

সোজা হয়ে বসলো রবিন। 'কি করতে বলো?'

'গ্যালারিতে রয়েছে এখন ক্যাম্পার। মারমেড ইনে খুঁজতে ঢুকবো আমরা। দেখি ক্যাম্পার কি বলে।'

তেরো

পুরানো সরাইখানাটা খুলতে প্রথমে রাজি হতে চাইলো না ক্যাম্পার। 'অনেক বছর ধরে তালা দেয়া রয়েছে। জানালা আটকানো। ছেলেটার ঢোকার পথ নেই।'

'কিটুর বয়সে,' একটা গল্প শোনালো মুসা, 'একটা নির্জন বাড়িতে ঢুকে পড়েছিলাম আমি। জানালা দরজা বন্ধ ছিলো, কিন্তু আমার ঢোকা তো বন্ধ করতে পারেনি। চিলে কোঠার জানালাটা ছিলো খোলা। গাছ বেয়ে উঠে ওই পথে ঢুকে পড়লাম। ঢুকেছি তো সহজেই, কিন্তু বেরোতে গিয়ে জান বেরিয়ে গেছে। অনেক কষ্টে তবে বেরিয়েছি।'

মারমেড ইনের দিকে তাকিয়ে রইলো ক্যাম্পার। একতলা আর দোতলার জানালা বন্ধ, কিন্তু তিনতলার কিছু কিছু খোলা। 'অসম্ভব! ওপথে ঢুকতে পারবে না কিটু। ঢুকতে হলে এই গ্যালারি কিংবা মিস্টার ডেজারের ছাতের ওপর দিয়ে গিয়ে উঠতে হবে।'

'আমরা বলছি না যে কিটুও ওরকম করেছে,' শান্তকণ্ঠে বললো কিশোর। 'বলছি, বাচ্চারা এমন অনেক কাজ করে বসে, বয়স্করা যা কল্পনাও করতে পারে না। খুঁজলে কি কোনো অসুবিধা হবে? হয়তো আটকা পড়ে আছে কোথাও, বেরোতে

পারেছে না। হয়তো জখম হয়েছে, কিংবা বেহুঁশ হয়ে আছে।'

আর কিছু বলার থাকলো না ক্যাম্পারের। একগোছা চাবি বের করে CLOSED লেখা একটা দরজার দিকে এগোলো। 'সরাইতে কিটু আটকা পড়লে ডব বেরোলো কিভাবে?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না।'

'দেখতে চাইছো, দেখাচ্ছি। তবে অযথা সময় নষ্ট করছো।'

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো ওরা, মারমেড ইনের মস্ত দরজার কাছে। দরজার তালা খুলে ঠেলে পাল্লা খুললো ক্যাম্পার। ছোট একটা হলওয়ে দেখা গেল, আবছা অন্ধকার আর প্রচুর ধুলো। হলওয়ে পেরিয়ে লবি, সেখানে বেশ কিছু সোফা আর চেয়ার অগোছালো হয়ে পড়ে আছে। পুরু হয়ে ধুলো জমে থাকা জানালার কাঁচের ভেতর দিয়ে আলো ঠিকমতো আসতে পারছে না। পচে টুকরো টুকরো হয়ে আছে কার্পেট। ফুলের টবে মরা গাছের শুকনো ডাঁটি খাড়া হয়ে রয়েছে এখনো। মেঝের ধুলোয় জুতোর ছাপ, পুলিশ এসে খোঁজাখুঁজি করে গেছে সেই চিহ্ন।

লবি বেরিয়ে ডাইনিং রুমে ঢুকলো ওরা। টেবিলের ওপরে স্তূপ করে রাখা হয়েছে চেয়ার। ডাইনিং রুমের পরে অনেক গলিপথ, অফিস রান্নাঘর, স্টোররুম। সব জায়গায়ই খোঁজা হলো, কিন্তু কিটুকে পাওয়া গেল না।

রান্নাঘরে মাকড়সার রাজত্ব, জালের অভাব নেই। তাক আর আলমারি-গুলোতে বাসা বেঁধেছে নেংটি ইঁদুর। এখানে সেখানে উঁকি দিয়ে দেখছে গোয়েন্দারা, হঠাৎ পায়ের নিচে কোনোখান থেকে একটা অদ্ভুত গোঙানি কানে এলো।

ঝট করে সেদিকে তাকালো কিশোর ও মুসা।

'কে! কে!' বলে চিৎকার করে উঠলো মুসা।

এমনকি ক্যাম্পারের মুখও ফ্যাকাসে হয়ে গেল। রান্নাঘরের একধারের একটা দরজা খুললো গিয়ে। তার কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিলো কিশোর। অন্ধকার একটা সিঁড়ি চোখে পড়ছে। কেমন যেন ভেজা ভেজা আর টক গন্ধ বাতাসে।

'সেলার,' ক্যাম্পার বললো। 'ওটা আগেও ব্যবহার হতো না খুব একটা। আর এখন তো প্রশ্নই ওঠে না। জোয়ার বেশি হলে পানি ঢুকে যায় ওখানে।'

ডাইনিংরুম থেকে গিয়ে খুঁজে পেতে মোমবাতি বের করে আনলো রবিন। আস্ত নয়, মোমের একটা গোড়া।

মোম জ্বেলে আগে আগে চললো ক্যাম্পার, পেছনে তিন গোয়েন্দা।

সিঁড়ি বেয়ে নামছে ওরা, এই সময় আবার শোনা গেল গোঙানি। এবার আরও কাছে, আরও ভয়াবহ। পাথর হয়ে গেল যেন ওরা। হাত তুলে দেখালো মুসা, সেলারের ওপর দিকে দেয়ালে একটা জানালা। ম্লান একফালি আলো এসে ঢুকছে সে পথে। যানবাহনের আওয়াজও আসছে সেদিক দিয়ে। ধাতব একটা খটাখট, ঘটাং ঘটাং, তারপর আবার সেই ভয়ানক গোঙানি।

'রাস্তায় হচ্ছে শব্দটা,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো মুসা। জানালা ঢেকে রাখা তক্তায় ঠেলা দিলো। বড় হলো ফাঁক। সেখান দিয়ে তাকাতে চোখে পড়লো সরু একটুকরো চত্বর, স্পীডওয়েব সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। সরাইখানার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে একটা লরি। ময়লা ফেলার গাড়ি ওটা। বিরাট একটা ইস্পাতের দাড়া নেমে আসছে চাবি টিপলেই, রাবিশ বিনকে চেপে উপরে তুলে নিয়ে গিয়ে খোলা মুখটা কাত করে ধরছে, ময়লা-জঞ্জাল সমস্ত ট্রাকের পেছনে তুলে নিয়ে আবার মাটিতে নামিয়ে রাখছে বিনটা। বিন ওপরে তোলার সময়ই বিকট গোঙানির মতো শব্দ করছে মেশিন।

'দূর!' হতাশ হয়েছে কিশোর। 'ময়লা ফেলার গাড়ি!'

মাথা ঝাঁকালো ক্যাম্পার। 'পুরানো আর বদ্ধ জায়গা বলেই শব্দটা বেশি হচ্ছে।'

সেলারটা খুঁজে দেখতে বেশিক্ষণ লাগলো না। নিরাশ হয়ে আবার রান্নাঘরে ফিরে এলো তিন গোয়েন্দা।

নিচতলায় কিছু নেই। দোতলায় উঠলো ওরা। ঘরে ঘরে সেই একই রকম শূন্যতা, ধুলো মাকড়সার জাল আর ইঁদুর।

একটা বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো ক্যাম্পার। 'ঘরটার নাম রাজকন্যের স্যুইট। অনেকবার ঢোকার চেষ্টা করেছি। চাবিও আছে, কিন্তু কিছুতেই তালা খুলতে পারিনি। মরচে পড়ে বোধহয় আটকে গেছে তালাটা। দরজা না ভেঙে আর ঢোকা যাবে না। সাধারণ দরজা হলে ভেঙে ফেলতাম, কিন্তু সুন্দর পাল্লাটা ভাঙতে মন চায় না।'

সত্যিই সুন্দর। নানারকম সামুদ্রিক জীব আঁকা রয়েছে, চারপাশে জলজ আগাছা এঁকে করা হয়েছে অলঙ্করণ। ঠিক মাঝখানে আঁকা একটা জলকন্যার হাসিমুখ।

'গ্যালারিতে যে মারমেডটা ছিলো,' ক্যাম্পার জানালো, 'ওটা আগে ছিলো নিচতলার লবিতে। ইস্, এটাকেও যদি নষ্ট না করে খুলে নিয়ে যেতে পারতাম!'

চেষ্টা করলে পারতেও পারেন,' কিশোর বললো। 'সত্যিই কি এই ঘরটায় কখনও ঢোকেননি?'

'না। ভেনিসে এলে এটাতেই থাকতো নিরমা হল্যাণ্ড।'

'এখানেই ভূত দেখা যায়?' মুসার প্রশ্ন।

হাসলো ক্যাম্পার। 'ওসব গালগল্প বিশ্বাস করো নাকি? আমি করি না। লোকে কতো কিছুই তো বানিয়ে বলে। সব ফালতু।'

এরপর তিনতলায় উঠলো ওরা। জানালা দরজা বেশির ভাগই খোলা।

ক্যাম্পার বললো, 'মাটি থেকে তিরিশ ফুট ওপরে। এখানে উঠতে পারবে না ও। অসম্ভব।'

'চিলেকোঠা আছে?' কিশোর জানতে চাইলো।

'না'

আশা নেই তবু খুঁজলো গোয়েন্দারা। কিটুর কোনো চিহ্নই পাওয়া গেল না। এককোণ থেকে একটা শ্যাফট নেমে গেছে নিচের ভাঁড়ার ঘরে।

'এটাকে বলে ডামবওয়েইটার শ্যাফট,' বুঝিয়ে বললো ক্যাম্পার। 'রান্নাঘর থেকে এটা দিয়ে খাবার সরাসরি ওপরে পাঠিয়ে দেওয়া হতো।'

শ্যাফটটা শূন্য। ক্যাম্পার জানালো, টর্চ দিয়ে ভালমতো এটার ভেতরে খুঁজে দেখছে পুলিশ।

নিচতলায় নেমে এলো আবার ওরা। গ্যালারিতে ঢুকলো। ক্যাম্পারকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে, রোদে। চত্বরে দেখা গেল নিনা হারকারকে। চোখ বসে গেছে, রোগা হয়ে গেছে শরীর। গোয়েন্দাদের দেখে বললো, 'ওখানে খুঁজতে গিয়েছিলে তো? নেই আমি জানি। এ-ও জানি, ওর কি হয়েছে। স্পীডওয়েতে চলে গিয়েছিলো, কিংবা আরও দূরে। গাড়ি এসে চাপা দিয়ে কুকুরটাকে মেরে ফেলে। বকা শোনার ভয়ে আরও দূরে চলে গিয়েছে কিটু, তারপর আর পথ চিনে ফিরে আসতে পারেনি। এটাই হয়েছে।' থামলো একটু, তারপর বললো, 'টেলিভিশন দেখে কিংবা বই পড়ে সে অনেক কিছু করতে চাইতো। গত হপ্তায় কি ছবি দেখেছে জানো? পুরানো একটা সিনেমা, দ্য লিটল ফিউজিটিভ।'

'হুঁ?' বলে উঠলো ক্যাম্পার। ছেলেদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। কানে গেছে নিনার কথা।

'হ্যাঁ। একটা ছোট ছেলেকে নিয়ে গল্প। ছেলেটার মনে হয়েছে, তার ভাইকে সে খুন করেছে। ফলে কনি আইল্যাণ্ডে পালিয়েছে সে। কিটুও ওরকম করেই পালিয়েছে। ভেনিস পিয়ারে খুঁজেছে পুলিশ। পায়নি। তারমানে অন্য কোথাও লুকিয়েছে।'

'ঠিক বলেছো, নিনা,' জোর গলায় বললো ক্যাম্পার। 'যাবে কোথায়? না খেয়ে কদিন থাকবে? খিদে সহ্য করতে না পেরে সুড়সুড় করে বাড়ি ফিরে আসবে।'

গ্যালারিতে ফিরে গেল ক্যাম্পার।

'কিন্তু খিদে আর কতো সহ্য করবে?' কাঁদো কাঁদো গলায় বললো নিনা, 'দুদিন তো হয়ে গেল।' চোখের পানি মুছে ঘুরলো। পা টেনে টেনে এগোলো বুকশপের দিকে।

মারমেড গ্যালারির দিকে ফিরলো মুসা। গ্যালারি বন্ধ করে দিয়েছে ক্যাম্পার, দরজায় ঝুলিয়ে দিয়েছে CLOSED লেখা সাইনবোর্ড।

'গেছে কোথাও,' মুসার দৃষ্টি অনুসরণ করে বললো কিশোর। 'নিনার গল্পটা নাড়া দিয়েছে তাকে। ওর মুখ দেখেছিলে, কি রকম বদলে গিয়েছিলো?'

'বেশি দূর যেতে পারেনি নিশ্চয়,' রবিন বললো। দৌড় দিলো ওশন ফ্রন্টের দিকে। চত্বরের উত্তর দিকটা দেখে ফিরে এলো একটু পরেই। 'গ্যালারির পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নামছে। জলদি এসো।'

ঘুরে মারমেড ইনের পেছনে চলে এলো ওরা। গ্যারেজ থেকে জাগুয়ারটা বের করে ফেলেছে ক্যাম্পার।

'খাইছে! গাড়ি! ফলো করবো কি করে?' হাত নাড়লো মুসা।

'এসো, পারবো,' বলে স্পীডওয়ের দিকে ছুটলো কিশোর। রোলস রয়েসটা এসে গেছে। ওদের পাশে এসে ব্রেক কষলো হ্যানসন। বললো, 'যাবেন কোথাও···'

তার কথা শেষ হলো না। একটানে পেছনের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো কিশোর। জাগুয়ারটা দেখিয়ে বললো, 'ওটাকে ফলো করুন।'

রবিন আর মুসাও উঠে বসেছে।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে জাগুয়ারের পেছনে লাগলো হ্যানসন।

প্রথমে পুবে গেল জাগুয়ার। ব্লকখানেক এগিয়ে উত্তরে মোড় নিয়ে চললো সান্তা মনিকার দিকে।

সান্তা মনিকায় গিয়ে সৈকতের দিকে মুখ ঘোরালো জাগুয়ার। থামলো না। থামলো সান্তা মনিকা পিয়ারের সিকি মাইল দূরে। হ্যানসন থামলো না। জাগুয়ারের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে পরের পার্কিং এরিয়ায় ঢুকলো।

গাড়ি থেকে বেরোলো না গোয়েন্দারা। এখান থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে জাগুয়ারটা। ক্যাম্পার বেরোলো।

হেঁটে চললো পিয়ারের দিকে।

'হুঁ,' আনমনে বললো কিশোর, 'এখানকার পিয়ারের নিচেই তাহলে লুকিয়েছে ছেলেটা। পুলিশ ভেনিস পিয়ারে খুঁজেছে, সান্তা মনিকায় আসেনি। নিনার কাছে শুনেই ক্যাম্পার অনুমান করে নিয়েছে এখানে থাকতে পারে।'

'ভেনিস থেকে তো বেশ দূরে জায়গাটা,' ক্যাম্পারকে পিয়ারের আড়ালে হারিয়ে যেতে দেখছে রবিন। 'দু-মাইল তো হবেই।'

'কিটুর মতো একটা ছেলের জন্যে কি এটা বেশি দূর?'

'ক্যাম্পার যদি দেখে ফেলে?' মুসার গলায় উদ্বেগ। 'লোকটা সুবিধের না। কি করে বসবে···'

থেমে গেল সে। পিয়ারের নিচ থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছে ক্যাম্পার। রোগা, লালমুখো, ছেঁড়া পোশাক পরা এক লোক তাড়া করেছে তাকে। হাতে একটা খালি মদের বোতল। বাড়ি মারার ভঙ্গিতে নাড়ছে ওটা।

অলিম্পিক জেতার বাজি রেখেছে যেন ক্যাম্পার। লোকটার আগেই চলে এলো গাড়ির কাছে। এক ঝটকায় দরজা খুলে উঠে বসলো ড্রাইভিং সীটে। মুহূর্ত পরেই হাইওয়ের দিকে চলতে আরম্ভ করলো জাগুয়ার।

নীরবে হাসছে হ্যানসন। কিশোর তার দিকে তাকাতেই বললো, 'প্রায়ই কানে আসে সান্তা মনিকা পিয়ারের নিচে বিশেষ ভদ্রলোকদের আড্ডা। আজ বুঝলাম ঠিকই শুনেছি। ক্যাম্পার সাহেবের বোধহয় খবরটা জানা ছিলো না।'

হ্যানসনের কথা শেষ হওয়ার আগেই গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে মুসা।

এগোলো লোকটার দিকে। মাতালের মতো দুলছে লালমুখো, নিজে নিজেই কথা বলছে।

তার কাছে গিয়ে মুসা খুব বিনয় করে বললো, 'শুনছেন?'

জ্বলন্ত চোখে মুসার দিকে তাকালো লোকটা।

'ছোট্ট একটা ছেলেকে খুঁজছি আমরা,' আবার বললো মুসা। হাত দিয়ে উচ্চতা দেখিয়ে বললো, 'এই এত্তোটুকু হবে লম্বা। দুদিন ধরে নিখোঁজ।'

'না, দেখিনি। বাচ্চাদের ঢুকতে দিই না এখানে। দেখলেই ভাগিয়ে দিই।'

আর কিছু বলে লাভ হবে না বুঝে ফিরে এলো মুসা। 'নাহ্, কাজ হলো না।'

'একেবারেই হয়নি, তা নয়,' কিশোর বললো, 'একটা ব্যাপারে শিওর হয়ে গেছি। ক্যাম্পারও জানে না কিটু কোথায় আছে। এবং সে-ই ছেলেটাকে খুঁজে বের করতে চায় সবার আগে। অবাক লাগছে না? তার এতো মাথাব্যথা কিসের?' একটু থেমে বললো, 'বুঝতে পারছি, কিটুকে খুঁজে বের করতে হলে আগে ব্রড ক্যাম্পার রহস্যের সমাধান করতে হবে।'

চোদ্দ

পরদিন সকালে আবার ভেনিসে গেল তিন গোয়েন্দা। নিনাকে পাওয়া গেল না। বুকশপের সামনে অস্থির ভাবে পায়চারি করছেন তার বাবা।

'বাড়িতে গিয়ে শুয়ে থাকতে বলেছি,' বোরম্যান বললেন। 'না খেয়ে না ঘুমিয়ে একেবারে কাহিল হয়ে গেছে।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। 'তিনটে দিন হয়ে গেল, এখনও এলো না! কি যে হলো ছেলেটার!'

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করলো কিশোর। 'মিস্টার বোরম্যান, কুকুরটার পোস্ট মর্টেম করার কথা ছিলো। কিছু বোঝা গেছে?'

'নাহ্, গাড়ি চাপা পড়েছে বলে মনে হয় না। মাথায় আর ঘাড়ে খুব সামান্য আঘাত। ডাক্তারদের ধারণা, হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে। বুড়ো হয়ে গিয়েছিলো, শক পেয়েছিলো হয়তো, সইতে পারেনি।'

দোকানে ঢুকে গেলেন বোরম্যান। ছেলেরা চললো তাদের কাজে।

একটা পরিকল্পনা করে তৈরি হয়ে এসেছে ওরা আজ। সঙ্গে করে ওয়াকি-টকি এনেছে। রবিন আর মুসাকে একটা করে দিয়ে তৃতীয়টা নিজে রাখলো কিশোর। ডিগারের বাড়ির কাছে ঝোপের ভেতর গিয়ে নজর রাখার জন্যে লুকিয়ে বসলো রবিন।

কাফের বারান্দায় একটা টেবিলের কাছে বসলো মুসা আর কিশোর। ব্রড ক্যাম্পারের বাড়ির ওপর চোখ রাখবে ওরা। একটু পরেই সরে গেল জানালার পর্দা। উঁকি দিলো ক্যাম্পার। কিশোর আর মুসার ওপর চোখ পড়তে দ্বিধা করলো একবার, তারপর হাত নাড়লো।

হাত নেড়ে জবাব দিলো দুই গোয়েন্দা।

'এখানে বসে সুবিধে করতে পারবো না,' মুসা বললো। 'দেখে ফেলেছে।'

'তবু এখানেই বসতে হবে। আগেও বসেছি, কাজেই সন্দেহ করবে না।'

কাফে থেকে বেরিয়ে এলো লিসটার। জিজ্ঞেস করলো, 'কি লাগবে?'

ঠিক এই সময় ওয়াকি-টকিতে ভেসে এলো রবিনের কণ্ঠ, 'কিশোর, এইমাত্র বেরিয়ে গেল ডিগার। তার রুমমেট গেছে দশ মিনিট আগে। বাড়িতে কেউ নেই এখন।'

শুনলো লিসটার। ভুরু কোঁচকালো। কিন্তু কিছু বললো না।

মুসাকে বললো কিশোর, 'তুমি এখানে থাকো। খিদে পেলে খাও। আমি আসছি।'

লিসটার কিংবা মুসাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। চলে এলো মারমেড কোর্টের পেছনে, রবিন যেখানে বসে আছে।

'হেঁটে গেছে ডিগার,' রবিন জানালো। 'একবার ভাবলাম পিছু নিই, পরে ভাবলাম দেখিই না, এখানেও কিছু ঘটতে পারে।'

'ভালো করেছো। বসে থাকো, আমি যাচ্ছি।'

'দরজায় তালা আটকে দিয়েছে ডিগার।'

'ঢোকার নিশ্চয় আরও পথ আছে।'

ঠিকই আন্দাজ করেছে কিশোর। বাড়ির পুবধারে একটা জানালা খোলা পাওয়া গেল। আস্তে করে চৌকাঠে উঠে বসে ভেতরে লাফিয়ে নামলো সে।

ঘরটা বোধহয় একসময় ডাইনিং রুম হিসেবে ব্যবহার হতো। ছাত থেকে ঝুলছে অনেক পুরানো একটা ঝাড়বাতি। একধারের দেয়ালে একটা সাইডবোর্ড তৈরি করা হয়েছে, রুপালি রঙ করা। কাঠের মেঝেতে এক জায়গায় পড়ে রয়েছে কতগুলো ছেঁড়া ম্যাগাজিন। আর কিচ্ছু নেই, একটা চেয়ারও না।

রান্নাঘরে ঢুকলো কিশোর। একটা টেবিলে পড়ে আছে এঁটো প্লেট। সিংকে রয়েছে আরও কয়েকটা। টেবিলের এক কোণে জড়ো করে রাখা হয়েছে কুকুরের খাবার। বাজে গন্ধ বেরোচ্ছে সব কিছু থেকেই। পেছনে যাবার দরজাটা ভাঙা, বেঁকে রয়েছে।

সামনের ঘরে একটা চামড়ার সোফা, বয়েস কতো অনুমান করাই মুশকিল। কাঁচের টপওয়ালা গোল একটা টেবিল, তাতে কয়েকটা কুকুরের কলার, আর সান্তা মনিকা পত্রিকার একটা কপি পড়ে আছে। কুকুর হারানো বিজ্ঞাপনে দাগ দিয়ে চিহ্নিত করা। বাদামী রঙের ম্যানিলা খাম আছে কয়েকটা। সরকারী খাম। ডাকবাক্স থেকে এসব চুরি করে আনে নাকি?—ভাবলো কিশোর।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এলো সে। শোবার ঘর আর গোসলখানা দেখতে বেশি সময় লাগলো না। চোখে পড়ার মতো কিছু নেই, বাথরুমে কিছু অধোয়া পুরানো কাপড় ছাড়া।

তিনতলা নেই বাড়িটায়, বেসমেন্টও নেই, নেই কিটুর কোনো চিহ্ন।

হতাশ হয়ে বেরিয়ে আসতে যাবে কিশোর, এই সময় ওয়াকি-টকিতে শোনা গেল রবিনের গলা। 'কিশোর ডিগার আসছে!'

এক দৌড়ে ডাইনিং রুমে চলে এলো কিশোর। জানালা দিয়ে দেখলো, প্যাসিফিক অ্যাভেন্যুর দিক থেকে আসছে ডিগার।

রান্নাঘরে ঢুকলো কিশোর। সামনের বারান্দায় পদশব্দ শোনা গেল। ভাঙা দরজাটা খুলে পিছনের বারান্দায় চলে এলো সে। একসঙ্গে ফেটে পড়লো যেন কুকুরগুলো। প্রচণ্ড ঘেউ ঘেউ শুরু করে দিলো।

'এই, অমন করছিস কেন?' সামনের বারান্দা থেকে চেঁচিয়ে উঠলো ডিগার।

চট করে পেছনের আঙিনাটায় চোখ বুলিয়ে নিলো কিশোর। তক্তার উঁচু বেড়ায় ঘেরা জায়গাটা। ওটা ডিঙিয়ে যাওয়া যাবে না। একমাত্র যে গেটটা আছে, ওটা দিয়ে বেরোতে গেলে ডিগারের চোখে পড়ে যাবে।

একটা কাজই করতে পারে, এবং সেটাই করলো কিশোর। দৌড় দিলো কুকুরের খোঁয়াড়ের দিকে।

'এই, এই!' দেখে ফেলেছে ডিগার। বাড়ির ধার ঘুরে দেখতে আসছিলো চেঁচামেচি করছে কেন কুকুরগুলো।

ফিরেও তাকালো না কিশোর। সব চেয়ে কাছে যে খোঁয়াড়টা পেলো, খুলে দিলো ওটার দরজার হুড়কো। খোলা পেয়ে চোখের পলকে বেরিয়ে পড়লো জার্মান শেফার্ড।

'এই, এই কুত্তা, ঢোক, ভেতরে ঢোক!' চেঁচিয়ে আদেশ দিলো ডিগার।

কি হলো দেখার জন্যে দাঁড়ালো না কিশোর। খুলে দিলো আরেকটা খোঁয়াড়ের হুড়কো। ঘাউ করে উঠে বেরিয়ে এলো আরেকটা কুকুর। শেফার্ডের ওপর চোখ পড়তেই গেল রেগে। লাফ দিয়ে গিয়ে পড়লো ওটার ঘাড়ে। বেধে গেল মারামারি। থামানোর জন্যে পাগলের মতো চেঁচাতে লাগলো ডিগার। বৃথা চেষ্টা।

আরেকটা খোঁয়াড়ের হুড়কো খুলে দিলো কিশোর, তারপর আরও একটা।

কুকুরগুলোকে ছাড়াতে গিয়ে ইতিমধ্যেই দু-জায়গায় কামড় খেলো ডিগার।

বেড়ার ফাঁক দিয়ে এসব দেখলো রবিন। তাড়াতাড়ি খুলে দিলো চত্বর আর ড্রাইভওয়ের মাঝের গেট। খোলা দেখে চোখের পলকে ঝগড়া থামিয়ে দিলো কুকুরগুলো। দৌড় দিলো বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে।

ডিগারের অবস্থা দেখার মতো। চেঁচাতে চেঁচাতে গলার রগ ফুলে গেছে, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসবে যেন, দুহাত তুলে উন্মাদ নৃত্য শুরু করেছে। কে শোনে কার কথা। প্রথমেই খোলা গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল শেফার্ডটা।

একে একে চারটে কুকুর স্পীডওয়েতে বেরিয়ে চার দিকে ছড়িয়ে পড়লো। ওদের পেছনে ছুটলো ডিগার। শিস দিয়ে এবং আরও যতো রকমে কুকুরকে ডাকা সম্ভব, ডেকে ডেকে ফেরানোর চেষ্টা করলো।

রাস্তার মোড়ে বসে পড়েছে রবিন। কেদম হাসছে।

এই সময় স্পীডওয়ে ধরে আসতে দেখা গেল রুমমেটের ট্রাক।

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে দাঁড়ালো ট্রাকটা। লাফিয়ে নামলো রুমমেট। একটা কুকুরকে ধরার জন্যে ছুটলো। কয়েক পা গিয়েই থেমে গেল যেন দেয়ালে হোঁচট খেয়ে। রাস্তার মাথায় দেখা দিয়েছে দুটো পুলিশের গাড়ি।

দেখেই আরেক দিকে দৌড় দিলো ডিগার। বেড়ার পাশের কয়েকটা ঝোপের দিকে। রুমমেট ছুটলো তার উল্টোদিকে।

চেঁচামেচি শুনে অন্যান্য বাড়ির কয়েকজন লোক বেরিয়ে এসেছে।

গাড়ি থামিয়ে নামলো পুলিশ।

সবার চোখ এড়িয়ে সরে পড়লো দুই গোয়েন্দা। সন্তুষ্ট হয়েছে কিশোর। একটা কাজ অন্তত সমাধা করতে পেরেছে। বন্ধ করে দিয়েছে ডিগারের কুকুর চুরির ব্যবসা।

পনেরো

মারমেড কোর্টের উত্তর ধারে রবিনকে রেখে, ক্যাম্পারের গ্যালারির দিকে এগোলো কিশোর। ঘুরে এসে দেখলো, কাফের বারান্দায় বসে রয়েছে মুসা।

সুতোর দোকানের ওপরে একটা দরজা খুলে গেল। ব্যালকনিতে বেরিয়ে এলেন মিস এমিনার। ডেকে বললেন, 'এই, তোমাদের সঙ্গে কথা আছে।'

চট করে পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো মুসা আর কিশোর।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো দুজনে। দরজায় অপেক্ষা করছেন মিস এমিনার। ডেকে নিয়ে এলেন ভেতরে।

বসার ঘরে বসে আছেন মিস্টার ডেজার। ব্রড ক্যাম্পারের জানালার দিকে চোখ।

'ডিগারকে তো ফাঁসিয়ে দিয়েছো দেখলাম,' মিস এমিনার বললেন হাসিমুখে। 'ক্যাম্পারকেই বা ছাড়বে কেন?'

আবার চোখে চোখে তাকালো দুই গোয়েন্দা। ক্যাম্পারকে একেবারেই দেখতে পারেন না মহিলা।

'ওকে আপনি দেখতে পারেন না,' বলেই ফেললো মুসা।

'ভালো লোক হলে তো পারবো?' ডেজার বললেন।

জানালার বাইরে তাকালো কিশোর। গ্যালারিতেই রয়েছে ক্যাম্পার। কফির কাপ হাতে নিয়ে বেরিয়েছে রান্নাঘর থেকে।

পুরানো সরাইখানাটার পেছনের অংশে চোখ পড়লো কিশোরের। ডেজারকে জিজ্ঞেস করলো, ওটা সম্পর্কে তাঁর কি ধারণা।

'লোকে বলে ভূত আছে বাড়িটাতে,' আগেও বলেছেন, আবার বললেন

ডেজার। ভূতের কাছাকাছি বাস করতে পেরে যেন খুব খুশি তিনি। 'ওটা নাকি নিরমা হল্যাণ্ডের প্রেতাত্মা।'

'একেবারে কাঠির মতো শুকনো তার শরীর,' যোগ করলেন এমিনার। 'ভূতের কাছ থেকে নিশ্চয় ভাড়া পায় না ক্যাম্পার। অথচ তার মতো একটা লোক টাকা উপার্জনের চেষ্টা করছে না হোটেলটা থেকে, এটা বিশ্বাস হয় না। না ভাঙার নিশ্চয় কোনো কারণ আছে।'

'কিন্তু কারণটা কি?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলো কিশোর। 'দামী জায়গা এখন এটা। সাগরের দিকে মুখ করা। চমৎকার হোটেল বানিয়ে প্রচুর টাকা ইনকাম করা যায়।'

'আসলে ক্যাম্পারটাকে বোঝাই মুশকিল,' জোরে মাথা ঝাঁকালেন মিস এমিনার। 'আজব লোক!'

'ওপর তলার জানালায় শিক নেই,' কিশোর বললো। 'ভাবছি, ঢোকা যাবে কিনা! এই বাড়িটার ছাতের ওপর দিয়ে যাওয়া যায়, চেষ্টা করলে।'

অবাক হলো মুসা। 'কেন? দেখেই তো এলাম একবার।'

'নিরমা হল্যাণ্ডের ঘরটাতে ঢুকতে পারিনি, ভুলে গেছো?'

'ওটাতেই তো থাকে ভূত,' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন ডেজার। 'ওই জানালা-গুলো দেখছো, উত্তর ধারে? ওটা নিরমা হল্যাণ্ডের ঘর। রাতের বেলা ওখানেই আলো দেখি মাঝে মাঝে।'

'ঘরের ভেতরের আলো না।' যুক্তি দেখালেন মিস এমিনার, 'হয়তো বাইরের আলো এসে পড়ে জানালার কাঁচে, আপনার মনে হয়েছে ভেতরে জ্বলছে।'

জবাব দিলেন না ডেজার, এড়িয়ে গেলেন। কিশোরকে বললেন, 'তোমরা যেতে চাইলে আমি সাহায্য করতে পারি। ক্যাম্পারের সঙ্গে কথা বলার ছুতোয় তাকে আটকে রাখবো, এই সুযোগে তোমরা গিয়ে ঢুকে দেখে আসতে পারো।'

'থ্যাংক ইউ, মিস্টার ডেজার।'

'আমি এখান থেকে চোখ রাখছি,' মিস এমিনার বললেন। 'যদি এক ঘণ্টার মধ্যে না ফেরো তোমরা, মিস্টার ডেজার আর মিস্টার বোরম্যানকে পাঠাবো তোমাদের খুঁজতে।'

উঠে বেরিয়ে গেলেন ডেজার। গ্যালারিতে গিয়ে ঢুকলেন। কথা বলতে শুরু করলেন ক্যাম্পারের সঙ্গে। চত্বরের দিকে পেছন ফিরে আছে ক্যাম্পার।

'এসো, যাই,' মুসাকে বললো কিশোর।

'কাজটা কি ঠিক হচ্ছে?' মুসার কণ্ঠে অস্বস্তি। 'যদি···যদি সত্যিই ভূত থেকে থাকে?'

'থাকবে না, কারণ, ভূত বলে কিছু নেই। এসো।'

কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলো না মুসা। তবে আর প্রতিবাদও করলো না। মিস এমিনারের ঘরের পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়ির কাছে চলে এলো। ছাতে

উঠে পেরিয়ে এলো মিস্টার ডেজারের ঘরের ছাত। সামনেই সরাইখানার দেয়াল। মাথা নিচু করে রইলো ওরা, যাতে গ্যালারি থেকে ক্যাম্পারের চোখে না পড়ে।

ছাত থেকে উঁচুতে তিনতলার জানালা। তবে বেশি উঁচু নয়। উঁকি দিয়ে একবার দেখলো কিশোর, ক্যাম্পার আর ডেজার কথা বলছেন।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একটা জানালার পাল্লায় ঠেলা দিলো মুসা। খুলে গেল ওটা। জানালা গলে ঢুকে পড়লো ঘরের ভেতর।

তিনতলার সমস্ত ঘরই একবার দেখে গেছে। আজ আর দেখার প্রয়োজন মনে করলো না। সোজা এগোলো সিঁড়ির দিকে। নেমে এসে দাঁড়ালো প্রিন্সেস স্যুইটের সামনে। নব ধরে মোচড় দিলো মুসা। ঘুরলো না। জানে লাভ হবে না, তবু কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিলো পাল্লায়।

'আমরা রান্নাঘরের ওপরে রয়েছি,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো কিশোর। 'কিংবা ভাঁড়ারের ওপর। আর তিনতলার কোণের ঘরের নিচে রয়েছি, যেটা থেকে ডামবওয়েইটার নেমে গেছে।' হাসি ফুটলো মুখে। 'শ্যাফটটা নিশ্চয় প্রিন্সেস স্যুইটের ভেতর দিয়ে নেমেছে। এই দেয়ালটার ঠিক ওপাশে। ঘরে খাবার পাঠানোর জন্যে তৈরি হয়েছে ডামবওয়েইটার, নিশ্চয় বন্ধ থাকার কথা নয় সব জায়গায়। প্রতি তলাতেই ওটা থেকে বেরোনোর জায়গা আছে।'

'খাইছে! তাই তো!'

তাড়াতাড়ি আবার তিনতলায় উঠে এলো ওরা। শ্যাফটের ছোট দরজাটা খুলে ভেতরে উঁকি দিলো কিশোর। অন্ধকার। বাড়িটা তৈরি করতে কাঠ লেগেছে, ওগুলোর মাথা অনেক জায়গায় বেরিয়ে রয়েছে শ্যাফটের ভেতর।

'ধরে ধরে সহজেই নেমে যেতে পারবো,' বললো মুসা। 'মইয়ের মতো।'

নেমে যেতে আরম্ভ করলো সে।

ওপর থেকে দেখছে কিশোর।

বেশিক্ষণ লাগলো না, দোতলায় দরজাটা পেয়ে গেল মুসা। পা দিয়ে ঠেলতেই খুলে গেল পাল্লা। শূন্য একটা ঘরে ঢুকলো মুসা। ধুলোর ছড়াছড়ি সবখানে। দরজা দিয়ে আবার মুখ বের করে ওপরে তাকিয়ে ডাকলো সে, 'এসো।'

কিশোরও নেমে এলো। ঢুকলো নিরমা হল্যাণ্ডের ঘরে।

ছোট একটা অ্যান্টিরুমে ঢুকেছে ওরা। পুরানো ধাঁচের একটা সুইং ডোরের গায়ে বসানো ছোট কাঁচের ভেতর দিয়ে আলো আসছে।

'বাকি ঘরগুলো ওপাশে আছে,' ফিসফিসিয়ে কথা বলছে মুসা, ভয়ে ভয়ে তাকালো এদিক ওদিক। যেন ভয় করছে এখুনি বেরিয়ে আসবে ভূতটা।

সুইং ডোরে ঠেলা দিলো কিশোর। ওপাশে তাকিয়েই হাঁ হয়ে গেল।

ধুলোর নামগন্ধও নেই ঘরটায়। অনেকদিন বন্ধ থাকলে যেমন ভ্যাপসা গন্ধ থাকে বাতাসে, তেমন গন্ধও নেই। লুকানো কোনো ভেন্টিলেটর দিয়ে বাতাস এসে থিরথির করে কাঁপছে জানালার পর্দা। ভারি, সুন্দর পর্দা, দামী। ঘরে আলো খুব কম,

তবে কি আছে না আছে দেখতে অসুবিধে হয় না। সাইডবোর্ড আছে কয়েকটা। তাতে রয়েছে রুপার মোমদানী, রুপার নানারকম পানপাত্র। দেয়ালে ঝোলানো অসংখ্য সুন্দর সুন্দর ছবি।

'এই যে,' বললো একটা চাপা কণ্ঠ, 'এটা কেমন?'

ভীষণ চমকে গেল মুসা। ধক করে উঠলো বুক। কিশোরের হাত আঁকড়ে ধরলো। ব্রড ক্যাম্পারের গলা।

'বাহ্ সুন্দর তো,' মিস্টার ডেক্সার বললেন। 'মডার্ন আর্ট বুঝি না আমি, তবে দেখতে ভালোই লাগছে।'

শব্দ করলে শোনা যাবে, বুঝে গেছে গোয়েন্দারা, তাই শব্দ করলো না। ঘরে কি আছে দেখতে লাগলো। দামী দামী অনেক জিনিস আছে। কার্পেট, চেয়ার, বাক্স, আর আরও অনেক জিনিস।

ক্যাম্পার আর ডেক্সার কথা বলছেন। কিন্তু তাঁদেরকে দেখা যাচ্ছে না।

দেয়ালের ওপাশ থেকে আসছে শব্দ, অনুমান করলো কিশোর। সেটার দিকে এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো সে। পুরানো একটা কাঠের বাক্স দৃষ্টি আকর্ষণ করছে তার। ডালায় আর গায়ে খোদাই করা রয়েছে নানারকম পৌরাণিক দানবের ছবি। পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালো বাক্সটার কাছে। ডালা ধরে টান দিলো।

ঘাড়ের পেছনে দাঁড়িয়ে অস্ফুট একটা শব্দ করে উঠলো মুসা। বিস্ময়ে।

বাক্সটা টাকায় বোঝাই। দশ, বিশ, পঞ্চাশ, একশো ডলার নোটের বাণ্ডিল থরে থরে সাজানো। ব্যাংকে যেমন থাকে।

'আপনার সঙ্গে কথা বলে বেশ ভালোই লাগলো মিস্টার ডেক্সার,' ক্যাম্পার বলছে। তার ইচ্ছে, ডেক্সার এবার চলে যাক। 'এতো কাছাকাছি থাকি, অথচ কথা বলারই সুযোগ হয় না। এসে খুব ভালো করেছেন।'

ঠেলে চেয়ার সরানোর শব্দ হলো। দেয়ালের ওপাশে পায়ের আওয়াজ এগিয়ে গেল গ্যালারির দরজা পর্যন্ত।

আস্তে ডালাটা আবার নামিয়ে দিলো কিশোর।

গ্যালারির দরজার ঘণ্টাটা বাজলো। তারমানে বেরিয়ে গেছেন ডেক্সার। আগের জায়গায় ফিরে এলো ক্যাম্পার। চেয়ারটা জায়গামতো নিয়ে গিয়ে রাখলো, আওয়াজ শুনেই আন্দাজ করা যাচ্ছে।

দেয়ালের কাছ থেকে সরে এলো কিশোর। মুসাকে ইশারা করলো পাশের ঘরে চলে আসতে। তারপর এগোলো, যেখান দিয়ে ঢুকেছে, সেখান দিয়েই বেরিয়ে যাবে আবার।

'কতো টাকা, দেখলে!' ফিসফিস করে বললো মুসা।

আনমনে মাথা দোলালো শুধু কিশোর।

'কিন্তু এখনো পড়ে আছে কেন? আবার বললো মুসা। 'নিরমা হল্যাণ্ড তো সেই কবেই মরে গেছে।'

আমার মনে হয় না টাকাটা তার। ক্যাম্পার কিছু একটা করছে। ও আমাকে বলেছিলো, সরাইটা যখন কেনে তখন একেবারে খালি ছিলো এটা...' থমকে গেল কিশোর। পাশের ঘরে হুড়কো খুলেছে বোধহয় কেউ।

'আসছে!' বলেই শ্যাফটের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লো মুসা।

তাকে কয়েক ফুট ওঠার সময় দিলো কিশোর, তারপর নিজেও ঢুকে পড়লো। সাবধানে লাগিয়ে দিলো দরজা।

আরেকটা দরজা খোলার আওয়াজ হলো। নিশ্চয় সুইং ডোরটা—ভাবলো কিশোর। ক্যাম্পার ঢুকেছে। ও কি বুঝতে পারবে ঘরে লোক ঢুকেছিলো? দরজা খুলে শ্যাফটে দেখতে আসবে?

কিঁচ করে আরেকবার শব্দ হলো। ধড়াস করে উঠলো কিশোরের বুক। তবে না, শ্যাফটের দরজা নয়, সুইং ডোরটাই বন্ধ হলো আবার।

আওয়াজ হয়ে যাওয়ার ভয়ে থেমে গিয়েছিলো মুসা, কিশোরের মতোই সে-ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। উঠতে আরম্ভ করলো ওপরে।

ষোলো

তিনতলায় উঠে মুসা বেরিয়ে গেল, কিশোর শ্যাফটের ভেতরেই রইলো।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এলো মুসা। বললো, 'হল, গ্যালারি সব দেখে এসেছি। কেউ নেই। এসো।'

কি যেন ভাবছে কিশোর। জবাব দিলো না। 'এই কিশোর, কি ভাবছো?'

'উঁ! ভাবছি, টাকার বাক্সটা কোনোভাবে বের করে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা?'

নিয়ে গিয়ে কি হবে, একথাটা আর জিজ্ঞেস করলো না মুসা।

'এক কাজ করো,' কিশোর বললো। 'ওয়াকি-টকিতে রবিনের সঙ্গে কথা বলো। ক্যামেরা নিয়ে আসতে বলো।'

কথা বললো মুসা। ক্যামেরা সাথেই আছে রবিনের। কিভাবে কিভাবে আসতে হবে, তা-ও বললো।

কিছুক্ষণ পর এলো রবিন। উত্তেজিত।

সংক্ষেপে সমস্ত কথা বলে তার বিস্ময় কিছুটা ঘোচালো মুসা। 'আবার ফিরে যেতে হবে অ্যান্টিরুমে,' কিশোর বললো।

'কেন?' রবিনের প্রশ্ন।

'ক্যামেরা আনতে বলেছি কিসের জন্যে।'

হাসলো রবিন। বুঝে ফেলেছে। 'ঘরের জিনিসপত্রের ছবি তুলবে।'

'হ্যাঁ, তুলবো। বিশেষ করে পেইন্টিংগুলোর। ওগুলোর মধ্যে একটার ছবি দেখেছি খবরের কাগজে, পরিষ্কার মনে পড়ছে। কারো কাছ থেকে চুরি করে আনা হয়েছে ওটা।'

হাঁ করে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলো দুই সহকারী। মুসা বললো অবশেষে, 'ক্যাম্পার চোর?'

'জানি না। এক বাক্স বোঝাই টাকা, চোর হলে কি ওভাবে ফেলে রাখে ওরকম একটা জায়গায়? তবে, চোরাই মালের ব্যবসা যারা করে, তাদের প্রচুর নগদ টাকার দরকার হয়।'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলালো রবিন। জিজ্ঞেস করলো, 'যাবো ছবি তুলতে?'

'একলা পারবে?'

'কেন পারবো না। এই কয়েক মিনিট লাগবে। আসছি।'

নেমে গেল রবিন।

দেয়ালে হেলান দিয়ে চুপ করে বসে ভাবতে লাগলো কিশোর । ঘন ঘন চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। পায়চারি করছে মুসা। হঠাৎ কিশোর বললো, 'হুঁ, বুঝেছি!'

থেমে গেল মুসা। 'কি বুঝলে?'

ফিরে তাকালো না কিশোর। তাকিয়ে রয়েছে দেয়ালের দিকে। যেন সেখানে প্রোজেক্টরে ছবি চলছে, তাই দেখেই বলতে লাগলো, 'ধরো আজকে জুলাইয়ের চার তারিখ। তোমার বয়েস পাঁচ। কিটুর মতো। প্যারেড চলছে। সবাই ব্যস্ত, সবাই উত্তেজিত। তুমি এখন কি করবে?'

ভ্রূকুটি করলো মুসা। 'এমন কিছু, যেটা করা উচিত নয়।'

'ঠিক। মারমেড গ্যালারিতে ঢোকার চেষ্টা করবে না তুমি, ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে? কারণ ওটা দেখার প্রচণ্ড কৌতূহল আছে তোমার। নিঃশব্দে সবার চোখ এড়িয়ে চলে আসবে সিঁড়ির কাছে, উঁকি দিয়ে দেখবে ক্যাম্পার আছে কিনা। না দেখলে আন্দাজ করবে, আর সবার মতোই সে-ও বেরিয়ে গেছে প্যারেড দেখতে। এই সুযোগে ঢুকে পড়বে তুমি গ্যালারিতে, যেহেতু তোমার উচ্চতা কম, ঘন্টার ইলেকট্রিক বীমে বাধা আসবে না। খুব সহজেই ঢুকে পড়তে পারবে তুমি, ডবকে নিয়ে।

'গ্যালারিতে ঢুকে দারুণ সব জিনিস দেখবে তুমি। একটা দরজা চোখে পড়বে, ভাঁড়ারে ঢোকার। কাউন্টারের ওপারে দরজাটা। ওর ওপাশে কি আছে জানো না তুমি, দেখার কৌতূহল হবেই। ঢুকে পড়বে।

'এক এক করে দেখতে দেখতে এভাবেই চলে যাবে প্রিন্সেস স্যুইটের কাছে।' থেমে দম নিলো কিশোর। তারপর বললো, 'আমার বিশ্বাস, সেদিন সকালে নিরমা হল্যাণ্ডের ঘরে ছিলো ক্যাম্পার।'

'কিন্তু দরজা তো বন্ধ, ঢুকলো কিভাবে?' প্রশ্ন তুললো মুসা। 'নিশ্চয় শ্যাফট দিয়ে নয়?'

'না। অবশ্যই আরেকটা গোপন দরজা আছে, যেখান দিয়ে ক্যাম্পার ঢোকে। সেটা দেখে ফেলেছিলো কিটু। সবাই তখন প্যারেড দেখায় ব্যস্ত, তাই হয়তো ভেতরে ঢুকে দরজাটা আর লাগিয়ে দেয়ার কথা মনে হয়নি ক্যাম্পারের। ভেবেছে,

কে আর আসবে দেখতে?

'তারপর কোনো কারণে চোখ তুলে কিটুকে দেখে ফেলেছে। কিংবা এমনও হতে পারে, দরজাটা খোলা ফেলে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে গিয়েছিলো ক্যাম্পার, ফিরে এসে দেখে ট্রেজার রুমে ঢুকে বসে আছে কিটু। কি করবে তখন সে? ভয় পাবে? রেগে যাবে?'

'ধরার চেষ্টা করবে কিটুকে,' মুসা বললো।

'হ্যাঁ। আর কিটু পালানোর চেষ্টা করবে। বেরিয়ে চলে এসেছিলো হয়তো গ্যালারিতে। লুকানোর চেষ্টা করেছিলো জলকন্যার বেদির আড়ালে। তাতে নাড়া লেগে পড়ে গিয়ে ভেঙে যায় জলকন্যা। ডব ছিলো কিটুর সাথে। মূর্তিটা সরাসরি মাটিতে পড়েনি, পড়েছিলো কুকুরটার ওপর। ব্যথা যা পেয়েছে, তার চেয়ে বেশি পেয়েছিলো শক। সহ্য করতে পারেনি জানোয়ারটার বুড়ো, নষ্ট হয়ে যাওয়া হৃৎপিণ্ড। মারা যায় ওটা।

'ততোক্ষণে পেছনের দরজার কাছে চলে যায় কিটু। দরজার ছিটকানি খুলে রাখে ক্যাম্পার, যখন সে ওঘরে থাকে, ফলে কিটুর বেরিয়ে যেতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। কিন্তু, বেরোনোর আগেই মূর্তিটা পড়ে যদি ভেঙে গিয়ে থাকে, তাহলে শব্দ হয়েছে। নিশ্চয় ফিরে তাকিয়েছে কিটু। কি দেখবে, এবং তখন কি করবে?'

'ফিরে আসবে কুকুরটাকে তোলার জন্যে।'

'কিংবা মূর্তি ভেঙেছে দেখে এতো ভয় পেয়ে যাবে, ডবের কথা আর ভাববে না। সোজা বেরিয়ে যাবে। ভাববে, তার দোষেই এতো কিছু ঘটেছে। মায়ের শাস্তির ভয়ে লুকিয়ে পড়বে কোথাও গিয়ে।'

'হ্যাঁ, ঠিকই,' একমত হলো মুসা। 'ওর বয়েসে আমি হলেও ওরকমই ভয় পেতাম। কিন্তু কোথায় লুকাতাম? এমন কোনো জায়গা আছে যেখানে পুলিশও খুঁজে বের করতে পারছে না? নাকি অন্য ব্যাপার হয়েছে? ক্যাম্পার ধরে ফেলেছে কিটুকে...'

'না। ও কোথায় আছে ক্যাম্পার জানেই না। সান্তা মনিকা পিয়ারে খুঁজতে গিয়েছিলো, মনে নেই?'

'তাই তো! কিন্তু কেন খুঁজতে গেল। ছেলেটাকে খুঁজে বের করে...মানে, মুখ বন্ধ করে দেয়ার জন্যে, যাতে সে ট্রেজার রুমের কথা বলতে না পারে?'

জবাব দিলো না কিশোর। দীর্ঘ একটা নীরব মুহূর্ত পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলো ওরা। তারপর রবিনের নড়াচড়ার শব্দ শুনে শ্যাফটের কাছে এগিয়ে গেল তাকে উঠতে সাহায্য করার জন্যে।

'অদ্ভুত!' বেরিয়েই বলে উঠলো রবিন। 'মনে হলো আরব্য রজনীর কোনো গল্পের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছিলাম...'

বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলো কিশোর, 'ছবি তুলেছো?'

'নিশ্চয়ই। পেইন্টিং, টাকা, সব কিছুর। এখন কি করবো? পুলিশের কাছে

যাবো?'

'হয়তো। তবে তার আগে জরুরী আরও কাজ আছে। আর একটা সূত্র পেলেই কিছু নিখোঁজ রহস্যের সমাধান করে ফেলতে পারবো।'

সতেরো

বুকশপেই পাওয়া গেল নিনা হারকারকে। ছেলেদের দেখে বলে উঠলো, 'কিছুতেই বাড়ি বসে থাকতে পারলাম না। ভাবলাম, দোকানেই চলে আসি...'

ছেলে নিখোঁজ হয়েছে তিনদিন, একেবারে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে মহিলাকে। হলদে হয়ে এসেছে চামড়া, ভারি ভাঁজ পড়েছে কপালের চামড়ায়।

যতোটা সম্ভব কম শব্দ করে একটা ঝাড়ন দিয়ে ধুলো ঝাড়ছেন বোরম্যান। বইয়ের তাকের ফাঁক দিয়ে এমনভাবে ঝাড়নটা ঢুকিয়ে দিচ্ছেন, যেন ঘোরের মধ্যে রয়েছেন?

কিশোর জিজ্ঞের করলো, 'মিসেস হারকার, এখানে কিটুর এমন কোনো বন্ধু আছে, যাকে সে খুব বিশ্বাস করে?'

হাসলো নিনা। কান্নার মতো দেখালো হাসিটা। বললো, 'ছিলো, শুধু ডব। তাকেই বিশ্বাস করতো কিটু।'

'মিসেস হারকার, আমি শিওর, কিটুকে সাহায্য করছে কেউ। পালিয়েই গেছে সে। কেউ একজন তাকে লুকিয়ে রেখেছে, খাওয়াচ্ছে, থাকার জায়গা দিয়েছে। নিশ্চয় আরেকটা বাচ্চা। তেমন কাউকে চেনে হয়তো কিটু, আপনারা জানেন না।'

তেমন কে আছে, মনে করার চেষ্টা করতে লাগলো নিনা।

জানালা দিয়ে সৈকতের দিকে তাকালো কিশোর। বরগু চলেছে। সাদা একটা পেটফোলা ব্যাগ তার হাতে। ব্যাগের গায়ে মুরগীর মাংসে তৈরি খাবারের বিজ্ঞাপন। 'হুঁ!' আনমনে বললো কিশোর।

জানালার পাশ দিয়ে ওশন ফ্রন্টের দিকে চলে গেল বরগু। হাসলো কিশোর। 'মিসেস হারকার, আসুন আমার সঙ্গে।'

কিশোরের কণ্ঠস্বরের হঠাৎ পরিবর্তনে ঝট করে মুখ তুলে তাকালো নিনা। 'কী? কি ব্যাপার?'

'একটা ব্যাপার পুরোপুরি চোখ এড়িয়ে গিয়েছিলো আমাদের,' হাত তুলে ওশন ফ্রন্টের দিকে দেখালো কিশোর।

তিন গোয়েন্দা আর নিনা বেরিয়ে গেল।

'নিনা?' পেছন থেকে ডাকলেন বোরম্যান।

জবাব দিলো না নিনা। ওশন ফ্রন্টের দিকে তাকিয়ে আছে। বরগুকে দেখছে।

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন বোরম্যান। ছেলেদের সঙ্গে চললেন তিনি আর নিনা। সামনে বেশ কিছুটা দূরে রয়েছে বরগু। আজ তার

সাথে কুকুর দুটো নেই। ঠেলাটাও নেই। শুধু খাবারের ব্যাগটা হাতে।

ওর একশো গজের মধ্যে পৌঁছে গেছে অনুসরণকারীরা, এই সময় ঘুরলো বরগু। ঢুকে পড়লো একটা ছোট গলিতে। ওশন ফ্রন্ট আর স্পীডওয়েকে যুক্ত করেছে এই গলি।

'মুসা, জলদি যাও!' চেঁচিয়ে বললো কিশোর। 'চোখের আড়াল না হয়!'

'যাচ্ছি,' বলেই দৌড় দিলো মুসা।

যেখান থেকে অদৃশ্য হয়েছে বরগু, সেখানে পৌঁছে ঘুরে তাকালো স্পীডওয়ের দিকে। কিশোর আর রবিনের উদ্দেশ্যে একবার হাত নেড়ে ঢুকে পড়লো গলিতে।

চলার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে কিশোর।

'বরগু!' নিনা বললো, 'তাই, না? বরগুই!'

কিশোরের পেছনে প্রায় ছুটতে আরম্ভ করলো সে।

'নিনা, হয়েছে কি?' জিজ্ঞেস করলেন উত্তেজিত বোরম্যান। 'কিছু তো বুঝতে পারছি না!'

'বরগু! ইস্, আগেই আন্দাজ করা উচিত ছিলো আমার!'

গলির মুখে পৌঁছে গেল ওরা। দুটো বাড়ির মাঝে সরু পথ, কোণের কাছে সাইনবোর্ড: *ফেয়ার আইলস ওয়ে।*

স্পীডওয়ের ধারে অপেক্ষা করছে মুসা। ওদেরকে দেখে হাত নেড়ে আবার হাঁটতে শুরু করলো, প্যাসিফিক অ্যাভেনিউর দিকে।

দৌড় দিলো নিনা। অ্যাভেনিউর অর্ধেক যেতে না যেতেই মুসাকে ধরে ফেললো।

পুরানো একটা ভাঙা বাড়ির ঘাস-জন্মানো ড্রাইভওয়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা। 'ও বাড়িতে ঢুকেছে,' হাত তুলে বললো সে। 'কুত্তার ডাক শুনেছি।'

বারান্দায় বেরিয়ে এলো একজন বৃদ্ধ। দুজনকে দেখে জিজ্ঞেস করলো, 'কি চাই?'

ড্রাইভওয়ের দিকে এগোলো নিনা।

'দাঁড়াও!' চেঁচিয়ে উঠলো বৃদ্ধ। একটা দাঁতও নেই, ফলে উচ্চারণ অস্পষ্ট, কেমন জড়িয়ে যায় কথা। 'অন্যায় ভাবে ঢুকেছো! পুলিশ ডাকবো বলে দিলাম!'

পরোয়াই করলো না নিনা। কিশোর আর বোরম্যানও তার পিছু নিলেন।

আবার ঘেউ ঘেউ করে উঠলো কুকুর।

'এই, শুনছো!' চিৎকার করে বললো বৃদ্ধ। 'এটা আমার জায়গা, জোর করে ঢুকছো তোমরা! বেরোও!'

'কিটু-উ!' চেঁচিয়ে ডাকলো নিনা। 'কিটু-উ, কোথায় তুই?'

পেছনের উঠানে আগাছার ছড়াছড়ি। একপাশে কাত হয়ে গেছে পুরানো গ্যারেজটা। ওটার দরজার হাতল ধরে টান মারলো নিনা। মাটিতে ঘষা খেতে খেতে তার দিকে যেন ছুটে এলো পাল্লাটা।

ভেতরে আবছা অন্ধকার। অনেক শরীরের নড়াচড়া। ঘেঁক ঘেঁক করে নিনার দিকে তেড়ে আসতে চাইলো দুটো কুকুর। কিন্তু আটকালো বরগু। পেছনের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে আরেকটা ছোট্ট শরীর। ফ্যাকাসে মুখ, চোখ বড় বড় হয়ে গেছে।

'কিটু-উ!' বলে চেঁচিয়ে উঠে ছুটে গেল মা।

মুরগীর পা চিবোচ্ছিলো কিটু। ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লাফিয়ে উঠে ছুটে এলো মায়ের দিকে। জড়িয়ে ধরলো একে অন্যকে।

ছোট্ট একটা কাশি দিয়ে আরেক দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন বোরম্যান।

কুকুরগুলোকে শান্ত করলো বরগু। নিয়ে গেল গ্যারেজের কোণে। একটা দড়ির খাটিয়া রয়েছে ওখানে, তার ওপর বসে পড়লো সে। বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে মা-ছেলের দিকে। দিন কয়েকের জন্যে একটা বাচ্চাকে আপন করে পেয়েছিলো সে। একা হয়ে গেল আবার। তার মতো একজন মানুষকে বিষণ্ন করে দেয়ার জন্যে এটা যথেষ্ট।

আঠারো

খবর ছড়িয়ে পড়তে দেরি হলো না। ভিড় জমে গেল পথে। পুলিশ এলো। বরগুর হাতে হাতকড়া দিয়ে গাড়িতে তুলে নিয়ে গেল তারা।

'এবার কি করবো?' রবিনের প্রশ্ন। 'কিটু ট্রেজার রুমটা দেখে থাকলে বলে দেবেই।'

'তার আগেই হুঁশিয়ার হয়ে যাবে ক্যাম্পার। মালপত্র সব সরিয়ে ফেলবে অন্য কোথাও। বন্ধ ঘরে বাক্স ভর্তি টাকা আর দামী দামী জিনিসের কথা কে বিশ্বাস করবে তখন?'

'করবে না,' মাথা নাড়লো মুসা।

'কাজেই সেটা প্রমাণ করার দায়িত্ব আমাদের,' ঘোষণা করলো কিশোর। 'সান্তা মনিকায় একটা ছবি তোলার দোকান আছে, এক ঘন্টার মধ্যেই ফটো ডেভেলপ করে দেবে। রবিন, ক্যামেরাটা নিয়ে চলে যাও, ট্রেজার রুমে তোলা ছবিগুলো করিয়ে আনো। আমি আর মুসা যাচ্ছি ভেনিস লাইব্রেরিতে। ছবিগুলো নিয়ে ওখানে চলে এসো।'

রবিন রওনা হয়ে গেল উত্তরে ফটোর দোকানের দিকে। কিশোর আর মুসা চললো মেইন স্ট্রীটে, যেখানে রয়েছে ছোট লাইব্রেরিটা। যাওয়ার সময় একটা মস্ত বেলুন দেখে দাঁড়ালো দুজনে। নতুন একটা সুপার মার্কেট করা হয়েছে, ওটার পার্কিং লটে বেঁধে রাখা হয়েছে বেলুনটা, আজ মার্কেটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। বিজ্ঞাপন লেখা রয়েছে ঃ

প্রতি একশো জন খরিদ্দারের মধ্যে

লটারি করে যে কোনো একজনকে
বেলুনে করে বিনে পয়সায়
আকাশে ওড়ার সুযোগ দেয়া হবে।

'বাহ্, দারুণ তো!' হেসে মুসা বললো। বেলুনের গনডোলায় গিয়ে উঠছে কয়েকজন লোক, সেটা দেখছে সে।

'চলো, আমাদের কাজে যাই,' খানিকটা অসহিষ্ণু হয়েই হাত নাড়লো কিশোর।

লাইব্রেরিতে ঢুকেই পত্রিকা ঘাঁটতে বসলো সে, মুসা তাকে সাহায্য করলো। গত দুই হপ্তার কাগজ বের করলো ওরা, তখনও যেগুলোর মাইক্রোফিল্ম করা হয়নি।

'কি খুঁজছো?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'একটা চোরাই ছবির কথা পড়েছিলাম, কোন সংখ্যায় ঠিক মনে নেই। সেটাই খুঁজছি।'

লম্বা একটা রীডিং টেবিলে পত্রিকাগুলো এনে ফেললো ওরা। তারপর ছড়িয়ে নিয়ে দেখতে আরম্ভ করলো।

মুসার চোখে পড়লো প্রথমে। বলে উঠলো, 'এই তো!' কাগজটা কিশোরের দিকে ঠেলে দিলো সে।

পেইন্টিংটার একটা পরিষ্কার ফটোগ্রাফে দেখা যাচ্ছে—তৃণভূমিতে খেলছে কয়েকটা বাচ্চা ছেলেমেয়ে। মারমেড ইনে দেয়ালে ঝোলানো একটা ছবিতে এই দৃশ্য দেখেছে ওরা।

'ছবিটা দেখেই চেনা চেনা লাগছিলো তখন,' সন্তুষ্ট হয়ে বললো কিশোর।

ঘন্টাখানেক পরে এসে মুসা আর কিশোরকে লাইব্রেরিতেই পেলো রবিন। ছবি আর প্রতিবেদনটার ফটোকপি করে নিয়েছে কিশোর। প্রতিবেদন পড়ে জানা গেল বিখ্যাত চিত্রকর *ডেগার* আঁকা পেইন্টিং ওটা। তাঁর বিখ্যাত ছবি নয় এটা, তবু যথেষ্ট দামী। দিন কয়েক আগে আরও কিছু মূল্যবান জিনিস সহ ছবিটা চুরি গেছে একজন ধনী লোকের বাড়ি থেকে।

হাতের খাম থেকে ছবিগুলো টেবিলে ঢাললো রবিন। বেছে বেছে বের করলো একটা ছবি, পত্রিকার ছবিটার সঙ্গে অবিকল মিলে যায়।

'হুবহু এক,' মুসা বললো। 'কিন্তু ডেগার ছবির নকলও হতে পারে এটা। সব পেইন্টিঙেরই নকল পাওয়া যায়, তাই না?'

'যায়, বিখ্যাতগুলোর,' জবাব দিলো কিশোর। 'তবে আমি শিওর মারমেড ইনের ছবিটা আসল। ঘরের অন্যান্য জিনিসগুলোও চোরাই মাল। এইবার পুলিশকে জানানো যায়।'

লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে এলো তিন গোয়েন্দা। বাইরে তখন শেষ বিকেলের রোদ। আপনমনে শিস দিতে দিতে চললো কিশোর।

ভেনিস পুলিশ স্টেশনে এসে ঢুকলো ওরা। একজন অফিসারকে দেখে তার সঙ্গে কথা বলতে গেল কিশোর। অন্য দুজন দাঁড়িয়ে রইলো পেছনে।

ভূমিকা না করে কিশোর বললো, 'চোরাই একটা ছবির খবর দিতে পারি, ডেগার ছবি। কোথায় আছে ওটা জানি। কে চুরি করেছে, তা-ও আন্দাজ করতে পারি।'

ফটোকপি করে আনা পত্রিকার প্রতিবেদনটা দেখালো কিশোর, তারপর দেখালো রবিনের তুলে আনা ছবিটা। 'আজ বিকেলে তোলা হয়েছে এটা,' বললো সে।

দুটো ছবি ভালোমতো মিলিয়ে দেখলো অফিসার। মন্তব্য করলো না। ছেলেদেরকে নিয়ে এলো আরেকটা ছোট ঘরে, ওখানে একটা টেবিল ঘিরে কয়েকটা চেয়ার সাজানো রয়েছে। ওদেরকে ওখানে বসতে বলে চলে গেল।

খানিক পরেই এসে হাজির হলো একজন সাদা পোশাক পরা পুলিশের গোয়েন্দা। হাতে ফটোকপির কাগজ আর রবিনের তুলে আনা ছবিটা। অফিসার নিয়ে গিয়েছিলো ওগুলো।

'ইনটারেসটিং,' দুটোই দেখিয়ে এমনভাবে বললো ডিটেকটিভ, যেন মোটেও ইনটারেসটিং নয় ব্যাপারটা। 'দেখতে দুটো ছবি একই রকম। তবে তোমরা যেটা তুলে এনেছো, সেটা আসল না-ও হতে পারে। কোত্থেকে আনলে?' বলেই চোখ পড়লো রবিনের কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরার ওপর। 'তুমি তুলেছো, না?'

'হ্যাঁ, স্যার। মারমেড ইনের একটা ঘর থেকে।'

'মারমেড ইন? ওটা তো বহু বছর ধরে তালা দেয়া।'

কথা বললো কিশোর, 'সবাই তাই জানে বটে, কারণ মালিকের তা-ই ইচ্ছে। হোটেলের একটা স্যুইট এখনও নিয়মিত ব্যবহার হয়। নানারকম দামী দামী জিনিসে বোঝাই ওটা, চোরাই মাল। আমার বিশ্বাস, হোটেলটার বর্তমান মালিক ব্রড ক্যাম্পার এর সঙ্গে জড়িত। মনে হয় চোরাই মালের ডিলার সে, কারণ ওই ঘরে এক বাক্স ভর্তি টাকা দেখেছি।'

খামটা খুলে আরেকটা টেবিলে ছবিগুলো ঢেলে দিলো রবিন। তার মধ্যে একটা ছবিতে স্পষ্ট উঠেছে টাকার বাণ্ডিলের ছবি।

'হুম্‌ম্‌!' বলে মাথা দুলিয়ে, ছেলেদের আইডেনটিটি কার্ড দেখতে চাইলো ডিটেকটিভ। স্টুডেন্ট কার্ড বের করে দেখালো ওরা। তারপর কি মনে করে তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বের করে দিলো কিশোর।

গুঙিয়ে উঠলো ডিটেকটিভ। 'শখের গোয়েন্দা! আগেই আন্দাজ করা উচিত ছিলো আমার। এই বয়েসে অনেক ছেলেই গোয়েন্দা হতে চায়। অন্তত ভাবে, যে তারা গোয়েন্দা।'

'ভাবাভাবির মধ্যে নেই আমরা,' ভারিক্কি চালে বললো কিশোর। 'আমরা সত্যিই গোয়েন্দা। অনেক জটিল রহস্যের সমাধান করেছি। অনেক বড় বড় চোর

ডাকাতের কোমরে দড়ি পরিয়েছি...'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলো ডিটেকটিভ। উঠে দাঁড়ালো। 'বসো এখানে। আসছি।'

প্রতিবেদনের ফটোকপি আর ছবিগুলো নিয়ে চলে গেল লোকটা।

'কি করতে গেল?' মুসার প্রশ্ন।

'চোরাই মালের লিস্ট থাকে থানায়। ছবিগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে গেছে হয়তো। ফোন-টোন করে খোঁজ-খবরও নিতে পারে।'

'ক্যাম্পারকে না আবার করে বসে!' রবিন বললো।

'ক্যাম্পারকে?' উদ্বিগ্ন হয়ে বললো মুসা। 'কেন, তাকে করবে কেন?'

'কারণ তার হোটেলে চুরি করে ঢুকেছি আমরা, সেটা একটা অপরাধ। ইচ্ছে করলেই আটকে দিতে পারে আমাদেরকে পুলিশ। যদি হোটেলের কামরা থেকে জিনিসগুলো সরিয়ে ফেলে থাকে ক্যাম্পার, আর চোরাই মালের লিস্টের সঙ্গে না মেলে, তাহলে মরেছি!'

রবিনের কথার মানে বুঝে চুপ হয়ে গেল মুসা।

দীর্ঘ নীরবতার পর মুখ খুললো কিশোর, যেন মনের ভাবনাগুলোই মুখে উচ্চারণ করলো, 'যদি ক্যাম্পারকে ফোন করেই, তো কি করবে ক্যাম্পার? কিটু যদি ঘরটা দেখে থাকে...'

বাধা দিয়ে রবিন বললো, 'কিটু যে দেখেছেই, তার নিশ্চয়তা কি?'

'নিশ্চয়তা? আছে। এতো দামী দামী খাবার কেনার টাকা কোথায় পেলো বরগু? পেসট্রি, পিজা, চিকেন। আমার বিশ্বাস বাক্স থেকে কিছু টাকা তুলে নিয়ে এসেছিলো কিটু। কড়কড়ে নোট দেখেছে, ছেলেমানুষ, তুলে নিয়ে পকেটে ভরে ফেলেছে। টাকা দেখলে অনেক ছেলেই ওরকম করে। ওই টাকা দিয়েই তাকে খাবার কিনে এনে দিয়েছে বরগু।'

এক মুহূর্ত চুপ থেকে আবার ক্যাম্পারের কথায় ফিরে গেল কিশোর, 'হ্যাঁ, যা বলছিলাম, ক্যাম্পার কি করবে? আমার ধারণা, ও পালানোর চেষ্টা করবে। কারণ অপরাধীর মন সব সময়ই দুর্বল থাকে। ওর ব্যাপারেই একটা সহজ উদাহরণ ধরো—জলকন্যার মূর্তিটা ভাঙার পর আমরা হলে, কিংবা অপরাধী না হয়ে অন্য কেউ হলে কি করতো? ভাঙা টুকরোগুলো তুলে নিয়ে জাস্ট ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আসতো। সে করলো কি? অনেক সাবধানে লুকিয়ে লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেললো সাগরের পানিতে, যাতে কারও চোখে না পড়ে। কি দরকারটা ছিলো? সব কিছু গড়বড় হয়ে যাচ্ছে এখন। কিটু যদি মুখ খোলে, এই ভয়ে ওর মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করতে পারে এখুনি ক্যাম্পার।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল রবিন আর মুসার।

রবিন বললো, 'তার আগেই আমাদের কিছু করা দরকার!'

'এখুনি চলো!' বলেই দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল মুসা।

কিশোর আর রবিনও তার পিছু নিলো। ডিটেকটিভের ফিরে আসার অপেক্ষা করলো না আর ওরা।

উনিশ

ওশন ফ্রন্টে যখন পৌঁছলো তিন গোয়েন্দা, সাতটা বেজে গেছে। দিনের বেলা যে রকম ভিড় থাকে ডেনিসে, সেটা কমে এসেছে। স্পীডওয়েতে গাড়ি খুব কম। ওশন ফ্রন্টে ঘোরাঘুরি করছে অল্প কয়েকজন মানুষ।

বইয়ের দোকানের বাইরে গলিতে দাঁড়িয়ে আছে টেলিভিশনের একজন রিপোর্টার। কিটু আর নিনার সাক্ষাৎকার নিতে এসেছে। কিছু লোক ঘিরে দাঁড়িয়েছে তাদেরকে।

সেদিকে গেল না গোয়েন্দারা। ওদের একমাত্র ভাবনা, কিটুকে বাঁচাতে হবে। বিপদের খাঁড়া ঝুলছে ছেলেটার মাথার ওপর।

মারমেড ইনের কাছে চলে এলো ওরা। গ্যালারি বন্ধ। তবে কি ক্যাম্পার পালালো? অ্যাপার্টমেন্টের জানালায় পর্দা টানা। ভেতরে লোক আছে কিনা বোঝার উপায় নেই।

হঠাৎ করেই সামনের দিকের একটা পর্দা নড়ে উঠলো। ওশন ফ্রন্টের দিকে উঁকি দিলো বোধহয় কেউ।

'আছে! আছে!' বলে উঠলো মুসা।

'মনে হয় পালানোর তাল করছে,' কিশোর বললো। 'সিঁড়ি দিয়ে পেছনে গ্যারেজের কাছে নেমে যাবে।'

'তাহলে দাঁড়িয়ে আছি কেন?' তাগাদা দিলো রবিন।

চত্বরের উত্তর পাশ ঘুরে পেছনে চলে এলো ওরা। ঠিকই বলেছে কিশোর। বেরিয়ে এসেছে ক্যাম্পার। পেছনের সিঁড়ির মাথায় রয়েছে এখনও। হাতে একটা স্যুটকেস। ওখানেই দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকালো সে, তারপর আস্তে লাগিয়ে দিলো পাল্লাটা। তিন গোয়েন্দা আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে, ওদেরকে দেখতে পেলো না।

পেছনের গ্যারেজের দিকে এগোলো ক্যাম্পার। হাতে ঝুলছে চাবি। কিন্তু দরজার তালা খোলার আগেই বড় করে দম নিয়ে এগিয়ে গেল কিশোর। বললো, 'চলে যাচ্ছেন, মিস্টার ক্যাম্পার? খুব খারাপ কথা। আমরা ভাবছি এই কেসের একটা কিনারা করে দেবো।'

পাঁই করে ঘুরলো ক্যাম্পার। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার সুন্দর চেহারা। 'কেসের কিনারা তো করেই ফেলেছো। ছেলেটা ফিরে এসেছে। খুব চালাক তোমরা। কংগ্রাচুলেশন।'

'কিছু কথা বলার আছে আপনাকে, শুনবেন? নাকি কি বলবো বুঝে ফেলেছেন?

পানিতে যখন মূর্তির টুকরোগুলো ফেলেছিলেন, অবাক লেগেছিলো। তারপর হোটেলের ভেতরে যখন ট্রেজার রুমটা আবিষ্কার করলাম, বুঝে ফেললাম সব।'

ঢোক গিললো ক্যাম্পার। জিভ বোলালো শুকনো ঠোঁটের ওপর। ঠোঁটের কোণ কাঁপছে। কোনো কথা না বলে তাড়াতাড়ি তালা খোলার চেষ্টা করলো।

'না!' বলেই লাফ দিলো মুসা। প্রায় উড়ে গিয়ে পড়লো ক্যাম্পারের গায়ের ওপর। মাথা দিয়ে গুঁতো মেরে ফেলে দিলো লোকটাকে। হাতের চাবি গিয়ে ঝনঝন করে পড়লো স্পীডওয়েতে। চোখের পলকে ক্যাম্পারের পাশে চলে এলো কিশোর। রবিন চলে গেল রাস্তার ওপর। চাবিটা তুলে নিলো।

স্পীডওয়ে ধরে একটা গাড়ি এগিয়ে আসছে। কাছে এসে জানালার কাঁচ নামিয়ে দিলো চালক। জিজ্ঞেস করলো, 'এই যে ভাই, কি হয়েছে?'

প্রশ্নটা ক্যাম্পারকে করেছে, কিন্তু জবাবটা দিলো কিশোর, 'জলদি গিয়ে পুলিশে খবর দিন! কুইক!'

এক সেকেণ্ড দ্বিধা করলো লোকটা। তারপর গাড়ির গতি বাড়িয়ে গিয়ে মোড় নিয়ে উঠে গেল আরেকটা রাস্তায়।

'বিচ্ছুর দল!' উঠে দাঁড়িয়েছে ক্যাম্পার। গলা কাঁপছে তার।

'কি হয়েছে কিছুই জানে না লোকটা,' গাড়ির চালকের কথা বললো কিশোর। 'কিন্তু পুলিশকে খবর দিতেও পারে। আসার আগে পুলিশকে ট্রেজার রুমের কথা জানিয়ে এসেছি আমরা। লোকটার কাছে খবর পেলে চোখের পলকে এসে হাজির হবে। আপনার হাতে টাকা ভর্তি স্যুটকেস দেখলে কি ভাববে ওরা বলুন তো?'

ক্ষণিকের জন্যে ঝুলে পড়লো ক্যাম্পারের মাথা। যেন হাল ছেড়ে দিয়েছে। তারপর আচমকা সোজা হলো আবার। হাতে বেরিয়ে এসেছে একটা পিস্তল। 'বেশ, তোমরাও আসছো আমার সঙ্গে। পুলিশ এখানে এসে কাউকে পাবে না।'

পিস্তল আশা করেনি কিশোর, তৈরি ছিলো না। থমকে গেল তিনজনেই। আদেশ পালন না করে উপায় নেই। মরিয়া হয়ে উঠেছে ক্যাম্পার। পিস্তলটার কুৎসিত নলের দিকে তাকিয়ে একবার দ্বিধা করলো ওরা, তারপর গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এলো।

'আগে বাড়ো!' পিস্তল নাচিয়ে নির্দেশ দিলো ক্যাম্পার।

'গুলি আপনি করতে পারছেন না,' কিশোর বললো। 'যে কোনো মুহূর্তে পুলিশ এসে যেতে পারে।'

'আসুক। এখানে আমি আর থাকতে পারছি না কিছুতেই। কাজেই দেখে ফেললেও কিছু এসে যায় না। তোমাদের জিম্মি করে ওদের নাকের ওপর দিয়েই চলে যাবো। হাঁটো। প্যাসিফিক এভেন্যুতে যাবো আমরা। আমি থাকবো পেছনে। টু শব্দ করলে খুলি উড়িয়ে দেবো।'

আর কিছু বললো না ছেলেরা। ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করলো। পরের সরু গলিটা দিয়ে যাবে প্যাসিফিক এভেনিউতে।

'এই, নিগ্রো!' পেছন থেকে ধমকের সুরে বললো ক্যাম্পার, 'স্যুটকেসটা নাও। গায়ে তো মেলা জোর, কুলিগিরি একটু করো।'

স্যুটকেসটা হাতে নিলো মুসা। ক্যাম্পারের হাত এখন পকেটে। নিশ্চয় পিস্তলটা ধরে আছে। নলের মুখও যে ওদেরই দিকে, বুঝতে অসুবিধে হলো না তিন গোয়েন্দার।

'পালাতে আপনি পারবেন না,' কিশোর বললো। 'ইভলিন স্ট্রীটের বাড়িটার কথাও পুলিশকে বলে দিয়েছি আমরা।'

কথাটা মিথ্যে, কিন্তু বিশ্বাস করলো ক্যাম্পার। গাল দিয়ে উঠলো তিন গোয়েন্দাকে। তাড়াতাড়ি পা চালাতে বললো। প্যাসিফিক পেরিয়ে গিয়ে মেইন স্ট্রীটে উঠতে বললো।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ডুবন্ত সূর্যের সোনালি আলো এসে পড়েছে মেইন স্ট্রীটের বাড়িগুলোর জানালায়। এমনভাবে চমকাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন আগুন লেগেছে ওগুলোয়। সুপার মার্কেটের পার্কিং লটে বেলুনটাকে বাঁধছে বেলুন-চালক, আজকের মতো ওড়ানো শেষ।

ছেলেদেরকে সেদিকে এগোতে বললো ক্যাম্পার।

'আজ আর উড়ছি না, বুঝলেন,' ক্যাম্পারের উদ্দেশ্য বুঝে বললো বেলুন-চালক। 'কাল আসবেন। বেঁধে ফেলেছি, আর খুলতে পারবো না। রাতের বেলা হবে না।'

পিস্তলটা বের করে দেখালো ক্যাম্পার।

ভীত হাসি হাসলো চালক। 'না না, একেবারেই ওড়াতে পারবো না, তা বলিনি। বেশি জরুরী হলে…'

'জলদি করো!' কড়া গলায় ধমক দিলো ক্যাম্পার। 'চালাকির চেষ্টা করবে না। দ্বিতীয়বার আর হুঁশিয়ার করবো না আমি!' তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরে বললো, 'যাও, ওঠো!'

নীরবে একে একে গনডোলায় চড়লো কিশোর, মুসা, রবিন। বেলুনের নিচে ঝুলছে বিশাল ঝুড়ি। ওটাকে গনডোলা বলে। সব শেষে উঠলো ক্যাম্পার। বেলুন বাঁধা দড়িগুলো দেখিয়ে চালককে নির্দেশ দিলো, 'কাটো ওগুলো! জলদি!'

'আপনার ইচ্ছেটা বুঝতে পারছি না,' আমতা আমতা করে বললো চালক। 'অন্তত একটা দড়ি তো রাখতেই হবে। নইলে নামবো কি করে? আপনার ইচ্ছে মতো চলবে না এটা।'

অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়লো ক্যাম্পার। কড়া গলায় বললো, 'বেশি কথা বলো তুমি! যা বলছি করো। শেষ দড়িটা কেটে দিয়েই লাফিয়ে উঠে পড়বে। নইলে গুলি খাবে বলে দিলাম।'

'এসব না করলেও পারতেন,' পরামর্শ দিলো মুসা। 'ট্যাক্সি ধরে এয়ারপোর্ট কিংবা বাস স্টেশনে চলে যেতে পারেন…'

'চুপ!' ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিলো ক্যাম্পার।

চুপ হয়ে গেল মুসা। এক এক করে দড়ি কেটে দিতে লাগলো চালক। শেষ দড়িটা কেটে দিলে ওপরে উঠতে শুরু করলো বেলুন। নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই লাফ দিয়ে গনডোলায় চড়লো সে।

'বেশি দূর কিন্তু যাবে না,' উঠেই বললো। 'ওরকম করে তৈরি হয়নি। যদি সাগরের ওপর চলে যায়...'

'যাবে না। বাতাস উল্টোদিকে বইছে,' ক্যাম্পার বললো।

এখনো দেখা যাচ্ছে সূর্যটাকে, সাগরের দিগন্ত রেখার আড়ালে নেমে যাচ্ছে। লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছে বাড়িঘরের আশপাশে। রাস্তার আলো জ্বলে উঠেছে। হেডলাইট জ্বেলে দিয়েছে রাস্তায় চলমান গাড়িগুলো।

উঠছে...উঠছে...উঠছে বেলুন। গনডোলার কিনারের দড়ি আঁকড়ে ধরে রেখেছে ওরা। তাকিয়ে রয়েছে নিচের দিকে। বেয়াড়া ভাবে দুলছে গনডোলা, মোচড় দিয়ে ওঠে পেটের ভেতর। বেলুনে চড়া যতোটা আরামদায়ক ভাবতো মুসা, ততোটা আর মনে হলো না এখন।

নিচের দিকে তাকালো না ক্যাম্পার। কঠিন দৃষ্টিতে বার বার তাকাচ্ছে তিন গোয়েন্দা আর চালকের দিকে।

কয়েক শো ফুট ওপরে উঠে এসেছে বেলুন। উত্তর-পুবে ওটাকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে বাতাস। নিচে তাকালো কিশোর। ঠিক ওদের নিচেই দেখা যাচ্ছে একটা গাড়ি। সাদা ছাত দেখেই বোঝা গেল পুলিশের গাড়ি।

স্যুটকেসটা নামিয়ে রেখেছে মুসা। পা দিয়ে সেটাকে ঠেলে দেখলো কিশোর। পুরানো ধাঁচের জিনিস। আলগা তালা লাগিয়ে বন্ধ করার ব্যবস্থা। তালা নেই, তারমানে খোলা। ক্যাম্পারের অলক্ষ্যে জুতোর ডগা দিয়ে আস্তে আস্তে তুলে ফেললো হুড়কোটা। তারপর হঠাৎ ঝুঁকে একটানে তুলে নিলো স্যুটকেস। ঝটকা লেগে আপনাআপনি খুলে গেল ডালা। ওই অবস্থায়ই ওটাকে গনডোলার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো সে।

'এই, কি করছো...' ক্যাম্পার বলতে বলতেই কাজটা সেরে ফেললো কিশোর।

বাতাসে উড়তে লাগলো নোটের বাণ্ডিল...দশ...বিশ...পঞ্চাশ...একশো ডলারের নোট। কোনো কোনোটার রবার ব্যাণ্ড খুলে ছড়িয়ে পড়লো।

নেমে যাচ্ছে টাকা!

রাস্তায় গিয়ে পড়তে লাগলো।

লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো পুলিশ। রাস্তার অন্যান্য গাড়িগুলোও থেমে গেল। বেরিয়ে আসতে লাগল লোকে।

সাইরেন বেজে উঠল। আরেকটা পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়ালো প্রথমটার কাছে। সবাই এখন তাকিয়ে আছে ওপর দিকে, বেলুনটাকে দেখছে।

'মিস করবে না পুলিশ,' শান্তকণ্ঠে বললো কিশোর। 'দেখতে পাবেই আমাদের। বেলুন থেকে টাকা ছিটানোর বিরুদ্ধে অবশ্য কোনো আইন নেই। তবে প্রশ্ন জাগবেই ওদের মনে। নজর রাখবে পুলিশ। বেলুনটা নামলেই এসে ছেঁকে ধরবে, যেখানেই নামুক।' শেষ বাক্যটা বললো নাটকীয় ভঙ্গিতে, 'আর নামবেই এটা, মিস্টার ক্যাম্পার। কারণ মানুষের তৈরি কোন কিছুই চিরকাল আকাশে ওড়ে না।'

কিছুই বললো না ক্যাম্পার।

অনেক পেছনে পড়েছে এখন পুলিশের গাড়ি দুটো। রাস্তায় আরও পুলিশের গাড়ি দেখা যাচ্ছে। সাইরেন বাজিয়ে, ছাতে বসানো ফ্ল্যাশ লাইট জ্বেলে ছুটে যাচ্ছে ওগুলো প্রথম দুটোর কাছে।

শোনা গেল একটা নতুন শব্দ। ওপর থেকে বেলুনের ওপর এসে পড়লো উজ্জ্বল সার্চ লাইটের আলো।

'পুলিশের হেলিকপ্টার,' হাসি হাসি গলায় বললো কিশোর, বেশ উপভোগ করছে ব্যাপারটা।

কথা নেই ক্যাম্পারের মুখে। হাঁপাচ্ছে এমন ভাবে, যেন বহুদূর দৌড়ে এসেছে।

বলতে থাকল কিশোর, 'পিছু লেগে থাকবে পুলিশ। রেডিওতে যোগাযোগ রাখবে হাইওয়ে পেট্রোলের সঙ্গে। শহর থেকে বেলুনটা বেরিয়ে গেলেও অসুবিধে নেই। শেরিফের কাছে খবর চলে যাবে। মোট কথা, কিছুতেই আর পিছু ছাড়ছে না আইনের লোকেরা।'

'ঠিকই বলেছে ও, মিস্টার,' ক্যাম্পারকে বললো চালক। 'অহেতুক দেরি করে লাভ নেই। নামিয়ে ফেলি, সে-ই ভালো।'

জবাব দিলো না ক্যাম্পার। তবে পিস্তলটা নামিয়ে ফেললো। ওটা তার হাত থেকে নিয়ে নিলো চালক, বাধা দিলো না অভিনেতা।

উইলশায়ার বুলভারের উত্তরে একটা গোরস্থানের মধ্যে নামলো বেলুন। গনডোলা মাটি ছুঁতে না ছুঁতেই ঘিরে ফেললো পুলিশ।

হেসে বললো রবিন, 'টেলিভিশনের লোকে খবর পায়নি। তাহলে শেষবারের মতো একবার টিভির পর্দায় চেহারা দেখানোর সুযোগ পেতেন মিস্টার ক্যাম্পার।'

হেসেই জবাব দিলো কিশোর, 'সেটা পারবেন। সময় এখনও ফুরিয়ে যায়নি। ঠিকই হাজির হয়ে যাবে টিভির রিপোর্টার।'

বিশ

চারদিন পর। বিখ্যাত চিত্র পরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে এলো তিন গোয়েন্দা, তাদের *জলকন্যা* কেসের রিপোর্ট দিতে।

ফাইলটা আগাগোড়া মন দিয়ে পড়লেন পরিচালক। তারপর মুখ তুলে একটা

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'খুবই দুঃখজনক! একটা বাচ্চার জন্যে নিজের জীবনের ওপর এতোবড় ঝুঁকি নিলো মানুষটা! ভালোবাসা এমনই জিনিস! আর আরেকজনের হলো লোভ। লোভের জন্যে, কিছু জিনিস বাঁচানোর জন্যে বিপজ্জনক হয়ে উঠলো বাচ্চাটার কাছে।' টেবিলের ওপর দুই হাত বিছিয়ে তালুর দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ তিনি। আবার মুখ তুললেন। 'চোরাই জিনিসগুলো কি মালিককে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে?'

'কিছু কিছু হয়েছে,' রবিন বললো। 'যেগুলোর মালিককে পাওয়া গেছে। অনেক ধন্যবাদ পেয়েছি আমরা,' হাসলো সে। 'মালিকদের কাছ থেকে তো বটেই, পুলিশের কাছ থেকেও।'

'পাবোই,' মুসা বললো। 'আমাদের দেয়া তথ্য অনেক কাজে লেগেছে পুলিশের। ইভলিন স্ট্রীটের বাড়িটায় তল্লাশি চালিয়েছে ওরা। একটা পেশাদার চোরকে বমাল গ্রেপ্তার করেছে ওখান থেকে।'

'সব বলে দিয়েছে সে,' মুসার কথার পিঠে বললো রবিন। 'পুলিশ জেনেছে, হলিউডের বড় বড় পার্টিতে দাওয়াত পড়তো ক্যাম্পারের। অভিনয় ছেড়ে দিলেও চিত্রজগৎ ছেড়ে আসেনি সে। যোগাযোগ ছিলো। ওসব দাওয়াতে গিয়েই লোকের বাড়ির জিনিসপত্র দেখে আসতো। খোঁজখবর করে আসতো কোথায় আছে বার্গলার অ্যালার্ম, চোর ঠেকানোর আর কি কৌশল করা হয়েছে। কারা কখন বাড়ি থাকবে, কারা বেড়াতে যাবে, বাড়িতে কতোজন লোক আছে, কে কখন থাকে, সব জেনে আসতো। পেশাদার চোরদেরকে এসব তথ্য সরবরাহ করতো সে। এমনকি এ-ও বলে দিতো, কোন কোন জিনিস চুরি করতে হবে।

'যেসব জিনিস তার প্রয়োজন, সেসব কিনে নিতো চোরদের কাছ থেকে। বেশি দামী আর কিছুটা দুর্লভ জিনিস ছাড়া নিতো না। চোরকে কাছ থেকে জিনিস কিনতে নগদ টাকার দরকার হয়, চেকফেক নিতে চায় না চোর। কাজেই বাক্স বোঝাই করে নগদ টাকা রেখেছে ক্যাম্পার। ইভলিন স্ট্রীটের বাড়িটা চোরের আড্ডা, চোরাই মালের গুদামও ওটা। ওখানে জিনিস কিনতে যেতো সে। তারপর শহরে গিয়ে চড়া দামে ওগুলো আবার বিক্রি করতো। বিক্রি করে দেয়ার জন্যে দালালও রেখে-ছিলো। কিছু কিছু জিনিস নিজেই বিক্রি করে ফেলতো তার গ্যালারিতে রেখে।'

'ঝুঁকিটা খুব বেশি নিয়ে ফেলেছিলো না?' মিস্টার ক্রিস্টোফার বললেন। 'চোরেরা জানলেই তো ব্ল্যাকমেল শুরু করে দিতো।'

'আসলে ওরা জানতোই না ক্যাম্পার তাদের জিনিস কেনে,' অনেকক্ষণ পর মুখ খুললো কিশোর। 'ছদ্মবেশ নিয়ে তারপর ওদের কাছে যেতো সে। আর নিজে গিয়ে দেখা করতো ওদের সঙ্গে, কখনোই তার কাছে কাউকে আসতে দিতো না। কোথায় থাকে, ঠিকানাও দিতো না।'

'হুঁ, চালাক লোক। কিটু গিয়ে ট্রেজার রুমে ঢুকেই দিলো তার সর্বনাশ করে।'

'হ্যাঁ। কিটু সব বলে দিয়েছে। প্যারেডের দিন প্রিন্সেস স্যুইটে ঢুকেছিলো সে। জিনিসগুলো দেখেছে। বাক্সের ডালা খুলে একটা বাণ্ডিল সবে তুলেছে, এই সময় ঢুকেছে ক্যাম্পার। ভয় পেয়ে ডবকে নিয়ে দৌড় দেয় কিটু। তার পেছনে ছোটে ক্যাম্পার। গ্যালারিতে এসে জলকন্যার পেছনে লুকায় কিটু। কুকুরটাও লুকাতে এসে দেয় ঘাপলা বাধিয়ে। ধাক্কা দিয়ে মূর্তিটা ফেলে দেয়। তার গায়ের ওপর পড়ে ভেঙে যায় জলকন্যা। আঘাত অল্পই লাগে কুকুরটার শরীরে। কিন্তু শক সইতে পারেনি তার দুর্বল হার্ট। মারা পড়ে। নিজেকে ভীষণ অপরাধী ভাবতে আরম্ভ করে কিটু, ক্যাম্পারের ঘর থেকে পালিয়ে গিয়ে লুকায় পিয়ারে। বরগু তাকে দেখে বাড়ি নিয়ে যায়। অভয় দেয়, লুকিয়ে রাখে।'

'বেচারা!' আফসোস করলেন পরিচালক।

'ট্রেজার রুমটা যদি কিটু দেখে না ফেলতো, অসুবিধে হতো না ক্যাম্পারের। নিনা হারকারকে বলে শাসন করাতে পারতো ছেলেটা। কিটু হারিয়ে যাওয়ায় ভয়ে ভয়ে ছিলো সে, কখন ফিরে এসে সব কিছু বলে দেয় ছেলেটা।'

'অপরাধ কোনো সময় চাপা থাকে না। হ্যাঁ, ডিগার আর তার রুমমেটের খবর কি? ওরাও কি কোনোভাবে জড়িত ছিলো ক্যাম্পারের সঙ্গে?'

'না। ডিগারটা একটা ছিঁচকে চোর। তার রুমমেটটা সাধারণ শ্রমিক, স্লেভ মার্কেটে গিয়ে কাজ জোগাড় করে। বড় জিনিস, কিংবা বেশি মাল সরানোর প্রয়োজন পড়লে স্লেভ মার্কেটে চলে যেতো ক্যাম্পার, ট্রাকসহ শ্রমিক ভাড়া করতো।'

'হুঁম্‌ম্! তো, বরগুর খবর কি? পুলিশ কি এখনও আটকে রেখেছে তাকে?'

'না। তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনেনি নিনা হারকার। বরং পুলিশকে অনুরোধ করে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছে,' কিশোর বললো। 'আবার আগের জায়গায় ফিরে এসেছে বরগু। জঞ্জাল সাফ করে, কুকুরদুটোকে সঙ্গে নিয়ে। কিটুও ভালো আছে। আসছে সেপ্টেম্বরেই তাকে ইস্কুলে ভর্তি করে দেয়া হবে।'

'এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে তার মা,' মৃদু হাসলেন পরিচালক। 'কোথায় গেল, কোথায় গেল, ভেবে আর সারাক্ষণ তটস্থ থাকতে হবে না।'

'না, হবে না,' একমত হলো তিন গোয়েন্দা।

'এবার তোমাদের জন্যে আইসক্রীম দিতে বলি, কি বলো?'

মুহূর্ত দ্বিধা না করে একমত হলো মুসা। দুই কানের গোড়ায় গিয়ে ঠেকেছে তার হাসি।

—ঃ শেষ ঃ—

বেগুনী জলদস্যু

প্রথম প্রকাশ ঃ অক্টোবর ১৯৯১

ঘড়ির অ্যালার্মের তীক্ষ্ণ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল মুসার। চোখ মেলে গুঙিয়ে উঠলো সে। গরমের ছুটির দ্বিতীয় সপ্তাহ সবে শুরু হয়েছে। এরই মাঝে বিরক্ত হয়ে উঠেছে কাজ করতে করতে। মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে এখন। ইস্, কেন যে পড়শীদের বাগান সাফ করার দায়িত্বটা নিলো! না নিয়েও অবশ্য উপায় ছিলো না। রবিন আর কিশোরের সঙ্গে ডিজনিল্যাণ্ডে যাবার কথা, অথচ তিন গোয়েন্দার ফাণ্ড প্রায় শূন্যের কোঠায় ঠেকেছে। ডিজনিল্যাণ্ডে যাওয়ার খরচই নেই, তার ওপর পড়ে আছে লম্বা ছুটিটা। টাকা খুব দরকার। অন্য দু'জনও বসে নেই। রবিন লাইব্রেরিতে ওভারটাইম করছে। কিশোর খাটছে ওদের ইয়ার্ডে, বাড়তি সময়।

আরেকবার গুঙিয়ে উঠে বিছানা থেকে নামলো মুসা। তাড়াহুড়ো করে কাপড় পরে নিচে রান্নাঘরে এসে দেখলো টেবিলে বসে গেছেন তার বাবা মিস্টার আমান।

'কিরে, এতো তাড়াতাড়ি?' হেসে জিজ্ঞেস করলেন বাবা।

'আর কি! বাগান সাফ!' গোঁ গোঁ করে বলে রেফ্রিজারেটরের দিকে এগোলো মুসা, কমলার রস বের করবে।

'টাকার দরকার, না? সহজ একটা উপায় বাতলে দিতে পারি।' হলদে একটা কাগজ টেবিলের ওপর দিয়ে ঠেলে দিলেন মিস্টার আমান। 'গতরাতে মেলবক্সে ফেলে গেছে এটা।'

চেয়ারে বসলো মুসা। কমলার রস খেতে খেতে চোখ বোলালো কাগজের লেখায়। একধরনের বিজ্ঞাপন। স্থানীয় বিজ্ঞাপন কোম্পানি বাড়ি বাড়ি দিয়ে যায়। পড়তে পড়তে উত্তেজিত হয়ে উঠলো মুসা। লেখা রয়েছেঃ

আপনি কি অভিযানপ্রিয়? ঐতিহাসিক?
বইয়ের পোকা? জলদস্যুদের বংশধর? তাহলে
আপনার জন্যে সুখবর আছে!
ডাকাত, জলদস্যু, ছিনতাইকারী, ঠগ, চোর,
এদের ব্যাপারে কি কোনো গল্প জানা আছে আপনার?
সত্যি ঘটনা? তাহলে আসুন আমাদের কাছে।

প্রতিটি গল্পের জন্যে ২৫ (পঁচিশ) ডলার
করে পাবেন। তবে শুধু ক্যালিফোর্নিয়ার কাহিনী বলতে
হবে, আর কোনো জায়গার হলে চলবে না। এবং
এই গল্প নেয়া হবে জুন ১৮ থেকে ২২ তারিখ,
সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
যোগাযোগের ঠিকানাঃ ১৩১২ ডি লা ভিনা স্ট্রীট।

'খাইছে!' বলে উঠলো মুসা। 'টাকা দিয়ে ভরে ফেলা যাবে! অনেক গল্প জানি আমরা। বিশেষ করে কিশোর আর রবিন। এখুনি যাচ্ছি, দেখাতে। আজ আঠারো, আটটা বেজে গেছে।'

'আরে বসো, বসো,' হাত তুললেন মিস্টার আমান। 'কোটিপতি পরেও হতে পারবে। নাস্তাটা আগে শেষ করো।'

'বাবা, অনেক কাজ! আগে লনে পানি দিতে হবে...'

'পেট খালি থাকলে কোনো কাজই করা যায় না। শেষ করো। তোমাকে তো খাওয়ার কথা এতো বলতে হয় না...'

'কিন্তু বাবা...,' থেমে গেল মুসা। হাল ছেড়ে দিয়ে বললো, 'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

বাবার ঠেলে দেয়া ভাজা গরুর মাংসের প্লেটটা টেনে নিলো সে। দ্রুতহাতে রুটি কেটে খাওয়া শুরু করলো। দেখতে দেখতে শেষ করে ফেললো পুরো প্লেট। এরপর ডিম ভাজি। চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল চারটে ডিম। একটা ফ্রুটকেকের অর্ধেকটা শেষ করে ঢকঢক করে পানি খেলো এক গেলাস। উঠে দাঁড়িয়ে ঝুড়ি থেকে একটা আপেল তুলে নিতে নিতে বললো, 'হয়েছে তো?'

মা কাজ করছেন রান্নাঘরে। খুটখাট আওয়াজ হচ্ছে। সেদিকে একবার তাকালো মুসা। এখন পালাতে পারলে বাঁচে। বেরিয়ে এসে যদি আবার কোনো কাজ চাপিয়ে দেন?

মুচকি হাসলেন মিস্টার আমান। 'হ্যাঁ, চলবে। দুপুর পর্যন্ত থাকতে পারবে।'

বিজ্ঞাপনটা হাতে নিয়ে প্রায় ছুটে ঘর থেকে বেরোলো মুসা। পাশের বাড়ির লনে পানি দিলো। অধৈর্য হাতে সাফ করলো মরা পাতা আর শুকনো ডাল। তারপর সাইকেল নিয়ে চললো কিশোরদের বাড়িতে, অর্থাৎ স্যালভিজ ইয়ার্ডে। সবুজ ফটক এক দিয়ে ঢুকলো ভেতরে, কিশোরের ব্যক্তিগত ওয়ার্কশপে। আরও দুটো সাইকেল দেখা গেল, তার মানে রবিন আর কিশোর আছে। ওগুলোর পাশে নিজেরটাও রেখে দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে হেডকোয়ার্টারে ঢুকলো সে। হাতের কাগজটা নেড়ে চেঁচিয়ে বললো, 'এই দেখো, কি এনেছি!'

বলেই চুপ হয়ে গেল। ডেস্কের কাছে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। রবিন হেলান দিয়ে রয়েছে একটা ফাইলিং কেবিনেটে। দু'জনের কাছেই দুটো হলদে কাগজ,

একই রকম।

'পাঁচ মিনিট আগে এসেছি আমি, সেকেণ্ড,' রবিন বললো। 'তোমার মতোই সাংঘাতিক খবর নিয়ে!'

'আমি সকালেই পেয়েছি,' কিশোর জানালো, 'ডাকবাক্সে। মনে হচ্ছে টাকা কামানোর আগ্রহ আমাদের তিনজনের একই রকম।'

একটা আর্মচেয়ারে প্রায় এলিয়ে পড়লো মুসা। 'আল্লাহ···কাজ করতে করতে বিরক্ত হয়ে গেছি।'

'সত্যি সত্যি কাজ করলে কখনও বিরক্তি আসে না কারও,' শুধরে দিলো কিশোর। চেয়ারে বসলো। 'বড়জোর ক্লান্তি আসে। সেটাই হয়েছে আমাদের। বুঝতে পারছি, জলদস্যুরা উদ্ধার করবে এবার।'

'সহজ পথে টাকা উপার্জন,' বিড়বিড় করলো রবিন।

'কাদের গল্প বলবো?' মুসা জিজ্ঞেস করলো।

'কেন, অনেকেই তো আছে,' জবাব দিলো কিশোর। 'ফরাসী জলদস্যু ডা বুচার্ডের কথা বলা যায়। ক্যালিফোর্নিয়ার ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে সে।'

মাথা দোলালো মুসা। 'হ্যাঁ। এল ডিয়াবলোর কথাও বলতে পারি আমরা।'

'পারি,' একমত হলো রবিন। 'এরপর আছে ডন সেবাসটিয়ান অ্যালভারো।'

'বিখ্যাত আরেকজন আছে,' কিশোর বললো। 'ডা বুচার্ডের পর উদয় হয়েছিলো। উইলিয়াম ইভানস, বেগুনী জলদস্যু নামেই বেশি পরিচিত।' মেরামত করে চালানো পুরনো গ্র্যাণ্ডফাদার ঘড়িটার দিকে তাকালো সে। 'তবে এসব গল্প এখানকার অনেকেরই জানা। বলতে হলে তাড়াতাড়ি যেতে হবে আমাদের। কেউ বলে ফেলার আগে।'

আবার ওয়ার্কশপে বেরিয়ে এলো ওরা। বেরিয়েই শুনলো ডাক, 'কিশোর, ও কিশোর, কোথায় গেলি?'

'মেরিচাচী!' আঁতকে উঠলো রবিন।

'নিশ্চয় অনেক কাজ জমিয়েছে!' চেঁচাতে গিয়েও কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ফেললো মুসা।

ফ্যাকাশে হয়ে গেছে কিশোরের মুখ। 'আজ আর কিছু করতে পারবো না! জলদি পালাও!' মেরিচাচী ওয়ার্কশপে ঢোকার আগেই সবুজ ফটক এক দিয়ে বেরিয়ে পড়লো তিনজনে।

সাইকেল চালাতে চালাতে রবিন বললো, 'চিনি জায়গাটা। পুরনো স্প্যানিশ স্টাইলের চত্বর ঘিরে ইঁটের দেয়াল। একধারে কয়েকটা দোকান আছে। বেশির ভাগই এখন খালি।'

'সে-জন্যেই হয়তো জায়গাটা বেছে নিয়েছে ওরা,' বিজ্ঞাপন দিয়েছে যারা তাদের কথা বললো কিশোর। 'সস্তায় পাবে। তাছাড়া ভিড়টিড়ও কম। আরামে

ইন্টারভিউ নিতে পারবে।'

ডি লা ভিনা স্ট্রীটে উঠলো ওরা। ১৩০০ নম্বর ব্লকের কাছে থাকতেই চোখে পড়লো জনতার ভিড়। প্রতি মিনিটে বাড়ছে। রবিন যে দেয়ালটার কথা বলেছে, তার ভেতরে ঢোকার কাঠের গেটটা বন্ধ। দেয়ালে বড় করে নম্বর লেখা রয়েছেঃ ১৩১২।

চিন্তিত ভঙ্গিতে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে কিশোর বললো, 'বড় মানুষ খুব কমই আছে। আজ কাজের দিন, অফিস-আদালত সব খোলা। আসবে ওরাও, ছুটি হলে। আমাদের জন্যে এই সময়টাই সুবিধে।'

পথের পাশের একটা লোহার রেলিঙে শেকল ঢুকিয়ে সাইকেলে তালা দিলো তিনজনে। খুলে গেল কাঠের দরজা। বেরিয়ে এলেন একজন চটপটে মানুষ। শাদা চুল। পুরু গোঁফ দেখলে মনে হয় নাকের নিচে ছোটখাটো দুটো ঝোপ ঝুলে রয়েছে, মানুষটার ছোট্ট শরীরের তুলনায় বেঢপ আকার। গায়ে টুইডের জ্যাকেট, পরনে ঘোড়ায় চড়ার উপযোগী পাজামা, পায়ে বুট, গলায় বাঁধা সিল্কের রুমাল, হাতে একটা বেত—ঘোড়া চালানোর সময় প্রয়োজন হয়। সব কিছু দেখে মনে হয় প্রাচীন অশ্বারোহী বাহিনীর একজন সৈনিক জ্যান্ত হয়ে উঠে এসেছে। ভিড়ের দিকে তাকিয়ে চাবুকটা তুললেন তিনি, চুপ করার নির্দেশ।

'আমার নাম মেজর নিরেক। পাইরেটস সোসাইটি অভ জাস্টিসে আসার জন্যে স্বাগত জানাচ্ছি সবাইকে। সবার কথাই শুনবো আমরা। তবে আজ এতো বেশি চলে এসেছো, শুনে শেষ করতে পারবো না একদিনে। যারা কাছে থেকে এসেছো, তারা ফিরে যাও। আরেক দিন এসো। রকি বীচের বাইরে থেকে যারা এসেছো, তারা শুধু থাকো।'

হতাশার তীব্র গুঞ্জন বয়ে গেল জনতার মাঝে। ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে গেল। দরজার কাছে পিছিয়ে গিয়ে পাল্লাটা লাগিয়ে দিলেন মেজর নিরেক। দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে কথা বলার চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু কেউ শুনতে চাইলো না। ভীষণ হৈ-হট্টগোলে চাপা পড়ে গেল তাঁর কথা।

নানারকম প্রতিবাদঃ

'ইয়ার্কি পেয়েছো?'

'আসতে বলে এখন চলে যাওয়ার কথা!'

'শয়তানি ঘুচিয়ে দেবো, বেশি বেশি করলে!'

'এসেছি ফিরে যাওয়ার জন্যে?'

আরও নানারকম কথা, গালাগাল হজম করতে হলো মেজরকে। সতেরো আঠারো বছরের ছেলেগুলোই বাড়াবাড়ি করছে। তাদের দিকে বেত তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'এই ভাগো, ফাজিলের দল!'

আরও রেগে গেল ওরা। একটা ছেলে এসে টান দিয়ে বেতটা কেড়ে নিতে

চাইলো। আরও কয়েকজন এগিয়ে এলো তিনদিক থেকে, মেজরকে মারার জন্যে। রক্ত সরে গেল তাঁর মুখ থেকে। চিৎকার করে সাহায্য চাইলেন, 'বাঁচাও, রিগো, বাঁচাও!'

দেয়ালের ভেতর থেকে কেউ বেরোলো না।

তিনদিক থেকে চেপে আসছে রেগে যাওয়া, উত্তেজিত জনতা।

দুই

'বাঁচাও!' আবার চিৎকার করলেন মেজর। এগিয়ে আসছে জনতা। 'রিগো, বাঁচাও!'

কিশোরের দিকে তাকালো মুসা। 'দেরি হয়ে যাচ্ছে! মেজরকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া দরকার!' বলেই আর দাঁড়ালো না সে। ছুটে গিয়ে একলাফে চড়লো পার্ক করে রাখা একটা গাড়ির ছাতে। চেঁচিয়ে বললো, 'পুলিস! পুলিস আসছে!'

ঝট করে ফিরে তাকালো গেটের কাছে চলে যাওয়া কয়েকটা ছেলে। কিশোর আর রবিন ততোক্ষণে প্রায় পৌঁছে গেছে মেজরের কাছে।

'চলো, ভাগি!' বলেই ছাত থেকে লাফিয়ে নেমে রাস্তার দিকে দৌড় দিলো মুসা। কয়েকটা ছেলে ছুটলো তার পেছনে, বাকিরা দাঁড়িয়ে রইলো, দ্বিধা করছে। ধাক্কা দিয়ে কাঠের গেটটা ফাঁক করে ফেললো রবিন।

'আসুন, স্যার,' বলে ঠেলে মেজরকে সেই ফাঁকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো কিশোর।

মেজরকে নিয়ে চত্বরে ঢুকে পড়লো দু'জনে। খানিক পরেই সেখানে এসে হাজির হলো মুসা। আর কেউ ঢুকে পড়ার আগেই ঠেলে বন্ধ করে দিলো ভারি গেটটা। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছেন নিরেক।

'রিগো!' গর্জে উঠলেন তিনি। 'গেল কোথায় শয়তানটা!'

অনেক কাল আগে বড় বড় পাথর বসিয়ে তৈরি করা হয়েছিলো এই চত্বর। মাঝে মাঝে ফাঁক, সেখানে লাগানো হয়েছিলো পিপুল আর জ্যাকারাণ্ডা গাছের চারা, সেগুলো বড় হয়েছে এখন। ফুলের ঝাড়ে প্রায় ঢাকা পড়েছে উঁচু দেয়াল। উজ্জ্বল রঙের ফুল ফুটেছে। চত্বরের দূর প্রান্তে একসারি দোকান। সবগুলোই খালি মনে হচ্ছে। নিঃসঙ্গ, ছোট একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে ওগুলোর সামনে।

জ্যাকেটের পকেট থেকে লাল একটা রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলেন মেজর। 'অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে। পুলিসও চলে এসেছে। ধরে নিয়ে গিয়ে এখন গারদে ভরবে ব্যাটাদের।'

হাসলো মুসা। 'পুলিস আসেনি, স্যার। ফাঁকি দিয়েছি ওদের। ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর জন্যে।'

'তাই নাকি? সাংঘাতিক চালাক ছেলে তো তুমি! ভালো। তোমার গল্পই আগে

শুনবো, যেখানেই থাকো না কেন। রিগো! গেল কোথায় গাধাটা! এই রিগো, জলদি শুনে যাও!'

ওদের গল্প শুনতে রাজি হওয়ায় তাঁকে ধন্যবাদ দিলো রবিন আর মুসা।

কিন্তু কিশোর তেমন খুশি হতে পারলো না। ভুরু কুঁচকে বললো, 'বাইরের ওরা খুশি হবে না একথা শুনলে।'

'না হলে না হোক। কয়েকটা বাচ্চার ভয়ে কাবু হয়ে যাবো? অসম্ভব! রিগো! বলদটাকে নিয়ে আর পারা গেল না! কোথায় গেল?'

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল একটা দোকানের দরজা। বেরিয়ে এলো বিশালদেহী এক লোক, যেন একটা ছোটখাটো হাতির বাচ্চা। বিচিত্র ভঙ্গিতে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে এলো মেজরের দিকে। শোফারের পোশাক পরনে, লাগেনি ঠিকমতো, ছোট হয়েছে। গোল মুখটা দেখে বয়স বোঝার উপায় নেই। লালচে ঘন চুলের ওপর বসানো শোফারের টুপিটাও ঠিকমতো লাগেনি, যেন অসহায় ভঙ্গিতে আঁকড়ে ধরে আছে চুল, পড়ে যাওয়ার ভয়ে। নীল চোখে ভয়। 'স-স-সরি, মে-মে-মেজর!'

'এই গরু, ছিলে কোথায়? আরেকটু হলেই তো মেরে ফেলেছিলো আমাকে!'

'ছিলাম না···মানে এখানে ছিলাম না! কাজ করছিলাম! টেপ রেকর্ডারটা ঠিক করে রাখছিলাম। অযথা গালাগাল করছিলো টনি। আপনার ডাক শুনতে পাইনি···'

'তা শুনবে কেন!' খেঁকিয়ে উঠলেন মেজর। 'এখন যাও। গিয়ে বলো ওদেরকে, দশ মিনিটের মধ্যেই গেট খুলছি। লাইন দিয়ে দাঁড়াতে বলো। ভালো করে বুঝিয়ে বলে দেবে, শহর এলাকার মধ্যে থাকে এমন কারো ইন্টারভিউ নেয়া হবে না আজ। শুধু শহরের সীমানার বাইরের···'

বাধ্য ছেলের মতো হেলেদুলে গেটের দিকে এগোলো রিগো। দরজা খুলতেই হৈ হৈ করে উঠলো জনতা। মেজর আবার বেরোচ্ছেন ভেবে ছুটে আসতে যাচ্ছিলো, কিন্তু রিগোকে দেখে থমকে গেল। হাসলেন নিরেক। 'ওকে দেখলেই অনেক গোলমাল থেমে যায়।'

'থামবেই,' বললো রবিন।

'আমার তো মনে হয়, ট্যাংক থামিয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখে,' মুসা বললো।

'তা বোধহয় পারে,' নাক দিয়ে খোঁতখোঁত করলেন মেজর। 'এসো আমার সঙ্গে।'

মাঝখানের একটা দোকানের কাছে ওদেরকে নিয়ে এলেন তিনি। বাইরের খালি ঘরের পেছনে ছোট আরেকটা ঘর। জানালা দিয়ে পেছনের চত্বর চোখে পড়ে, জংলা হয়ে আছে, তার ওপাশে উঁচু দেয়াল। সব ক'টা জানালাই বন্ধ, কাঁচ লাগানো। একটা জানালার নিচে বসানো এয়ার কনডিশনার মৃদু ঝিরঝির করছে। একটা ডেস্ক,আর কয়েকটা ফোল্ডিং চেয়ার ছাড়া আর কোনো আসবাব নেই ঘরে। ডেস্কের ওপর রাখা একটা টেলিফোন। একটা টেপ রেকর্ডার নিয়ে ব্যস্ত একজন

লোক। মাথায় কালো চুল। পরনে শ্রমিকের পোশাক।

'দেরি আছে?' জিজ্ঞেস করলেন মেজর।

মুখ না তুলেই মাথা ঝাঁকালো শুধু লোকটা।

'ও ওটা ঠিক করুক,' নিরেক বললেন, 'এসো ততোক্ষণ গল্প করি আমরা। আমাদের পাইরেটস সোসাইটির কথা শুনবে? বেশ।' ডেস্কের এক কোণে উঠে বসলেন তিনি। টেবিলে ঠুকলেন বেতটা। 'এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আমার এক দাদা, আমার আপন দাদার ভাই। মস্ত ধনী ছিলেন তিনি। মূল লক্ষ্য, জলদস্যুদের নিয়ে গবেষণা করা, তাদেরকে সাহায্য করা, তাদের পরিবারের উন্নতি করা। আমাদের এক পূর্ব পুরুষ হামফ্রে নিরেকের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে গিয়েই এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠার ইচ্ছে জাগে তাঁর মনে। হামফ্রের নাম দিয়েছিলো লোকে টাইগার নিরেক। প্রাইভেটিয়ার ছিলেন তিনি। ঔপনিবেশিক আমলে জাহাজ নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে। প্রাইভেটিয়ার কাদেরকে বলে জানো তো?'

'জানি,' মাথা ঝাঁকালো রবিন। 'বেসরকারী লোক, তবে সরকারী ভাবে অনুমতি দেয়া হতো যাদেরকে, শত্রু জাহাজ লুট করার জন্যে। তা, টাইগার নিরেকের নাম কিন্তু কখনও শুনিনি।'

'আমিও না,' বিড়বিড় করলো কিশোর। কোনো কিছু জানে না বলতে খুব খারাপ লাগে তার। 'ওই এলাকার সবচেয়ে বিখ্যাত একজনের নামই জানি আমি, জেনারেল জাঁ ল্যাফিটি।'

'টাইগার নিরেকও তারচেয়ে কম বিখ্যাত নন।' মেজর নিরেক বললেন, 'ল্যাফিটির মতোই দেশপ্রেমিক। আঠারোশো বারো সালে রেভলুশনারি ওঅরে তিনিও যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাস মনে রাখেনি তাঁর কথা। দু'জনেই প্রাইভেটিয়ার ছিলেন। নিরেক ইংরেজ জাহাজকে আক্রমণ করে তাদের অস্ত্রশস্ত্র, রসদ কেড়ে নিয়ে গিয়ে জমা করতেন বিদ্রোহীদের ভাঁড়ারে। আর জেনারেল হামলা চালাতেন স্প্যানিশ জাহাজের ওপর। অ্যানড্রু জ্যাকসনের দলে থেকে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন তিনি। নিরেক বা ল্যাফিটি, কেউই কম ছিলেন না, অথচ একজনের কথা লোকে মনে রাখলো, আরেকজনের কথা বেমালুম ভুলে গেল। ইতিহাস যে কেন এই গোলমালটা করে, বুঝি না! এই ব্যাপারটাই খারাপ লেগেছিলো আমার দাদার। লাখ লাখ ডলার খরচ করে এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করলেন। বই, পুস্তিকা প্রকাশ করলেন। সেসব বইতে লেখালেন সেই সব লোকদের কথা, যাদেরকে এড়িয়ে গেছে ইতিহাস।'

'কিন্তু...' শুরু করতে যাচ্ছিলো কিশোর। তার কণ্ঠে সন্দেহের সুর।

থামিয়ে দিয়ে মেজর বললেন, 'শুনলে অবাক হবে, ইয়াং ম্যান, বছরের পর বছর আমার দাদা সারা দুনিয়া চষে বেড়িয়েছেন ওরকম মানুষের খোঁজে। তাদেরকে অনেক বড় করে তুলে ধরেছেন। তাঁর সেই অসমাপ্ত কাজটাই চালিয়ে

যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি। আমি বুঝেছি, ক্যালিফোর্নিয়ায় ওরকম হিরো অনেক আছে, দেশের জন্যে যারা ডাকাত হয়েছে।...এই টনি, হলো?' মাথা ঝাঁকালো লোকটা। মেজর বললেন, 'কে আগে শোনাবে?'

'আমি!' মুসা বললো। 'ডাকাত এল ডিয়াবলোর গল্প বলবো আমি।'

আগে বলার ইচ্ছে ছিলো কিশোরের, থেমে গেল। বসে পড়লো রবিনের পাশের চেয়ারটায়। মুসার মুখে আরেকবার শুনতে লাগলো মেকসিকান দস্যু ডিয়াবলোর বীরগাথা, মেকসিকান যুদ্ধের সময় কি করে আমেরিকান অনুপ্রবেশ-কারীদের বাধা দিয়েছিলো। কিন্তু মুসা অর্ধেকও বলে সারতে পারলো না, তাকে থামিয়ে দিয়ে মেজর বললেন, 'ভালো। আমাদের সোসাইটির জন্যে চমৎকার সিলেকশন। কাজে লাগবে এল ডিয়াবলো, তাকে তুলে ধরা উচিত। এরপর কে বলবে?'

শুরু করে দিলো কিশোর, 'আমি দু'জনের কথা বলবো। একজন, ফরাসী প্রাইভেটিয়ার হিপোলাইট ডা বুচারড। আরেকজন তার চাকর উইলিয়াম ইভানস, পরে যার ডাক নাম হয়ে যায় বেগুনী জলদস্যু। ফরাসী জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন ডা বুচার্ড, পরে আরজেনটিনা সরকারের চাকরি নিয়ে নেন। আঠারোশো আঠারো সালে যুদ্ধে নেমেছিলো দেশটা। তাঁর জাহাজের নাম ছিলো সান্তা রোজা, মাঝিমাল্লা আর যোদ্ধা মিলিয়ে লোক ছিলো দুশো পঁচাশিজন। দশটা দেশ থেকে যোগাড় করেছিলেন ওদেরকে। স্প্যানিশ জাহাজ আর ঔপনিবেশিকদের ওপর হামলা চালাতে পাঠানো হয়েছিলো তাঁকে। আলটা ক্যালিফোর্নিয়ার স্প্যানিশ ঔপনিবেশিকদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ছিলেন তিনি। জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেন মনটিরে অঞ্চল, পাবলো সোলার গভর্নরকে পরাজিত করেন, তারপর আসেন লস অ্যাঞ্জেলেসে হামলা চালাতে...'

'গুড! ভেরি গুড!' হাততালি দিলেন মেজর। রবিনের দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি কিছু বলবে?'

হঠাৎ বাধা পেয়ে থমকে গেল কিশোর। চোখ মিটমিট করছে। মেজরের এই আচরণে খুবই অবাক হয়েছে সে। মুসার দিকে তাকালো। সে-ও তাকিয়ে আছে তার দিকে।

ডন স্যাবাসটিয়ান অ্যালভারোর গল্প আরম্ভ করলো রবিন। কিন্তু মাঝপথে আসার অনেক আগেই হাত তুললেন মেজর। 'দারুণ! চমৎকার! ভালো ভালো গল্প নিয়ে এসেছো তোমরা। টেপে রেকর্ড করে রেখেছে নিক। পরে আবার বাজিয়ে শুনবো আমরা। তারপর যোগাযোগ করবো তোমাদের সঙ্গে।'

'যোগাযোগ করবেন?' ভুরু কোঁচকালো মুসা।

'কিন্তু বিজ্ঞাপনে লিখেছেন...'

হেসে কিশোরকে থামিয়ে দিলেন মেজর। 'আমরা ওটুকু শুনেই ঠিক করবো,

কার গল্প নেয়া যায়। তারপর পুরোটা শোনার জন্যে ডেকে পাঠাবো। এক ঘন্টার জন্যে পঁচিশ ডলার, কম তো না। ভালোমতো না শুনে দিই কি করে, তোমরাই বলো? ও হ্যাঁ, যাওয়ার সময় রিগোকে বলো পরেরজনকে পাঠিয়ে দিতে, প্লীজ।'

মেজরের ব্যবহারে থ হয়ে গেছে তিন গোয়েন্দা। গেটের বাইরে বেরিয়ে রিগোকে জানালো তার মনিবের নির্দেশ। সারি দিয়ে অপেক্ষা করছে গল্প বলিয়েরা, তাদের পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে এগোলো ওরা। সাইকেলগুলো ঠিকমতোই রয়েছে।

প্রথমে মুখ খুললো মুসা, বিষ ঝাড়লো, 'আমাদেরকে ঠকিয়েছে!'

জ্বলে উঠলো রবিন, 'বিজ্ঞাপনে বলেছে অন্য কথা! যে কেউ গল্প শোনালেই টাকা দেবে বলেছে!'

'হুঁম্‌ম্‌!' আনমনে মাথা নাড়লো কিশোর। ভাবছে কিছু।

'প্রতিবাদ করা উচিত ছিলো!' রবিন বললো।

'শুরু করেছিলাম তো,' বললো মুসা। 'পাত্তাই দিলো না!'

'হ্যাঁ। বড়দেরকে এভাবে ঠকাতে পারতো না। আমরা ছেলেমানুষ বলেই...'

'বড়দেরকে টাকা দিলে তখন গিয়ে ধরবো মেজরকে!' দুই সহকারীর মুখোমুখি হলো গোয়েন্দাপ্রধান। 'চলো, মেজরের ওপর নজর রাখবো।'

তিন

সাইকেলগুলো যেখানে আছে সেখানেই রেখে, দৌড়ে দেয়াল ঘুরে চত্বরের পেছনে চলে এলো তিন গোয়েন্দা। দেয়ালে চড়ে বসলো। দোকানগুলোর পেছনে। পুরনো একটা ওক আর একটা জ্যাকারাণ্ডা ডালপালা ছড়িয়েছে, ওসবের আড়ালে মোটামুটি লুকিয়ে থেকে দৃষ্টি দিলো মেজরের ঘরে। আরেকটা ছেলের সাক্ষাৎকার নেয়া হচ্ছে। জানালা বন্ধ, তার ওপর এয়ারকুলারের গুঞ্জন, ভেতরের কথা কিছুই শুনতে পেলো না গোয়েন্দারা। তবে কি ঘটছে আন্দাজ করতে একটুও অসুবিধে হলো না।

'দেখো!' নিচু গলায় বললো মুসা।

তিনজনেই দেখলো, ঘরের ছেলেটার চোখে হঠাৎ বিস্ময় দেখা দিয়েছে। তর্ক শুরু করলো। একরকম জোর করেই তাকে ঠেলে বের করে দিলেন মেজর।

'হুঁ,' মাথা দোলালো রবিন, 'শুধু আমাদের সঙ্গেই এরকম করেনি।'

কিশোর বললো, 'এই, টনির ওপর চোখ রাখো!'

'রাখছিই তো,' মুসা বললো। 'আর কি দেখবো?'

'দেখোই না কি করে।'

পনেরো-ষোল বছরের একটা ছেলে ঘরে ঢুকলো। কথা বলতে আরম্ভ করলো। কয়েক মিনিট শুনেই তাকে বের করে দিলেন মেজর। ছেলেটা বেরিয়ে যেতেই

টেপ রেকর্ডারের একটা বোতাম টিপলো টনি। কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে আবার আরেকটা বোতাম টিপে মাইক্রোফোনটা রেডি করলো। পরের ছেলেটা যখন এলো, আবার ঘুরতে শুরু করেছে মেশিনের টেপ।

'রিওয়াইণ্ড করে-নিয়ে আবার রেকর্ড করছে,' মুসা বললো ধীরে ধীরে। 'কি দেখতে বললে বুঝলাম না…'

'বুঝেছি!' বলে উঠলো রবিন। 'বার বার একই কাজ করছে। একটা ফিতাকেই টেনে টেনে বার বার তাতে রেকর্ড করছে!'

'এবং,' যোগ করলো কিশোর, 'আগের বার যেটা রেকর্ড করছে, পরের বারই সেটা মুছে ফেলছে।'

'মুছে ফেলছে?' হাঁ হয়ে গেছে মুসা। 'তারমানে আমরা যা বলে এসেছি, সেসবও মুছে ফেলেছে?'

'কারো কথাই রাখছে না, সেকেণ্ড, সব মুছে ফেলছে।'

'তাহলে আবার ডাকবে কিভাবে?'

'ডাকবে না,' জবাব দিলো রবিন।

'ভালো প্রশ্ন করেছো,' কিশোর বললো। 'কেন…,' সতর্ক হয়ে গেল সে। 'এই একজন বড় মানুষ! দেখা যাক, এবার নতুন কিছু করে কিনা?'

একই ভঙ্গিতে, একই হাসি দিয়ে লোকটাকে স্বাগত জানালেন মেজর। টেপ রিওয়াইণ্ড করেছে টনি। লোকটাও বেশিক্ষণ গল্প বলতে পারলো না, ছেলেদের মতোই বের করে দেয়া হলো তাকেও।

'আসলে, মেজর যে মিছে কথা বলছেন কেউই বুঝতে পারছে না,' বিড়বিড় করে বললো কিশোর। 'সবাই ভাবছে, আবার ডাকা হবে তাদেরকে।'

'তার মানে ফাঁকিবাজি,' রবিন বললো। 'কিন্তু কেন?'

মাথা নাড়লো কিশোর। 'বুঝতে পারছি না। বিজ্ঞাপন করে ডেকে নিয়ে আসা হলো সবাইকে। টেপে কথা তুলে আবার মুছে ফেলছে! অবাক কাণ্ড!' নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন চিমটি কাটতে লাগলো সে।

একসাথে দু'জন ঢুকলো মেজরের ঘরে। একজন লম্বা, রোগা, দাড়ি আছে। পরনে জাহাজ ক্যাপ্টেনের ইউনিফর্ম। ছোট একটা ছেলের হাত ধরে ঢুকেছেন তিনি। ওঁদেরকে দেখে চঞ্চল হয়ে উঠলেন মেজর, হঠাৎ যেন বড় বেশি আগ্রহী মনে হলো তাঁকে। ক্যাপ্টেনের সাথে হাত মেলালেন তিনি, বাচ্চাটার গাল টিপে আদর করলেন। দু'জনকেই আদর করে এনে বসালেন চেয়ারে। মাইক্রোফোন মুখের কাছে এনে যখন কথা বলতে লাগলেন ক্যাপ্টেন, উৎসুক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন মেজর।

নবাগতদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রবিন বলে উঠলো, 'ছেলেটাকে চিনতে পেরেছো? আমাদের ইস্কুলে পড়ে, নিচের ক্লাসে। ক্যাপ্টেন নিশ্চয় তার

বাবা।'

'জাহাজের ক্যাপ্টেন মনে হচ্ছে?' মুসা বললো।

'অনেকটা তা-ই। পাইরেটস কোভে বেগুনী জলদস্যুর আড্ডার নাম শুনেছো?'

'শুনেছি, ডিজনিল্যাণ্ডের মতোই অনেকটা। তবে খুব সামান্য ব্যাপার। জাহাজে করে যেতে হয়, জলদস্যুদের কি কি সব দেখায়, ব্যস।'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'আমিও শুনেছি। ক'বছর হলো খুলেছে। এখনও তেমন পরিচিত হয়নি।'

'ব্যবসাও হচ্ছে না,' রবিন বললো। 'বেগুনী জলদস্যুর বিশেষজ্ঞ বলা হয় ক্যাপ্টেন ফিলিপকে। একবার আমাদের ইস্কুলে লাইব্রেরীতে একটা ছোটখাট লেকচার দিয়েছিলেন তার ওপরে, তোমরা সেদিন ছিলে না।'

'আরে, মেজর বেরিয়ে যাচ্ছে!' মুসা বললো।

মাইক্রোফোনের সামনে বসে তখনও গল্প বলে যাচ্ছেন ক্যাপ্টেন ফিলিপ। পাশে বসে আছে তার ছেলে পিটার। মিনিটখানেক পরে রাস্তার দিক থেকে শোনা গেল সম্মিলিত চিৎকার। আবার কোনো কারণে রেগেছে গল্প বলিয়েরা। দেয়াল থেকে নেমে পড়লো মুসা। ঝোপের আড়ালে থেকে দেয়াল ঘেঁষে এগোলো কি হয়েছে দেখে আসার জন্যে। কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এলো উত্তেজিত হয়ে।

'সবাইকে ভাগিয়ে দিচ্ছেন মেজর। গেটের ওপর "নো মোর ইন্টারভিউ" লেখা সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিয়েছে রিগো। আজ আর কোনো সাক্ষাৎকার নেয়া হবে না। আবার ফাঁকি দেয়া হলো গল্প বলিয়েদের।'

ফিরে এলেন মেজর। পেছন পেছন এলো হাতির বাচ্চা রিগো—অন্তত মুসার কাছে লোকটাকে সেরকমই লাগছে। ইশারায় তাকে কথা বলতে মানা করলেন নিরেক।

'খাইছে! ক্যাপ্টেনের গল্প ঠিকই রেকর্ড করা হচ্ছে! পুরোপুরি!'

'বুঝেছি!' আচমকা চেঁচিয়ে উঠেই কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ফেললো রবিন। কেউ শুনে ফেললো কিনা তাকিয়ে দেখলো আশেপাশে। 'ক্যাপ্টেন ফিলিপ বেগুনী জলদস্যুর বিশেষজ্ঞ। নিরেক শুধু বেগুনী জলদস্যুর গল্পই চান, সেজন্যে আর সবাইকে ভাগিয়ে দিয়েছেন।'

'না।' মনে করিয়ে দিলো কিশোর, 'বেগুনী জলদস্যুর গল্প আমিও বলতে চেয়েছিলাম। শোনেননি।'

'হয়তো খেয়ালই করেননি,' মুসা যুক্তি দেখালো।

'কিংবা গুরুত্ব দেননি,' বললো রবিন। 'কারণ মেজর জানেন, ক্যাপ্টেন ফিলিপ বললে অনেক বেশি বলতে পারবেন। তাঁকেই তাঁর দরকার ছিলো।'

'তাহলে তাঁর বাড়িতে গিয়ে কেন বললেন না, যে গল্প শুনতে চাই?' কিশোরের জিজ্ঞাসা। 'কেন এতোসব ঝামেলা করতে গেলেন?'

'কি জানি...,' গাল চুলকালো রবিন।

'টাকা বাঁচানোর জন্যে, কিশোর,' মুসা বললো। 'বাবা বলে, যদি শস্তায় কিছু পেতে চাও, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দাও। অনেকে হাজির হবে, দামদর করার সুযোগ পাবে। রবিনের কথাই ঠিক, ক্যাপ্টেনের মুখেই গল্পটা শুনতে চেয়েছেন নিরেক। কায়দা করে ডেকে এনেছেন পুরো গল্পটা শোনার জন্যে, কম পয়সায়।'

'এটা অবশ্য হতে পারে।' এই যুক্তিটাও তেমন জোরালো মনে হলো না কিশোরের।

সাক্ষাৎকার ওদিকে চলছে। সাড়ে এগারোটায় ঘড়ি দেখলেন ক্যাপ্টেন। চেয়ার থেকে উঠতে গেলেন। তাঁকে আবার বসিয়ে দিলেন নিরেক। পকেট থেকে টাকা বের করে দিলেন। নিতে আপত্তি করলেন ফিলিপ। জোর করেই তাঁর হাতে টাকাটা গুঁজে দিলেন মেজর। বার বার হাত ধরে ঝাঁকালেন। পিটারের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন। এগিয়ে দিতে গেলেন দুজনকে।

টপাটপ লাফিয়ে দেয়াল থেকে নেমে পড়লো তিন গোয়েন্দা। ঝোপের আড়ালে আড়ালে ছুটলো চত্বরের সামনের দিকে।

গেটের ফাঁক দিয়ে দেখলো, রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা পুরনো একটা পিকআপ ট্রাকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন ফিলিপ আর পিটার। গাড়িটার রঙ বেগুনী। পাশে সোনালি অক্ষরে বড় করে লেখা রয়েছেঃ

বেগুনী জলদস্যুর আড্ডা

একদিনের জন্যে জলদস্যু হোন!

গেটের কাছে দাঁড়ানো মেজরের দিকে ফিরে বললেন ফিলিপ, 'তাহলে রাতে দেখা হচ্ছে। ন'টায়।'

বেগুনী পিকআপে করে চলে গেলেন ফিলিপ আর পিটার।

'আজ রাতে?' ফিসফিস করে বললো মুসা।

'নিশ্চয় বেগুনী জলদস্যুর সমস্ত গল্পটা শুনতে চান মেজর,' অনুমান করলো রবিন।

'কিন্তু...,' থেমে গেল কিশোর।

চত্বরে দাঁড়ানো একটা ছোট ট্রাকের এঞ্জিন গর্জে উঠেছে। চালিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল টনি। গেটটা লাগিয়ে দিয়ে দোকানের পেছনের ঘরে ফিরে এলেন মেজর আর রিগো।

ঝোপের আড়ালে আড়ালে আবার আগের জায়গায় চলে এলো তিন গোয়েন্দা। দেখলো, টেবিলে কি যেন রেখে ঝুঁকে দেখছেন মেজর আর রিগো।

'দলিল, না ছবি?' মুসার প্রশ্ন।

'নকশা-টকশা হতে পারে,' রবিন বললো।

আরো কাছে থেকে দেখতে যাবে ছেলেরা, এই সময় চত্বরে গাড়ির এঞ্জিনের

শব্দ হলো। নতুন আরেকজন লোক এসে ঢুকলো দোকানে। খাটো, মোটা, মাথায় একটা রোঁয়াও নেই, পুরোপুরি টাক। নাকের নিচে মস্ত, বেমানান গোঁফ। উত্তেজিত ভঙ্গিতে মেজরের পাশে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে টেবিলে রাখা জিনিসটা দেখাতে লাগলো। খানিক পরেই হাসতে শুরু করলো। তাতে যোগ দিলেন মেজর। রিগোকেও খুশি দেখাচ্ছে।

বন্ধ জানালার কারণে এবারেও ভেতরের কথা শুনতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়লো তিন গোয়েন্দা। এগিয়ে গিয়ে বোতাম টিপে টেপ রেকর্ডারে লাগানো ক্যাসেটের ফিতা রিওয়াইণ্ড করতে লাগলেন মেজর।

'কিশোর?' মুসা বললো। 'এটাতেই রেকর্ড করেছিলো না ক্যাপ্টেনের কথা?'

মুসার মুখের দিকে তাকালো একবার কিশোর আর রবিন, পরক্ষণেই মাথা ঘোরালো টেপ রেকর্ডারের দিকে। রিওয়াইণ্ডিং চলছে এখনো।

'ওটাই হবে!' রবিন বললো উত্তেজিত কণ্ঠে। 'টনি ক্যাসেটটা বের করেনি, আমি খেয়াল রেখেছি। ক্যাপ্টেনের সাথে সাথে তিনজনেই বেরিয়ে গিয়েছিলো, ঘরে আর কেউ ছিলো না। মেজর আর রিগো ফিরে এসেও মেশিনটার কাছে যায়নি।' চোখ মিটমিট করলো বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে। 'ক্যাপ্টেনের কথাও মুছে ফেলছে!'

'তারমানে,' গম্ভীর হয়ে বললো কিশোর, 'বেগুনী জলদস্যুর কাহিনীও চায় না ওরা।'

'কিন্তু ক্যাপ্টেনের গল্প তো শুনলো,' মুসা বললো।

'তার কথা শোনার জন্যে ভাগিয়ে দিলো সবাইকে,' বললো রবিন।

'এমনকি টাকাও দিলো,' কিশোর বললো। 'উদ্দেশ্য যা-ই হোক, সেটার সঙ্গে ক্যাপ্টেন ফিলিপ আর পিটারের সম্পর্ক আছে।'

'কিন্তু উদ্দেশ্যটা কী?'

'ঘটছেই বা কী?' রবিনের সুরে সুর মেলালো মুসা।

'সেটাই,' কিশোর বললো, 'জানার চেষ্টা করবো আমরা। চলো, বাড়ি যাই। খিদে পেয়েছে। বিকেলে আবার আসবো, নজর রাখবো মেজর আর তাঁর লোকজনের ওপর। ক্যাপ্টেন ফিলিপের সঙ্গেও কথা বলবো।' হাসি ফুটলো তার মুখে। 'মনে হচ্ছে, নতুন আরেকটা কেস পেয়ে গেল তিন গোয়েন্দা!'

চার

তবে সেদিন আর মেজরের ওখানে যেতে পারলো না তিন গোয়েন্দা। ইয়ার্ডে ফিরতেই রাশেদ পাশা বললেন, তাঁর সঙ্গে যেতে হবে কিশোরকে। স্যান লুইস অবিসপোতে অনেক পুরনো মাল দেখে রেখে এসেছেন। সেগুলো কিনবেন। রবিনকেও আটকে দিলেন লাইব্রেরিয়ান, যেখানে সে পার্টটাইম চাকরি করে।

একজন কর্মচারি অসুস্থ হয়ে পড়ায় বাড়তি কাজ করতে হলো রবিনকে। মুসাকে আটকালেন তার মা। গ্যারেজ আর তার আশপাশটা পরিষ্কার করা হয় না অনেকদিন। লাগিয়ে দিলেন সেই কাজে। দুই দিন পর রেহাই পেলো তিনজনেই ওরা। সকাল এগারোটায় এসে মিলিত হলো হেডকোয়ার্টারে। মেজর নিরেকের অদ্ভুত আচরণের ব্যাপারে আলোচনার জন্যে।

'কাল রাতে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম,' কিশোর জানালো। 'গিয়ে দেখি ক্যাপ্টেন ফিলিপ আর পিটারের কথা রেকর্ড করছেন মেজর।'

দ্রুত আলোচনায় ঠিক হলো, সাইকেল নিয়ে পাইরেটস কোভে যাবে কিশোর আর মুসা। আর তিন গোয়েন্দার নতুন, আজব আবিষ্কারটা বয়ে নেবে রবিন।

'এটা একটা অদৃশ্য অনুসরণের যন্ত্র,' বললো কিশোর। 'যাকে চাই, সে চোখের আড়ালে থাকলেও খুঁজে বের করে ফেলতে পারবো।'

ছোট্ট যন্ত্রটা হাতে নিয়ে দেখতে লাগলো মুসা। একটা পকেট রেডিওর সমান। ভেতরে একটা ধাতব পাত্র রয়েছে, তাতে ঘন এক ধরনের তরল পদার্থ ভরা। নিচের দিকে একটা সরু টিউব, চোখে ওষুধ দেয়ার ড্রপারের মতো জিনিস। ড্রপারের ভেতরে একটা খুদে ভালভ আছে। বাক্সের একপাশে একটা শক্তিশালী চুম্বক লাগানো।

'কি করে কাজ করে এটা, কিশোর?' রবিন জিজ্ঞেস করলো।

'অদৃশ্য চিহ্ন রেখে যাবে এটা,' বুঝিয়ে বললো কিশোর। 'আমাদের ছাড়া আর কারও চোখে পড়বে না। যে কোনো যানবাহনের ধাতব বডিতে চুম্বকের সাহায্যে আটকে দিতে পারবো যন্ত্রটা। ভেতরের তরল কেমিক্যাল সাধারণ ভাবে দেখা যায় না, অতিবেগুনী আলো ফেলতে হয়। আলট্রা-ভায়োলেট লাইট যাকে বলে। ড্রপারের মাথার কাছে লাগানো ভালভটা নির্দিষ্ট সময় পর পর সরে গিয়ে একফোঁটা করে কেমিক্যাল ছেড়ে দেবে বাইরে। মাটিতে পড়বে জিনিসটা, আর সুন্দর একসারি চিহ্ন রেখে যাবে। হাতে আলট্রাভায়োলেট টর্চ থাকলে ওই চিহ্ন ধরে অনুসরণ করে যাওয়া খুবই সহজ।'

'তারমানে আলট্রাভায়োলেট টর্চও আছে আমাদের কাছে?'

'নিশ্চয়ই,' হেসে বললো কিশোর। ছোট একটা টর্চ বের করে দিলো রবিনের হাতে। সাধারণ টর্চের মতোই দেখতে, শুধু বাল্‌ব্‌ অদ্ভুত।

'এটা থেকেই বেরোবে আলট্রাভায়োলেট লাইট?' উসখুস করে জিজ্ঞেসই করে ফেললো মুসা, 'ওটা কি ধরনের আলো, কিশোর? ক্লাসে নিশ্চয় পড়িয়েছে, আমি বোধহয় অ্যাবসেন্ট ছিলাম।'

'সাধারণ আলোর চেয়ে এই আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য খাটো,' ব্যাখ্যা করলো রবিন। 'ব্ল্যাক লাইট বা কৃষ্ণ আলোকও বলা হয় একে। অন্ধকারে কোনো কিছুর ওপর এই আলো ফেললে একধরনের বিচিত্র আভা দেখা যায়, নামটা হয়েছে সে-কারণেই। আরেকটা ব্যাপার, যে জিনিসের ওপর ফেলবে, সেই জিনিসটা দেখা যাবে, কিন্তু

আলোক রশ্মি দেখা যাবে না।'

'ইনফ্রারেড লাইটের মতো, তাই না? তবে ওটা শুধু রাতে কাজ করে। আল্ট্রাভায়োলেট কি দিনেও কাজ করবে, মানে দেখা যাবে এটা দিয়ে?'

'যাবে, তবে রাতের মতো অতো উজ্জ্বল হবে না চিহ্নগুলো, স্পষ্ট হবে না। এতে বরং সুবিধেই। আশপাশে কেউ থাকলে তার চোখ এড়ানো সহজ হবে। রবিন, মেজরের গাড়িতে যন্ত্রটা লাগিয়ে দেবে। তারপর সাইকেল নিয়ে অনুসরণ করবে চিহ্ন। যন্ত্রের কনটেইনারে লিকুইড কেমিক্যাল যা ভরা আছে, তাতে অন্তত দু'ঘন্টা চলবে। তার মানে বহুদুর পর্যন্ত অনুসরণ করতে পারবে গাড়িটাকে।'

'বসে আছি কেন তাহলে?'

'হ্যাঁ, চলো।'

যন্ত্র আর টর্চ একটা ব্যাকপ্যাকে ভরে ব্যাগটা পিঠে বেঁধে নিলো রবিন। দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে এলো তিনজনে। সাইকেল রাখা আছে ওয়ার্কশপে। নিয়ে বেরিয়ে পড়লো ওরা। রবিন রওনা হয়ে গেল শহরের দিকে। কিশোর আর মুসা চললো উত্তরে, শহরের প্রান্তসীমার দিকে, সাগরের সীমানাও শুরু হয়েছে ওখান থেকেই।

মনের ভাবনাটা মুসার কাছে প্রকাশ করে ফেললো কিশোর, 'ব্যাপারটা কাকতালীয় মনে হচ্ছে আমার কাছে, বুঝলে। শহরের ভেতরের কারো গল্প শুনতে চাইলেন না মেজর, শুধু শহর এলাকার বাইরে...'

'আরেকটা সেটআপ। চালাকি। ক্যাপ্টেন ফিলিপকে ধরার জন্যে। ঠিক না?'

'হতে পারে।'

রকি বীচের কয়েক মাইল উত্তরে উপকূলরেখা বরাবর একটা ছোট খাঁড়ির নাম পাইরেটস কোভ। ছোট্ট একটা গ্রাম আছে ওখানে, অল্প কয়েকটা ঘর আর দোকানপাট আছে। কিছু মাছধরা নৌকা আর জাহাজ আছে। আর আছে একটা এয়ার ট্যাক্সি সার্ভিস। সাইকেল চালিয়ে সাগরের তীরে চলে এলো কিশোর আর মুসা। খাঁড়ির কাছাকাছি আসতে চোখে পড়লো কাঁচাহাতে আঁকা একটা সাইনবোর্ডঃ

বেগুনী জলদস্যুর আড্ডা

ছোট-বড় সবার জন্যেই চমৎকার অ্যাডভেঞ্চার

একটা কারখানা বাড়ির পরেই এই টুরিস্ট অ্যাট্রাকশন। 'আড্ডা'টা গড়ে তোলা হয়েছে খাঁড়ির মাঝের একটা ছোট উপদ্বীপে। মূল ভূখণ্ডের দিকটায় কাঠের পুরনো বেড়া। বেড়ার বাইরে দুটো জায়গায় গাড়ি পার্ক করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে পথ ধরে চলেছে কিশোররা, তার ডানে ঘন গাছের একটুকরো জঙ্গল, তার ওপাশেও বেড়া।

দুটো পার্কিং লটেই প্রচুর ধুলো। অল্প কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে এই সকাল বেলা। গেটের বাইরে টিকেট বুদের কাছাকাছি বসে সোডা খাচ্ছে কয়েক জোড়া দম্পতি। তাদের বেয়াড়া বাচ্চাগুলো চেঁচামেচি করছে,মারামারি করছে। দুটো ছেলে একে অন্যকে ল্যাং মেরে ফেলে দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। বুদের ওপরে একটা কাঠের সাইনবোর্ডে পাইরেট শো-এর সময় লেখা রয়েছেঃ

'ব্ল্যাক ভালচার'-এর যাত্রার সময়—

প্রতিদিন ১২টা, ১টা, ২টা, ৩টা, ৪টা।

বুদের ভেতরে বসে আছে একজন গাঁট্টাগোঁট্টা লোক। অনবরত বাতাসের মধ্যে কাটিয়ে মুখের চামড়ার এমন অবস্থা হয়েছে, দেখে আর এখন বোঝার উপায় নেই বয়েস কতো। ডোরাকাটা একটা নাবিকদের শার্ট পরেছে সে। চোখে লাগিয়েছে কালো কাপড়, অন্ধরা যেমন লাগায়। মাথায় লাল রুমাল বাঁধা। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে চলেছে, 'ভাবলেই গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়, দর্শকবৃন্দ। কল্পনাই করতে পারবেন না কতোখানি রোমাঞ্চকর এই অভিযান।' নিশ্চয় লিখে মুখস্থ করে নিয়েছে এই বক্তৃতা, ভাবলো কিশোর। লোকটা বলছে, 'বেগুনী জলদস্যুর আড্ডায় এসে একদিনের জন্যে জলদস্যু হয়ে যান সবাই। জাহাজে পাল তুলে দিয়ে বেরিয়ে পড়ুন পাইরেটস কোভে। মাথার ওপর দুলবে কালো পতাকা, তাতে মড়ার খুলির নিচে হাড়ের ক্রস আঁকা। অদ্ভুত দেখতে একটা স্কোয়ার-রিগার টাইপের জাহাজ। জলদস্যুরা যেরকম পছন্দ করতো। আবার তার নামেরই বা কি বাহার দেখুন, ব্ল্যাক ভালচার। কালো শকুন। কেমন গা ছমছম করে না? দ্বীপে দ্বীপে দেখবেন লড়াই চলছে। বারুদের গন্ধ ভাসে বাতাসে, আপনিও পাবেন সেই গন্ধ। নিজের চোখে দেখবেন কি করে আক্রমণ করে জলদস্যুরা। আর মাত্র কয়েকটা টিকেট বাকি। বিশ মিনিটের মধ্যেই ছাড়বে ব্ল্যাক ভালচার। পেছনে পড়ে থাকবেন না। হেলায় সুবর্ণ সুযোগ হারাবেন না। আসুন, জলদি আসুন।'

অবাক হয়ে এদিক ওদিক তাকালো দম্পতিরা, এতো টিকেট কারা কিনে ফেললো যে মাত্র অল্প কয়েকটা বাকি আছে? কাউকেই চোখে পড়লো না, শুধু ওরা ছাড়া। তবে দেরিও করলো না। উঠে গিয়ে লাইন দিলো টিকেট কাউন্টারের সামনে। দলে গিয়ে দাঁড়ালো কিশোর আর মুসা। যখন কিশোরের পালা এলো, জানালার কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললো সে, 'ক্যাপ্টেন ফিলিপের সঙ্গে দেখা করতে চাই, ভাই, খুব জরুরী।'

লোকটার একটামাত্র চোখ তাকিয়ে রয়েছে কিশোরের দিকে। 'শো-এর সময় ক্যাপ্টেন কারো সঙ্গে দেখা করেন না।'

'কিন্তু,' তর্ক শুরু করলো কিশোর, 'শো তো এখনও...'

'ক্যাপ্টেন এখন জাহাজে। মারিয়া!'

উঠে পড়লো 'কানা নাবিক'। চলে গেল বুদের পেছনের ঘরে। প্রায় দৌড়ে

এসে তার জায়গায় বসলো আঠারো-উনিশ বছরের একটা মেয়ে। জলপাই রঙের চামড়া মুখের। কালো চুল, বেণি করেছে।

'কটা?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করলো মারিয়া। কথায় স্প্যানিশ টান।

'ক্যাপ্টেন ফিলিপকে দরকার, মিস। এখুনি।'

'বুঝলাম না। কটা টিকেট? দুটো?' কেমন যেন অনিশ্চিত শোনালো মেয়েটার কণ্ঠ।

'ওভাবে বলে হবে না, কিশোর,' পেছন থেকে বললো মুসা। 'কি করবে?'

'আর কি করবো? টিকেটই কাটতে হবে। জাহাজে উঠে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করতে হবে আরকি।'

টিকেট কেটে, চওড়া একটা গেটের দিকে এগোলো দু'জনে। কাঠের ফ্রেমে কাঁটাতারের বুনন দিয়ে তৈরি হয়েছে পাল্লা। দুটো পাকা নিচু বাড়ির মাঝখান দিয়ে চলে গেছে পথ, একেবারে ডক পর্যন্ত। ডকে বাঁধা রয়েছে জাহাজটা, ব্ল্যাক ডালচার। কাঠের সিঁড়ি নামিয়ে দেয়া হয়েছে যাত্রীদের জন্যে। দুই মাস্তুলের পালতোলা প্রাচীন স্কোয়ার-রিগার জাহাজের মতো করে তৈরি করা হয়েছে। কালো রঙ। প্রধান মাস্তুলে উড়ছে কালো জলি রোজার পতাকা, তাতে জলদস্যুদের কুখ্যাত চিহ্ন আঁকা রয়েছেঃ মড়ার খুলি আর হাড়ের ক্রস।

গেটের অন্যপাশে চলে এলো দুই গোয়েন্দা। নিচু বাড়িগুলো বোধহয় আস্তাবল ছিলো একসময়, পরে গ্যারেজ হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। বাঁয়ের বাড়িটায় এখন তিনটে দোকান। একটাতে আইস ক্রীম আর কোল্ড ড্রিংকস বিক্রি হয়। আরেকটায় স্যুভনির। আর তৃতীয়টাতে বিক্রি হয় কফি আর হট ডগ। ডানের বাড়ির সামনেটা পুরো খোলা। মিউজিয়ম করা হয়েছে। তাতে জাহাজী আর জলদস্যুদের ব্যবহৃত নানা জিনিসের প্রদর্শনী চলছে। দুটো বাড়ির মাথায়ই জলি রোজার পতাকা উড়ছে। তৃতীয় আরেকটা উড়ছে গেটের ওপর। সব কিছুই কেমন মলিন। ঠিকমতো রঙ করা হয়নি। পুরনো, ক্ষয়া চেহারা।

ডানে, মিউজিয়মের পেছনে অনেকগুলো ওকগাছের পেছনে দেখা গেল বোটহাউস। তারও পরে পাথরের একটা টাওয়ার। ওদিকে পানির একটু পর থেকেই শুরু হয়েছে একসারি দ্বীপ, মোট চারটে। এতোই ছোট, ঘর বানিয়ে মানুষ বাসেরও অনুপযুক্ত। দ্বীপ ছাড়িয়ে, খাঁড়ির অপর পারে দেখা গেল এয়ার ট্যাক্সি সার্ভিসের একটা প্লেন উঠে গেল রানওয়ে থেকে।

'আহামরি কোনো জায়গা নয়,' আনমনে বললো কিশোর। 'দেখার তেমন কিছু নেই।'

'রবিন তো বললোই, ব্যবসায় সুবিধে করতে পারছেন না ক্যাপ্টেন ফিলিপ,' মুসা বললো। 'হয়তো এই দুর্বলতাটাকেই কাজে লাগিয়ে কিছু করতে চাইছেন

মেজর নিরেক।'

'তা হতে পারে।'

দুটো বিল্ডিঙের মাঝের চওড়া প্রমেনাড ধরে হেঁটে চললো ওরা। ডানের মিউজিয়মের দিকে তাকালো। ধুলোয় ঢাকা তলোয়ার, মরচে পরা কামান-বন্দুক, মোমে তৈরি জলদস্যু আর নাবিকদের মূর্তি, আর জাহাজীদের নানা-রকমের পোশাক সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সেগুলোও তেমন মনোযোগ আকর্ষণ করে না দর্শকদের, বুঝতে পারলো কিশোর। ডকের কাছে পৌছে একটা ছেলেকে দেখতে পেলো। ঢলঢলে শার্ট গায়ে, পরনে ঢোলা, ফোলা প্যান্ট, জলদস্যুরা যেরকম পরতো।

'পিটার ফিলিপ!' বলে উঠলো মুসা।

বেশ জোরেই বলেছে সে, কিন্তু ছেলেটা শুনলো বলে মনে হলো না। দ্রুত এগিয়ে গেল ব্ল্যাক ভালচারের সিঁড়ির দিকে। জাহাজের পেছনের কোয়ার্টারডেকে পায়চারি করছেন ক্যাপ্টেন ফিলিপ। কালো, লম্বা ঝুলওয়ালা কোট গায়ে। গোড়ালি ঢাকা উঁচু বুট পরেছেন। কোমরে চওড়া চামড়ার বেল্ট, তাতে ঝুলছে ভোজালি। ছেলের মতোই তিনিও একটা ট্রাইকর্ন হ্যাট মাথায় দিয়েছেন, তাতে লাল পালক গোঁজা। বাঁ হাতের তালু আর আঙুল যেখানে থাকার কথা, সেখানে দেখা গেল বাঁকা একটা স্টীলের হুক। লাগিয়ে নিয়েছেন জলদস্যুর ভয়ংকরতা বোঝানোর জন্যে। টুরিস্টদের দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠলেন, 'ইয়ো হো হো, অ্যাণ্ড আ বটল অভ রাম! জলদি করো, জলদি করো, উঠে এসো! ব্যবসায়ীদের একটা জাহাজ দেখতে পাচ্ছি! স্রোতও চমৎকার! এখুনি নোঙর তুলে তাড়া করবো ওটাকে!'

এমন ভঙ্গিতে কথাগুলো বললেন ক্যাপ্টেন, মুসার মনে হলো এটা অভিনয় নয়, সত্যি সত্যি। রোমাঞ্চিত হলো সে। নীরবে জাহাজে উঠে গেল দুই গোয়েন্দা। হঠাৎ গান গেয়ে উঠলো একদল জলদস্যু, বুনো চিৎকারে ঝালাপালা করে দিলো কান। চমকে ওপর দিকে তাকালো মুসা। লাউডস্পীকারে বাজছে ওসব। ঝট করে ডেকের দুই পাশে লাফিয়ে উঠলো অনেক জলদস্যু, কানা চোখে কালো পট্টি লাগানো, দাঁতে কামড়ে ধরে রেখেছে ছুরি, যেন অন্য জাহাজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত। কার্ডবোর্ডে তৈরি ওগুলো। সামনের মাস্তুলে পতপত করছে একটা পাল। ঢিলে ভাবে। চলতে আরম্ভ করলো ব্ল্যাক ভালচার। বাতাসের সঙ্গে ওটার যাত্রাপথের কোনো সম্পর্ক নেই। এঞ্জিনে চলছে।

'দূর,' বিরক্ত হয়ে হাত নাড়লো মুসা, 'মজাটাই নষ্ট করে দিলো ওই লাউডস্পীকার আর এই এঞ্জিন! বেশি মেকি হয়ে গেল।'

দর্শক বেশি না। বিষণ্ন চোখে দেখছে ওরা পাল আর হার্ডবোর্ডের মানুষগুলোকে। হঠাৎ ঝড়ো বাতাস আর উত্তাল ঢেউয়ের ভারি শব্দ যেন ছিটকে বেরিয়ে এলো লাউডস্পীকার থেকে। জলদস্যুদের গান আর চেঁচামেচি বন্ধ হয়নি।

এরই মাঝে এঞ্জিনের ভট-ভট-ভট-ভট আওয়াজটা ভারি বেমানান। পাইরেটস কোভের দিকে এগিয়ে চলেছে জাহাজ।

'বাজে!' আবার বিরক্তি প্রকাশ করলো মুসা। 'একেবারেই বাজে! কিন্তু এ-জিনিসের ওপর এতো আগ্রহ কেন মেজর নিরেকের?'

'জানি না,' কিশোর বললো। 'দেখে যাও।'

পাঁচ

ডি লা ভিনা স্ট্রীটের দেয়ালে ঘেরা চত্বরের কাছে এসে পৌছলো রবিন। কাঠের উঁচু গেট বন্ধ। ঘুরে পেছন দিকে চলে এলো সে, আগের বার যেখানে উঠে বসেছিলো তিন গোয়েন্দা, সেখানে উঠলো। দোকানের পেছনের ঘরটার দিকে তাকালো। কেউ নেই। অপেক্ষা করতে লাগলো সে।

পনেরো মিনিট পর কিঁচকিঁচ করে খুলে গেল গেটের ভারি পাল্লা। চত্বরে ঢুকলো একটা গাড়ি। দোকানের পেছনের ঘরটায় এসে ঢুকলেন মেজর। হাতে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ। মনে হয় একাই এসেছেন। ব্যাগ থকে কফির সরঞ্জাম বের করে খেতে বসলেন তিনি। খাওয়া শেষ করে পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করে খুলে বিছালেন টেবিলের ওপর।

ছোট একটা রুলার বের করে কাগজটার ওপর রেখে মাপজোক করলেন। সন্তুষ্ট মনে হলো তাঁকে। ছোট একটা নোটবুকে কিছু লিখলেন। উঠে দাঁড়িয়ে কিছু শোনার জন্যে কান পাতলেন। রবিনও শুনতে পেলো শব্দটা। আরেকটা গাড়ি ঢুকলো চত্বরে। দোকানের সামনের দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন মেজর। ডালপালার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে দেখছে রবিন। গেট দিয়ে ঢুকছে আরও একটা মোটরযান, বড় ট্রাক।

এটাতে করেই দু'দিন আগে চলে গিয়েছিলো টনি।

মোট তিনটে ট্রাক এখন চত্বরে। একটা, টনির ট্রাক। দ্বিতীয়টা একটা আইস ক্রীম ভ্যান। আর তৃতীয়টা বিরাট এক লরি, পেছনে প্ল্যাটফর্ম লাগানো রয়েছে—ইচ্ছেমতো নামানোও যায়, ওঠানোও যায়। পাশে বড় করে লেখা রয়েছেঃ হ্যারিসন'স ট্রী সার্ভিস। দু'জন ট্রাক ড্রাইভারের একজনের পরনে আইস ক্রীম বিক্রেতার শাদা ইউনিফর্ম। আরেকজনের পরনে মালির পোশাক। কোমরের ভারি বেল্ট থেকে ঝুলছে নানারকম যন্ত্রপাতি। রবিনের দিকে পেছন করে রয়েছে ওরা। মেজর নিচু গলায় কথা বলছেন ওদের সঙ্গে। দুটো লোককেই চেনা চেনা লাগছে রবিনের। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও মনে করতে পারলো না কোথায় দেখেছে। কথা শেষ করে যার যার ট্রাকে গিয়ে উঠলো ওরা। বেরিয়ে গেল। খোলাই রইলো গেটটা।

আবার আগের ঘরে ফিরে এলেন মেজর নিরেক।

দেয়াল থেকে নেমে পড়লো রবিন। গুড়ি মেরে চলে এলো দোকানের সামনের দিকে। কানে এলো মেজরের কথা, 'হ্যাঁ, বুঝেছি, গাধা কোথাকার! দশ মিনিট সময় দিলাম!' খটাস করে রিসিভার আছড়ে রাখলেন ক্রেডলে।

তাড়াতাড়ি পকেট থেকে কিশোরের দেয়া যন্ত্রটা বের করে চত্বরে দাঁড়ানো ট্রাকটার দিকে চললো রবিন। নিচের ইস্পাতের ফ্রেমে এমন ভাবে লাগালো ওটা, যাতে ড্রপারের মুখটা নিচের দিকে থাকে। লাগিয়ে আর এক মুহূর্ত দেরি করলো না, এক দৌড়ে এসে ঢুকলো ঝোপের ভেতর।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। দোকান থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠলেন মেজর। গেটের বাইরে ট্রাকটা বের করে থামালেন। নেমে এসে লাগিয়ে দিলেন গেটটা।

ট্রাকটা চলে যাওয়ার শব্দ শুনলো রবিন। দৌড়ে এলো দেয়ালের কাছে। দেয়াল টপকে ওপাশে নেমে চলে এলো একটা টেলিফোন পোস্টের কাছে, যেটাতে সাইকেল বেঁধে রেখে গিয়েছিলো। তাড়াতাড়ি খুলে নিয়ে তাতে চড়ে এলো গেটের কাছে। আলট্রাভায়োলেট টর্চ বের করলো।

সহজেই খুঁজে বের করলো চিহ্ন। অতিবেগুনী রশ্মি পড়ে জ্বলজ্বল করছে বেগুনী ফোঁটাগুলো। আপনমনেই হাসলো রবিন। এগিয়ে চললো ওই ফোঁটা অনুসরণ করে।

প্রথমে সাগরের দিকে গেছে চিহ্নগুলো, তারপর গিয়ে উঠেছে হাইওয়েতে। উদ্বিগ্ন হলো রবিন। গাড়িতে করে গেছেন মেজর। এই খোলাপথে গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাইকেলে করে অনুসরণ করা অসম্ভব। খানিক দূর এগিয়ে আবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সে। চিহ্নগুলো হাইওয়ে থেকে আরেক দিকে মোড় নিয়েছে, চলে গেছে বড় একটা শপিং সেন্টারের দিকে।

অনেক গাড়ি পার্ক করা রয়েছে বাজারের পার্কিং লটে। ওগুলোর ভেতর দিয়ে চললো রবিন। চোখ খুঁজছে ভ্যানটাকে। এই দিনের আলোয় মাটির দিকে আলো জ্বালার ভঙ্গিতে টর্চ ধরে রাখতে সঙ্কোচ লাগছে তার, বোকা ভাবতে পারে লোকে। তবে বাইরে লোকজন তেমন নেই, বেশির ভাগই ভেতরে, কেনাকাটায় ব্যস্ত।

ভ্যানটা চোখে পড়লো না। টর্চ দিয়ে না খুঁজে উপায় নেই। যে যা খুশি ভাবুকগে, বলে মন থেকে জোর করে অস্বস্তি দূর করে দিলো রবিন। চিহ্ন ধরে ধরে এগোলো আবার। একটা হার্ডওয়্যারের দোকানের পাশ দিয়ে চলে গেছে ফোঁটাগুলো।

সাইকেল থেকে নেমে সাবধানে দোকানটার কোণায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিলো সে। দোকানের পাশের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভ্যানটা। পেছনের দরজা খোলা। একটু পরেই দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন মেজর। পেছনে হস্তীদেহী রিগো। হাতে কয়েকটা বস্তা, আলুর বস্তার মতো।

বস্তাগুলো ভ্যানে তুললো সে। আবার দুজনে গিয়ে ঢুকলো দোকানে। ভ্যানের ভেতরে উঁকি দেয়ার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে ঠেকালো রবিন। বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে। যে-কোনো মুহূর্তে বেরিয়ে আসতে পারেন মেজর আর রিগো। এবং তা-ই করলো ওরা। এবারও আগে আগে বেরোলেন মেজর। পেছনে রিগো বেরোলো হাতে কতগুলো ব্যাটারির মতো জিনিস নিয়ে। ওগুলোও ভ্যানের পেছনে তুলে দরজা লাগিয়ে দিলো।

'এতো ঢিলা, ছাগল!' ধমক লাগালেন মেজর। 'জলদি ওঠো। আমার খিদে পেয়েছে।'

ভ্যানের সামনের সীটে উঠলো দু'জনে।

চট করে সরে গেল রবিন। মেজরের চোখে পড়তে চায় না।

বেগুনী ফোঁটা ধরে ধরে আবার ভ্যানটাকে অনুসরণ করলো সে। এতো জোরে চলেছে, পার্কিং লটের মোড় ঘুরে আরেকটু হলেই গিয়ে পড়েছিলো ভ্যানটার গায়ে। একটা রেস্টুরেন্টের সামনে দাঁড়িয়েছে গাড়ি। কাঁচের দরজার ওপাশে মেজর আর রিগোকে দেখতে পেলো সে। খেতে গেছে, বেরোতে সময় লাগবে। এটাই সুযোগ!

ভ্যানের পেছনের দরজা খুলে ভেতরে তাকালো রবিন। 'আলুর বস্তা'গুলো দেখলো। 'ব্যাটারি'গুলো দেখলো। আরও জিনিস পড়ে আছে মেঝেতে। কতগুলো বেলচা আর গাঁইতি। মাটি লেগে আছে ওগুলোতে। সদ্য খোঁড়া মাটি!

ছয়

ভট-ভট-ভট-ভট করে পাইরেটস কোবের দিকে চলেছে ব্ল্যাক ভালচার। বাতাস, ঢেউয়ের গর্জন, আর জলদস্যুদের কোলাহল ছাপিয়ে লাউডস্পীকারে গম গম করে উঠলো ক্যাপ্টেন ফিলিপের কণ্ঠ, 'বেগুনী জলদস্যুর আড্ডায় স্বাগতম। উত্তর লস অ্যাঞ্জেলেসের সব চেয়ে রোমাঞ্চকর এক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে এসেছেন আপনারা। কুখ্যাত বেগুনী জলদস্যু আর তার ভয়ংকর সহকারীদের নিষ্ঠুর কাণ্ডকারখানা দেখবেন আপনারা পাইরেটস কোভে। তবে তার আগে ওই দস্যুসর্দারের কথা কিছু জানা থাকা দরকার আপনাদের, আমি মনে করি। কাহিনীর শুরু আঠারোশো আঠারো সালে, যেদিন আলটা ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে এসে নোঙর ফেলেছিলো দুটো কালো জাহাজ। একটা থারটি এইট-গান ফ্রিগেট, নাম আরজেনটিনা। কমাণ্ডার ছিলেন একজন ফ্রেঞ্চ প্রাইভেটিয়ার, ক্যাপ্টেন হিপোলাইট ডা বুচার্ড। দ্বিতীয় জাহাজটা টোয়েন্টি সিক্স-গান, ওটার কমাণ্ডার একজন জলদস্যু, পেড্রো কনডে। তার প্রধান সহকারী ছিলো লেফটেন্যান্ট উইলিয়াম ইভানস। জাহাজের সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড।

'জাহাজটায় দু'শো পঁচাশি জন লোক ছিলো। আরজেনটিনার পতাকা।

আঠারোশো আঠারো সালে স্পেনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছিলো আরজেনটিনা। কুখ্যাত সব ডাকাতদের ভাড়া করেছিলো স্প্যানিশ জাহাজ আর শহর আক্রমণ করার জন্যে। কালিফোর্নিয়া তখন স্পেনের দখলে। আঠারোশো আঠারো সালের একুশে নভেম্বর মনটিরে শহরের ওপর কামানের গোলা ফেলতে আরম্ভ করেছিলো জাহাজ দুটো। ওখানকার গভর্নর ছিলেন তখন সোলা।'

'বুম্‌ম্‌ম্‌!' করে কামান গর্জে উঠলো।

'খাইছে!' বলে লাফিয়ে একহাত শূন্যে উঠলো মুসা। তার পাশেই রয়েছে কামানটা। একঝলক কালো ধোঁয়া বেরোলো ওটার মুখ দিয়ে। ছড়িয়ে পড়লো ডেকের ওপর। হাঁচি দিলো কয়েকজন, কাশতে লাগলো অনেকে।

'কামানের গোলার জবাব এলো তীর থেকে,' গল্পের খেই ধরলেন আবার ক্যাপ্টেন।

সত্যিই এলো জবাব।

কামানের গোলা ফাটলে আর পানিতে পড়লে যেরকম আওয়াজ হয়, তেমন শব্দ হতে লাগলো লাউডস্পীকারে।

চারটে দ্বীপের প্রথমটার দিকে এগিয়ে চলেছে ব্ল্যাক ভালচার। সরু পথ দিয়ে দ্বীপগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা এবং মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। প্রথম দ্বীপটার পাশ দিয়ে জাহাজ যাওয়ার সময় ঝোপের ভেতর থেকে চারটে কার্ডবোর্ডের মূর্তি লাফিয়ে উঠলো। যান্ত্রিক কোনো ব্যবস্থা রয়েছে ওগুলোকে তোলা এবং নামানোর জন্যে। পুরনো কালের স্প্যানিশ সৈনিকের মূর্তি। ছোট একটা পুরনো কামান চাকায় গড়িয়ে বেরিয়ে এলো পাথরের আড়াল থেকে। জাহাজ লক্ষ্য করে গোলা ফেললো।

'চললো ভয়াবহ লড়াই!' বললেন ক্যাপ্টেন ফিলিপ।

বুম করে ধোঁয়া উদগীরণ করলো আবার জাহাজের কামান। জবাব দিলো তীরের কামানটা।

'শীঘ্রি ডা বুচার্ডের সৈন্যরা তীরে নামলো,' বলছেন ক্যাপ্টেন। 'হটিয়ে দিলো গভর্নর সোলার সৈন্যদের।'

ধীরে এগোচ্ছে ব্ল্যাক ভালচার। গলুইয়ের কাছ থেকে দড়িতে ঝুলে দ্বীপে নামলো দু'জন জলদস্যু, দাঁতে কামড়ে রেখেছে কাঠের ছুরি। ডাঙায় পা দিয়েই কোমর থেকে একটানে ভোজালি বের করে, গালি দিয়ে উঠে কার্ডবোর্ডের সৈন্যগুলোকে আক্রমণ করলো ওরা। ঝোপের মধ্যে পড়ে গেল ওগুলো। দু'জন দস্যুই চেনা কিশোর আর মুসার। একজন সেই টিকেট বিক্রেতা, যার বয়েস আন্দাজ করা যায় না, আরেকজন পিটার ফিলিপ।

'কেন ব্যবসা করতে পারছেন না ক্যাপ্টেন,' মুসা বললো, 'বুঝতে পারছি।'

'আমিও পারছি,' শুকনো গলায় বললো কিশোর।

লাউডস্পীকারে গমগম করছে কণ্ঠ, 'মনটিরের সমস্ত বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে দস্যুরা, শুধু মিশনারি আর কাস্টোম হাউসটা বাদে। তারপর জাহাজ নিয়ে দক্ষিণে রওনা হলো ওরা। পৌঁছলো গিয়ে রিফোজিও কোভ আর ওরটেগা হ্যাসিয়েনডায়। সমস্ত ধনরত্ন একটা ট্রাংকে ভরে রিফোজিও পাস দিয়ে পালালো ওরটেগারা, সান্তা ইনেস মিশনে আশ্রয় নেয়ার জন্যে।'

দ্বিতীয় দ্বীপটায় পৌঁছলো ব্ল্যাক ডালচার। ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলো দু'জন মানুষ, মাথায় কাউবয় হ্যাট, পরনে পুরনো ছাঁটের স্যুট। পিটার আর সেই টিকেট বিক্রেতা। প্রথম দ্বীপটা থেকে পায়ে হেঁটে চলে এসেছে এখানে, পোশাক বদলে নিয়েছে। স্প্যানিশ জমিদার সেজেছে ওরা এখন। ছোট একটা টিলার ওপর দিয়ে একটা ট্রাংক বয়ে নিয়ে চলেছে। লাউডস্পীকারে শোনা যাচ্ছে ছুটন্ত অশ্বারোহী বাহিনী আর জলদস্যুদের চেঁচামেচি।

'ঝাঁকে ঝাঁকে জলদস্যু গিয়ে নামলো তীরে,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'আগুন লাগিয়ে দিলো পুরো ওরটেগা হ্যাসিয়েনডায়।'

ঝোপের ভেতর হারিয়ে গিয়েছিলো, আবার জলদস্যুর পোশাক পরে বেরিয়ে এলো পিটার আর টিকেট বিক্রেতা। হাতে মশাল। আসল মশাল নয়, তৈরি করা হয়েছে ঝাড়ুর ডাণ্ডায় লাল প্ল্যাস্টিকের গোলক বসিয়ে। গোলকের ভেতরে ব্যাটারির সাহায্যে ছোট বাল্ব জ্বলছে। একটা স্মোক বম্ব ফাটলো, ছড়িয়ে দিলো ঘন ধোঁয়া। কার্ডবোর্ড দিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউস বানানো হয়েছে। দেয়ালে লাল রঙ করে বোঝাতে চাইছে, আগুন জ্বলছে। চিৎকার করে সেই আগুনের চারপাশে নাচানাচি শুরু করলো দুই জলদস্যু।

'উপকূল ধরে এগিয়ে চললো দুটো জাহাজ,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'পথে বাড়িঘর যা চোখে পড়লো, সব পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে লাগলো। পৌঁছলো তৎকালীন বুয়েনাভিস্তা কোভে। এখানকার বড় বড় স্প্যানিশ জমিদারেরা শেষ চেষ্টা করলো লস অ্যাঞ্জেলেস আর স্যান ডিয়েগোর শহরগুলোকে বাঁচানোর।'

খাঁড়ির সব চেয়ে বড় দ্বীপটার দিকে এগোচ্ছে জাহাজ। কার্ডবোর্ডের অসংখ্য মূর্তি উঠে দাঁড়াচ্ছে ঝোপের ভেতর থেকে। রঙ দিয়ে পোশাক এঁকে বোঝানো হয়েছে কোনটা কোন ধরনের মানুষ। কাঁচা হাতে রঙ করা হয়েছে। বেশির ভাগই রঙ নষ্ট হয়ে গেছে। কিছু মূর্তি ভেঙে গেছে কয়েক জায়গায়। প্রথমে পাহাড়ের গোড়ায় দেখা দিলো একসারি মূর্তি, আরেক সারি মূর্তি লাফিয়ে উঠলো পানির কিনারে। লাউডস্পীকারে বাজতে লাগলো প্রচণ্ড লড়াইয়ের শব্দ—কামানের গর্জন, জলদস্যু আর স্প্যানিশ সৈন্যদের চিৎকার, তলোয়ারের ঝনঝন। এতো কিছু ঘটছে, কিন্তু দর্শকদের তাতে কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। এমন ভঙ্গিতে তাকিয়ে রয়েছে, যেন পুরো ব্যাপারটাই হাস্যকর আর একঘেয়ে লাগছে তাদের কাছে।

উত্তেজিত করার যথেষ্ট চেষ্টা করছেন ক্যাপ্টেন ফিলিপ। 'প্রাণপণে যুদ্ধ করলো

স্প্যানিশরা, কিন্তু জলদস্যুরাই জিতলো। এখন আমরা যে খাঁড়িটায় রয়েছি, এটারই নাম ছিলো তখন বুয়েনাভিস্তা কোভ। জলদস্যুরা জেতার পর থেকেই এর নাম হয়ে গেল পাইরেটস কোভ। ডা বুচার্ড আর তার সহযোগীরা ধ্বংস করে দিলো সমস্ত হ্যাসিয়েনডা, লুটপাট করলো ইচ্ছেমতো। রওনা হলো আরও দক্ষিণে। একের পর এক শহর ধ্বংস করে দিয়ে কেবল এগিয়েই গেল ওরা, ফিরলো না আর কোনোদিনই। তবে পাইরেটস কোভের নাম আর ধ্বংসস্তূপই শুধু ফেলে যায়নি, মূর্তিমান একটা মারণাস্ত্রও ফেলে গিয়েছিলো। তার নাম বেগুনী জলদস্যু!'

নাটকীয় ভঙ্গিতে শেষ দ্বীপটার দিকে হাত তুললেন ক্যাপ্টেন। সিমেন্টের একটা বেদির ওপর সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা মূর্তি, হাতের ভোজালিটা কোপ মারার ভঙ্গিতে তুলে রেখেছে। মোটা, খাটো এক লোকের মূর্তি। হ্যাট থেকে শুরু করে পায়ের জুতো পর্যন্ত, সব কিছুর রঙ বেগুনী। ঢোলা বেগুনী আলখেল্লার কিনারে সোনালি কাজ করা। ঢোলা প্যান্টের রঙ বেগুনী। মুখের নাক-ঢাকা বেগুনী মুখোশের নিচে ইয়াবড় পাকানো গোঁফ। বিকট করে তুলেছে চেহারাটাকে। কোমরের বেগুনী বেল্টে ঝুলছে পুরনো ধাঁচের পিস্তলের খাপ। গোড়ালি ঢাকা উঁচু বুটের ভেতরে ঢোকানো বড় ছুরি।

'লেফেটেন্যান্ট উইলিয়াম ইভানস,' বলে চলেছেন ক্যাপ্টেন, 'সান্তা রোসার সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড। ডা বুচার্ডের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিদ্রোহ করেছিলো, খুন করেছিলো পেড্রো কোনডেকে। জাহাজে করে চলে এসেছিলো পাইরেটস কোভে। এখানে জলদস্যুদের একটা ঘাঁটি গড়ে তুলেছিলো সে, নিজের জাহাজ করেছিলো, নাম দিয়েছিলো ব্ল্যাক ভালচার। উপকূলে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছিলো বহু বছর ধরে। সব সময় বেগুনী রঙের পোশাক পরে থাকতো সে, যাতে নাম হয়ে যায়। বিখ্যাত হতে পারেনি, সত্যি, তবে ভীষণ কুখ্যাত যে হয়েছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জলে, স্থলে, সবখানে ছিলো তার জয় জয়কার। তার বিরুদ্ধে পাঠানো কোনো সেনাবাহিনীই জিততে পারেনি বহু বছর ধরে। তবে মাঝে মাঝে কোণঠাসা যে হতো না, তা নয়। কোণঠাসা হলেই এসে ঢুকতো তার পাথরের দুর্গে। শক্তি সঞ্চয় করে আবার বেরোতো। পরাজিত করে ছাড়তো হামলাকারীদের। তবে একদিন তার দুর্গ 'বেগুনী জলদস্যুর আড্ডা'য় ঢুকে আর বেরোলো না সে। সেটা আঠারোশো চল্লিশ সালে। বাইরের সৈন্যরা ভাবলো, আটকে ফেলেছে, এবার ধরতে পারবে। কিন্তু পারলো না। দুর্গের ভেতর থেকেই গায়েব হয়ে গেল সে। তারপর আর কেউ কোনোদিন দেখেনি তাকে। তার বংশধররাই এখনও এই উপদ্বীপ আর টাওয়ারের মালিক।'

ক্যাপ্টেনের কাহিনী শেষ হলো। মুখ ঘোরালো ব্ল্যাক ভালচার, দ্বীপগুলোর পাশ দিয়ে ফিরে চললো। চার তলা পাথরের দুর্গটা দেখালেন ক্যাপ্টেন। নির্জন, শূন্য লাগছে বাড়িটা।

ফিরে এলো টিকেট বিক্রেতা আর পিটার। শো শেষ হয়েছে। দর্শকদের মনে কোনোই দাগ কাটতে পারলো না 'জলদস্যুদের নাটক'। শুধু বেগুনী জলদস্যুর কাহিনী যা-ও বা একটু কেটেছে, তা-ও নষ্ট করে দিলো এয়ার ট্যাক্সি সার্ভিসের একটা বিমানের গর্জন।

'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন,' ক্যাপ্টেন বললেন, 'আমাদের অভিযান শেষ হয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ার কুখ্যাত বেগুনী জলদস্যুর ইতিহাস জানলেন আপনারা। ডকে ফিরে যাচ্ছি আমরা। খিদে পেলে খেতে পারেন ওখানে, ব্যবস্থা আছে। স্যুভনির কিনতে পারে। যতো সময় ইচ্ছে কাটাতে পারবেন ওখানে, কেউ মানা করবে না। আবার যদি আসতে চান, তা-ও পারেন। পনেরো মিনিটের মধ্যেই আবার শো শুরু হবে।'

হেসে উঠলো কয়েকজন, কয়েকজন বিড়বিড় করলো। একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল, দ্বিতীয়বার আর এই ছেলেমানুষী দেখার ইচ্ছে কারো নেই। জাহাজ তীরে ভিড়তেই সিঁড়ি বেয়ে নেমে পড়লো সবাই। স্যুভনিরের দোকানের সামনে থামলো কয়েকজন। হংকং থেকে আমদানী করা প্ল্যাস্টিকের জাহাজের মডেল, ছুরি, খুদে ভোজালি আর আরও নানারকম জিনিস রয়েছে, জলদস্যুরা যেসব জিনিস ব্যবহার করতো, তার নকল। কেউই তেমন আগ্রহ দেখালো না ওগুলোর প্রতি। মারিয়া, সেই মেকসিকান মেয়েটা টিকেট বিক্রি বন্ধ রেখে এসে এখন খাবারের দোকান চালাচ্ছে। কয়েকটা ছেলে মা-বাবার কাছে বায়না ধরলো কোক আর হটডগ কিনে দেয়ার জন্যে। কিশোর আর মুসা এসে দাঁড়ালো ওখানটায়। ক্যাপ্টেন ফিলিপের আসার অপেক্ষায়। কিন্তু তিনি এলেন না। এমনকি তাঁর ছেলে পিটারও না।

'আসবে না,' মুসা বললো।

'তাই মনে হচ্ছে,' একমত হলো কিশোর। 'কিন্তু অন্য সময় থাকে কোথায়? বাড়িটাড়ি নিশ্চয় আছে।'

মিউজিয়মের পেছনে উঁকি দিয়ে দেখলো ওরা। কোনো বাড়িঘর চোখে পড়লো না, শুধু ওক গাছের জটলার মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাথরের টাওয়ারটা। তবে খাবারের দোকান আর স্যুভনির স্ট্যাণ্ডের পেছনে বড় একটা হাউস ট্রেলার দেখতে পেলো ওরা। দ্রুত গিয়ে দাঁড়ালো ওটার কাছে। দরজায় লাগানো একটা মলাটের টুকরোর ওপর নাম লেখা রয়েছেঃ ক্যাপ্টেন রোজার ফিলিপ।

পাওয়ার আশা নেই, তবু এগিয়ে গিয়ে দরজায় টোকা দিলো কিশোর। সাড়া মিললো না।

'জাহাজ থেকেই নামেননি হয়তো,' আন্দাজে বললো মুসা।

'আমার তা মনে হয় না। হয়তো ভেতরেই আছেন। টোকা শুনতে পাননি।'

ট্রেলারের সামনের দিকে জানালাগুলোয় ভারি পর্দা টানা। পেছনটা ফেরানো

রয়েছে খাঁড়ির দিকে, লম্বা পিয়ার আর কারখানাটা রয়েছে যেদিকে। ওদিকের একটা জানালা খোলা দেখা গেল। উঁকি দিয়ে ভেতরে কি আছে দেখতে গেল কিশোর।

'কি-কি-কিশোর!' তোতলাতে লাগলো মুসা।

ঝট করে মাথা ঘোরালো কিশোর। জ্বলন্ত চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বেগুনী জলদস্যু। মুখে মুখোশ। হঠাৎ বিকট চিৎকার করে উঠে ভোজালি উঁচিয়ে ছুটে এলো সে।

সাত

ভোজালিটার দিকে তাকিয়ে ঢোক গিললো মুসা। কিশোর চুপ।

'দিনে দুপুরে চুরি করতে এসেছো, না!' চিৎকার করে বললো বেগুনী জলদস্যুরূপী টিকেট বিক্রেতা।

'আ-আ-আমরা ক্যাপ্টেন ফিলিপকে খুঁজছিলাম,' মুসা বললো। 'চো-চো-চো…'

'চুপ! আবার মিছে কথা! জানালা দিয়ে উঁকি মেরে মানুষ খুঁজছিলে!' দাঁতে দাঁত ঘষলো লোকটা। 'দিনেও আসে, রাতেও!'

'রাতে?' কথাটা ধরলো কিশোর। 'প্রায়ই আসে নাকি?'

'আসে কিনা জানো না?'

এই সময় ট্রেলারের কোণ ঘুরে বেরিয়ে এলো পিটার ফিলিপ। অবাক হয়ে তাকাতে লাগলো তিনজনের দিকে। কিশোর আর মুসাকে চিনতে পারলো। 'আরি, তোমরা?'

তাড়াতাড়ি বললো মুসা, 'তোমার আব্বাকে খুঁজতে এসেছিলাম, পিটার।'

'ওদের চেনো?' সন্দেহ যায়নি টিকেট বিক্রেতার।

'চিনি, জেসন আংকেল। আমাদের ইস্কুলে পড়ে। ওটা নামান।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভোজালিটা খাপে ভরে রাখলো জেসন। মুখোশ খুললো। 'গত দু'রাত ধরে চোরের আনাগোনা বড্ড বেড়েছে!'

'জেসন আংকেলেরও দোষ নেই,' কৈফিয়তের সুরে বললো পিটার। 'সন্দেহ হবেই। ইদানীং বড় বেশি চোর আসে। …আংকেল, ও কিশোর পাশা। আর ও মুসা আমান।' ওদেরকে বললো, 'ইনি আব্বার হেলপার, জেসন গিলবার্ট। ডাক নাম নোনতা জেসন।'

'নোনতা?' বিড়বিড় করলো কিশোর। 'তারমানে জাহাজে কাজ করেছেন? নাবিক ছিলেন?'

'নেভিতে বিশ বছর চাকরি করেছি,' জেসন বললো।

'পাইরেটস কোভে এই প্রথম এসেছি আমরা। ক্যাপ্টেন ফিলিপের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে ছিলো। মেজর নিরেকের কথা কিছু জিজ্ঞেস করতাম।'

'কফি মেশিনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল,' পিটার বললো। 'সেটা দেখছে আব্বা। এসো।'

কফি স্ট্যাণ্ডেই পাওয়া গেল ক্যাপ্টেনকে। রেগে যাওয়া বেঁটে এক টুরিস্টকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন।

'ঠকানো হয়েছে আমাদের!' ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো লোকটা। 'পাইরেট শো না ছাই! টাকা ফেরত দিন!'

'আপনার ভালো লাগেনি, সেজন্যে আমরা দুঃখিত, স্যার,' শান্ত কণ্ঠে বললেন ক্যাপ্টেন। 'কিন্তু টাকা ফেরত দেয়া যাবে না। সব জিনিসই সবার কাছে ভালো লাগবে, এমন কোনো কথা নেই। অমন যে বিখ্যাত ডিজনিল্যাণ্ড, সেটাও তো ভালো লাগে না অনেকের কাছে। তারা কি টাকা ফেরত পায়?'

জ্বলে উঠলো লোকটার চোখ। 'ওরা আপনাদের মতো মিথ্যে কথা বলে না! আপনারা স্রেফ ঠকিয়েছেন। বেশ, দেখে নেবো আমি। বেটার বিজনেস বুরোতে নালিশ করবো!'

কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা একজন মহিলা আর ছেলেকে ইশারায় সঙ্গে যেতে বলে পার্কিং লটের দিকে এগোলো সে। বেগুনী একটা রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলেন ফিলিপ। পিটারের দিকে চোখ পড়তে আফসোস করে বললেন, 'আর কদ্দিন এভাবে চলবে বুঝতে পারছি না! টাকাও পাচ্ছি না, ঠিকমতো চালাতেও পারছি না সব!'

'বন্ধই করে দিন, ক্যাপ্টেন,' হাত নেড়ে হতাশ কণ্ঠে বললো নোনতা জেসন। 'হবে না যখন, হবেই না। খালি খালি কষ্ট করে, লোকের কথা শুনে লাভ আছে?'

কথাটা পছন্দ হলো না পিটারের। কড়া চোখে একবার জেসনের দিকে তাকিয়ে বাবার দিকে ফিরলো। 'হবে। চেষ্টা করলেই হবে।'

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন ক্যাপ্টেন। 'হয়তো হবে। ঘন্টায় পঁচিশ ডলারে যদি গল্প জোগাড় করতে পারে মেজর, আর দিতে থাকে আমাদের, দর্শক ধরে রাখা হয়তো যাবে।'

'আমি জানি, আব্বা, মেজর পারবে।'

'স্যার,' গলা পরিষ্কার করলো কিশোর। 'এই ব্যাপারেই আলোচনা করতে এসেছিলাম আমরা।'

'আলোচনা?' কিশোর আর মুসার দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকালেন ক্যাপ্টেন। 'কে তোমরা?'

'আমাদের ইস্কুলেই পড়ে।' পরিচয় করিয়ে দিলো পিটার। 'মেজর নিরেকের ব্যাপারে কথা বলতে চায় তোমার সঙ্গে।'

'কি কথা?' ক্যাপ্টেন জানতে চাইলেন।

'মেজর কি করছেন?' বলে উঠলো মুসা।

'তাঁকে সন্দেহ হয় আমাদের,' বললো কিশোর।

'সন্দেহ!' কিশোরের কথার প্রতিধ্বনি করলেন যেন বেগুনী জলদস্যুর আড্ডার মালিক। 'মেজর নিরেককে সন্দেহ! আশ্চর্য! দিন দিন মানুষগুলো যে সব কি হয়ে যাচ্ছে! নিজের চরকায় তেল দেয়া যেন বন্ধ করে দিয়েছে সবাই!'

মেজর নিরেক আর রিগোর বেরোনোর অপেক্ষায় রইলো রবিন। বেরোলো ওরা। ভ্যান নিয়ে রওনা হলো। পেছনে চিহ্ন দেখে দেখে অনুসরণ করলো সে।

পাইরেটস কোভে চলে গেছে চিহ্নগুলো। পার্কিং লট পেরিয়ে গিয়ে ঢুকেছে বেগুনী জলদস্যুর আড্ডার ভেতরে। হাতে গোনা কয়েকটা গাড়ি দেখা গেল লটে। মাত্র দু'জন দর্শক দাঁড়িয়ে রয়েছে আইস ক্রীম ভ্যানটার সামনে। ওটার পাশ দিয়ে চলে গেছে চিহ্ন। ঢুকে গেছে ছোট বনের ভেতরে। হ্যারিসনস ট্রী সার্ভিসের একজন শ্রমিক ট্রাকের ওপর দাঁড়িয়ে একটা গাছের যেন কি করছে। এদিক ওদিক তাকালো রবিন। ভ্যানটাও চোখে পড়লো না, মেজর কিংবা রিগোকেও দেখলো না। একটা রাস্তা ধরে উত্তরে চলে গেছে চিহ্ন।

ভাবছে রবিন। আইস ক্রীম ভ্যান! ট্রী-সার্ভিস ট্রাক! এসব গাড়ি নিয়ে মেজরের চত্বরে ঢুকেছিলো দু'জন ড্রাইভার, তারপর বেরিয়ে গেছে। ওরাই এসেছে এখানে,পাইরেটস কোভে। চিহ্ন যখন রয়েছে, মেজরও এসেছেন। কেন? লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলে চলে গেছেন আবার?

সাইকেলটা ঝোপের ভেতর লুকিয়ে রেখে পা টিপে টিপে ট্রী-সার্ভিস ট্রাকটার কাছে চলে এলো রবিন। লোকটাকে দেখলো ভালোমতো। চিনতে পারলো। টনি! কি মনে হতে ফিরে তাকালো আইস ক্রীম বিক্রেতার দিকে। চিনতে পারলো তাকেও। খাটো, মোটা, টাকমাথা লোকটা, যার নাকের নিচে বেমানান গোঁফ।

তার মানে ছদ্মবেশী ওরা সবাই! কেন এসেছে? নিশ্চয় বেগুনী জলদস্যুর আড্ডার ওপর চোখ রাখতে। চব্বিশ ঘন্টাই চোখ রাখার ব্যবস্থা করেছে ওরা।

ট্রাকের পেছনে বসানো লম্বা লিফটটা তুলে নিলো টনি। ওপরে উঠে গেল। তারপর বিনকিউলার বের করে দেখতে লাগলো। কি দেখছে, বুঝতে পারলো না রবিন। বেড়া আর গাছপালার জন্যে দেখতে পাচ্ছে না সে। দ্রুত মনস্থির করে নিলো। নিরেক আর রিগো কোথায় গেছে, পরেও দেখা যাবে। আপাতত টনি কি দেখছে সেটা জানা দরকার।

গাছপালার ভেতর দিয়ে সরে চলে এলো রবিন, আড্ডার উল্টোদিকে। ফিরে তাকালো। ডানে নজর লোকটার। কারো দিকে না তাকিয়ে হেঁটে চললো রবিন। আইস ক্রীম ওয়ালার পাশ কাটালো। টিকেট বুদ বন্ধ হয়ে গেছে, তবে গেট খোলা। ঢুকে পড়লো সে। হঠাৎ মোড় নিয়ে ঢুকে গেল ওকের জঙ্গলের মধ্যে, যেগুলোর অন্যপাশে রয়েছে পাথরের টাওয়ারটা।

টাওয়ারের কাছে এসে থামলো সে। চারতলা পুরনো বাড়ি। উপদ্বীপের উত্তরে, পানির ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। কাঠের বেড়া দেয়া আছে, রাস্তা থেকে সরাসরি যাতে কেউ ঢুকতে না পারে এখানে। গাছপালার পরে, টাওয়ারের লাগোয়া আর কিছু নেই, শুধু লন, আর বালিতে ঢাকা চত্বর। পুরনো একটা বোটহাউস রয়েছে, ধসে পড়েছে এখন। কি দেখছে টনি? টাওয়ার? না ওই ভাঙা বোট-হাউস? বোট-হাউসের ভেতরেই প্রথমে দেখার সিদ্ধান্ত নিলো রবিন।

কালচে হয়ে গেছে বোটহাউসের তক্তাগুলো। ক্ষয়া। সামনের দিকে একটামাত্র জানালা। বড় দরজাটা বন্ধ। বাঁয়ে কাত হয়ে রয়েছে ঘরটা, বেশ কিছু তক্তা খসে গেছে। বেগুনী জলদস্যুর আমল থেকেই বোধহয় আছে ওটা ওখানে।

জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিলো সে। চোখে পড়লো শুধু কালো পানি। দরজায় ঠেলা দিয়ে খোলার চেষ্টা করলো।

আচমকা শক্ত কি যেন লাগলো পিঠে। ঠেসে ধরা হয়েছে।

'ঘোরো, খোকা,' আদেশ দিলো একটা ভারি কণ্ঠ। 'খুব ধীরে।'

ঘুরে দাঁড়ালো রবিন। চওড়া কাঁধ, মাঝারি উচ্চতার একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। পরনে শাদা ট্রাউজার, পায়ে দড়ির স্যাণ্ডাল, গায়ে নীল টি-শার্ট। হাতের পিস্তলটা ধরে রেখেছে রবিনের পেট বরাবর।

আট

ক্যাপ্টেন ফিলিপ এভাবে নিরাশ করবেন, ভাবেনি কিশোর আর মুসা। যাওয়ার জন্যে ঘুরলো।

পিটার বলে উঠলো, 'আব্বা, ওদেরকে আমি চিনি। কি বলতে এসেছে, অন্তত শোনো তো?'

'আরে দূর! কি আবার বলবে? গোলমাল পাকাতে এসেছে,' হাত নেড়ে উড়িয়ে দিলো যেন নোনতা জেসন। 'যাক, বেরিয়ে যাক।'

অতোটা রুক্ষ ব্যবহার করলেন না ক্যাপ্টেন। 'আমার কাজ আছে। ঠিক আছে, পাঁচ মিনিট সময় দিলাম। জেসন, টিকেট বুদে যাও। এই, তোমরা এসো আমার সঙ্গে।'

দুই গোয়েন্দাকে ট্রেলারে নিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন। কাউচ দেখিয়ে ওদেরকে বসার ইঙ্গিত করলেন। পিটার বসলো একটা চেয়ারের হাতলে।

'বলে ফেলো,' ফিলিপ বললেন।

দু'দিন আগের সাক্ষাৎকারের কথা সংক্ষেপে বললো কিশোর। কি করে ঠকিয়েছেন মেজর, সে কথাও জানালো।

'ঠকালো কোথায়?' প্রশ্ন তুললেন ক্যাপ্টেন। গল্প পছন্দ হয়নি, টাকা দেয়নি,

ব্যস। মুছে ফেলেছে। পছন্দ না হলে টাকা কেন দেবে?'

'বিজ্ঞাপনে তো সেকথা বলেনি,' মুসা বললো। 'বলেছে, যে-ই গল্প শোনাবে, তাকেই দেবে।'

'এটা হতে পারে না। যে যা খুশি শুনিয়ে আসবে, তার জন্যেই টাকা দিতে হবে নাকি? বিজ্ঞাপনটা লেখা হয়নি ঠিকমতো।'

'বেশ, ধরে নিলাম লেখা হয়নি। কিন্তু গল্প পুরোটা না শুনেই কি করে বুঝলেন উনি, ভালো না মন্দ? শুরু করতে না করতেই তো থামিয়ে দিয়েছেন অনেককে।' কিশোর বললো।

'যে বোঝার সে অল্প শুনেই বুঝতে পারে। তাছাড়া পয়লা দিন অনেক বেশি লোক চলে এসেছিলো। কি করে শুনবে এতো লোকের গল্প? বরং বুদ্ধিটা ভালোই বের করেছিলো, শহরের বাইরে থেকে যারা এসেছিলো তাদের গল্প শুনবে।'

'তাহলে ওকথাও বিজ্ঞাপনে লিখে দিতে পারতো,' পিটার বললো। 'শহরের ভেতরের কারো গল্প যদি না-ই শুনবে তাহলে ঢালাও ঘোষণা দেয়া কেন? অবিচার করা হলো না? ডেকে এনে ফিরিয়ে দেয়া? আমি হলে সোজা গিয়ে পুলিশকে রিপোর্ট করে দিতাম।'

ছেলের কথার জবাব দিতে পারলেন না ক্যাপ্টেন। দ্বিধা করলেন। 'ইয়ে...'

চাপটা বাড়ালো কিশোর, 'লোকের বাড়ি বাড়ি সার্কুলার দিয়ে আসার কি প্রয়োজন ছিলো? সাক্ষাৎকারই যদি না নেবে, কেন এই অহেতুক হয়রানী?'

'তা ঠিক,' গাল চুলকালেন ক্যাপ্টেন। 'তবে মনে হয় আমার আর পিটারের গল্পই শুধু শুনতে চেয়েছে।'

'তাহলে শুধু আপনাকে ডেকে নিয়ে গেলেই পারতেন। আর তা-ই বা কি করে বলবেন? আপনার বলে আসা গল্পও তো মুছে ফেলেছেন মেজর।'

'আমারটাও মুছেছেন!'

'নিজের চোখে দেখেছি!' জোর পেয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।

'অসম্ভব! তোমরা কি জন্যে এসেছো...'

'আব্বা,' বাধা দিয়ে বললো পিটার, 'ঘাপলা একটা আছে। মুসা আর কিশোর খুব ভালো গোয়েন্দা। আমার মনে হয় না ওরা ভুল করছে।'

'ডিটেকটিভ? এই বয়েসে অনেক ছেলেই গোয়েন্দা সাজতে চায়। এক ধরনের খেলা।'

'মোটেও খেলা নয়, স্যার।' গম্ভীর হয়ে গেছে কিশোর। পকেট থেকে প্রথমে তিন গোয়েন্দার কার্ড, তারপর পুলিস ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারের প্রশংসাপত্র বের করে দিলো।

পড়লেন ফিলিপ। মাথা দোলালেন। 'হুঁ, পুলিসের একজন চীফ ফালতু কথা বলবেন না। তোমাদের সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা তাঁর। কিন্তু কিশোর, মানুষ মাত্রেই

ভুল করে। আমার বিশ্বাস, মেজরের ব্যাপারেও তোমরা ভুল করছো।'

'আগে বলো তাহলে,' চেপে ধরলো পিটার, 'তোমার গল্প মুছলো কেন?'

'হতে পারে, টেকনিক্যাল কোনো কারণ ছিলো। কিংবা পরে বিশেষ টেপে রেকর্ড করার কথা ভেবেছিলো। দু'দিন ধরেই তো আমাদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছে। ওগুলো নিশ্চয় মুছছে না।'

'জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন, স্যার,' পরামর্শ দিলো কিশোর।

ভ্রূকুটি করলেন ক্যাপ্টেন। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বক্তব্যটা কি, বলে ফেলো তো?'

'আমার ধারণা, পুরো ঘটনাটাই ঘটিয়েছেন মেজর, আপনাকে আর পিটারকে হাতে পাওয়ার জন্যে।'

'কিন্তু আগে কখনও পরিচয় ছিলো না মেজরের সঙ্গে! কখনও তার নামও শুনিনি। আমাদের কাছে কি চায়? টাকা নেই, পয়সা নেই, কিচ্ছু নেই আমাদের। এই শো বিজনেস চালিয়ে কোনোমতে খেয়েপরে বেঁচে আছি। তা-ও যায় যায় অবস্থা।'

'কিন্তু বিরাট এলাকা আপনার,' মুসা বললো। 'অনেক জমি। হয়তো ওগুলো চায়?'

'আমার জমি নয় এটা, মুসা। ইভান পরিবারের কাছ থেকে লীজ নিয়েছি।'

'ইভান পরিবার?' চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকালো কিশোর।

মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন। 'হ্যাঁ। পুরনো সেই জলদস্যুর বংশধর। এই কোভের মালিক এখনও ওরাই।'

'আপনি না বললেন ইভান গায়েব হয়ে গেছে?' মুসার প্রশ্ন।

হাসলেন ক্যাপ্টেন। 'গিয়েছিলো। তারপর আবার ফিরে এসেছে। নতুন বেশে। তবে সেকথা বলি না শো-এর সময়। অযথা নাটকটা নষ্ট করে লাভ কি? স্রেফ গায়েব হয়ে যাওয়ার মধ্যে একটা অন্যরকম ব্যাপার থাকে।'

কিশোর জিজ্ঞেস করলো, 'রাতে নাকি এখানে চোর আসে?'

'চোর কিনা বলতে পারবো না। রাতে ঘুরতেও বেরোয় অনেক মানুষ, নির্জন জায়গা দেখলে বেড়াতে চলে আসে। তাছাড়া কাছে দিয়েই গেছে রেললাইন। কাজেই দু'চারটে ভবঘুরে যে নেমে না পড়ে তা নয়। আমাদের বড়িঘরগুলোকে ঘুমানোর জায়গা হিসেবে বেছে নেয়।' কিশোরের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন। 'দেখো, মেজরের ব্যাপারে ভুল করছো তোমরা। এমন কিছু নেই আমাদের কাছে, যার জন্যে আমরা তার কাছে দামী হয়ে যাবো।'

'আব্বা,' শেষ চেষ্টা করলো পিটার, 'কিছু না হোক, তিন গোয়েন্দাকে কাজ করতে দিতে অসুবিধে কি আমাদের? কিছু বেরিয়েও তো যেতে পারে?'

'না, দরকার নেই,' দৃঢ়কণ্ঠে বললেন ক্যাপ্টেন। 'অযথা ভালো মানুষকে

হয়রানী করা আমার পছন্দ নয়। তাছাড়া ভালো টাকা দিচ্ছে আমাদেরকে মেজর। এক ঘন্টা গল্প বলার জন্যে কে পঁচিশ ডলার করে দেবে? আমি সেটা হারাতে চাই না। তোমরা ওকে খোঁচাতে যাবে না, ঠিক আছে?'

কিশোর কিংবা মুসা জবাব দেয়ার আগেই বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল, 'ফিলিপ! দরজা খুলুন! বলেছিলাম না, চোর আসে!'

নয়

'ভিকটর ইভানস!' উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন ক্যাপ্টেন।

নীল টি-শার্ট পরা মাঝারি উচ্চতার একজন মানুষ ট্রেলারে ঢুকলো। মুখ রাগে লাল। 'এই ফিলিপ, বলেছিলাম না খেয়াল রাখতে? টাওয়ারে লোক যায় কেন? একটা ছেলে বোটহাউসে ঢোকার চেষ্টা করছিলো। জিজ্ঞেস করলাম, বললো গোয়েন্দা। হুঁহ্! আপনার কাজ নাকি করছে।'

'রবিন!' প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলো কিশোর আর মুসা।

'কী?' দরজা দিয়ে বাইরে উঁকি দিলো ভিকটর। 'এই ছেলে, এসো, ঢোকো।' রবিন ট্রেলারে ঢুকলে তাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এটাকে চেনো, ফিলিপ? চোর-টোর না তো?'

'না!' গরম হয়ে বললো মুসা। 'চোর আমরা কেউই নই।'

চোখ পাকিয়ে মুসার দিকে তাকালো আগন্তুক। 'তোমার সঙ্গে কথা বলে কে? ফিলিপ, এটাকে ওরা চেনে কি করে?'

'সরি, ভিকটর,' ক্যাপ্টেন বললেন, 'আপনাকে বিরক্ত করেছে। ওদের হয়ে আমি মাপ চাইছি। ওরা পিটারের বন্ধু। আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে…'

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললো কিশোর, 'বেগুনী জলদস্যুর কাহিনী শুনতে, স্যার। ইস্কুলের ম্যাগাজিনে লিখবো। ওর নাম রবিন, গবেষণার কাজগুলো সে-ই করে। তিনজনে একসাথে কাজ করি আমরা। জায়গাটা ভালোমতো দেখতে গিয়েছিলো, বর্ণনা দেয়ার জন্যে। আপনাকে বিরক্ত করার, কিংবা আপনার জায়গার ক্ষতি করার কোনো ইচ্ছেই ওর নেই। টাওয়ারে তাহলে আপনিই থাকেন। ভিকটর ইভানস, তার মানে কি বেগুনী জলদস্যু উইলিয়াম ইভানসের বংশধর আপনি?'

মোরগের মতো ঘাড় কাত করে কিশোরের দিকে তাকালো ভিকটর। 'খুব চালাক মনে হচ্ছে? ম্যাগাজিনে লেখ বা জাহান্নামে লেখ, সেটা তোমাদের ব্যাপার। খবরদার, আমার এলাকার ধারেকাছে আসবে না! ওকের সারিটার ওদিকে আর যাবে না, মনে থাকে যেন।' ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরে বললো, 'এবার ছেড়ে দিলাম। আপনাকেও বলে দিচ্ছি, টুরিস্ট হোক আর যে-ই হোক, আমার সীমানায় যেন না ঢোকে।'

'ঢুকবে না,' কথা দিলেন ফিলিপ।

'না ঢুকলেই ভালো।' বেরিয়ে গেল ভিকটর। দড়াম করে লাগিয়ে দিয়ে গেল ট্রেলারের দরজা।

লোকটা বেরিয়ে যেতেই কিশোরের দিকে ফিরলেন ক্যাপ্টেন। 'আসল কথা ভিকটরকে বললে না কেন?'

'কথা গোপন রাখতে হয় গোয়েন্দাদের। যাকেতাকে সব বলে দেয়া উচিত না। মিস্টার ইভানসকে চিনি না, কি কাজ করে তা-ও জানি না। অচেনা একজন মানুষকে পেটের কথা কেন বলবো?'

'তা বটে,' আনমনে ঘাড় দোলালেন ক্যাপ্টেন।

'চোরের ওপর খুব রেগে আছে মনে হয়?'

'চোরকে কে পছন্দ করে? তাছাড়া বিনা অনুমতিতে কেউ ওর এলাকায় ঢুকলে রাগ তো করবেই।'

'আচ্ছা,' মুসা বললো, 'জলদস্যু আবার সম্পত্তির মালিক হয় কি করে? সেটা আবার বংশধরদের জন্যে রেখেও যায়? মানে, নিজেই তো একটা অপরাধী। রাষ্ট্র কি স্বীকৃতি দেয়?'

ক্যাপ্টেন হাসলেন। 'উইলিয়াম ইভানস খুব চালাক মানুষ ছিলো, মুসা। শুনেছো, কখনও ধরা পড়েনি সে। ১৮৪০ সালের সেই দিনে টাওয়ার থেকে গায়েব হয়ে যায়। কিন্তু স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের রেখে যায়। আঠারোশো আটচল্লিশ সালে আবার এসে হাজির হয় একদিন, আমেরিকান সৈনিকের বেশে, মেকসিকানদের বিরুদ্ধে লড়াই চলছে তখন। আমেরিকা জিতলো, ক্যালিফোর্নিয়া হয়ে গেল ইউনাইটেড স্টেটসের অংশ। যুদ্ধে জেতার পুরস্কার হিসেবে আমেরিকান সরকারের কাছ থেকে তার জায়গা ফেরত পায় ইভানস। কারণ, কেউ প্রমাণ করতে পারেনি যে সে-ই বেগুনী জলদস্যু। তখন আঙুলের ছাপ দেখে অপরাধী ধরার উপায় জানা ছিলো না কারো। বেগুনী জলদস্যু কখনও ধরাও পড়েনি কারো হাতে। তার কোনো ছবি ছিলো না, যা দেখে বলবে বেগুনী জলদস্যু আর উইলিয়াম ইভানস একই লোক। কাজেই সৈনিক হিসেবে জায়গাটা সরকারের কাছ থেকে নিতে কোনো অসুবিধে হলো না তার। তার পর অনেক বছর গেল। তার বংশধরেরা জায়গা বিক্রি করে করে ছোট করে ফেললো। বাকি রইলো শুধু ওই টাওয়ার আর উপদ্বীপটা। ভিকটরও কোথায় চলে গিয়েছিলো। বহু বছর পরে আবার ফিরে এসেছে।'

'কতো দিন আগে?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'এই বছর খানেক।'

'এতো দিন!' হতাশই মনে হলো কিশোরকে।

ঘড়ি দেখলেন ক্যাপ্টেন। 'এহহে, পরের শো-এর সময় হয়ে গেছে।'

'তুমি যাও, আব্বা, আমি আসছি।' তিন গোয়েন্দার সঙ্গে বেরোলো পিটার। বাইরে উজ্জ্বল রোদ, লুকোচুরি খেলছে যেন গাছপালার ফাঁকে। গেটের বাইরে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে কয়েকজন দর্শক।

'সত্যি কি মেজর আমাদের সঙ্গে ফাঁকিবাজি করছে?' পিটারের প্রশ্ন।

'করছে,' জবাব দিলো কিশোর। 'তাতে কোনো সন্দেহ নেই আমার।'

'যা দেখলাম আজ,' রবিন বললো কিশোরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে, 'তাতে সন্দেহ আমারও নেই।'

ছদ্মবেশে এসে টনি আর আইসক্রীমওয়ালাকে কি করতে দেখেছে, খুলে বললো সে। 'আলুর বস্তা,' 'ব্যাটারি' আর মাটি খোঁড়ার যন্ত্রপাতিগুলোর কথাও বললো।

শুনে পিটার বললো, 'চলো, আব্বাকে গিয়ে সব বলি!'

মাথা নাড়লো কিশোর। 'লাভ হবে না এখন বলে। আমাদের কথা বিশ্বাস করতে চাইবেন না। আরও জোরালো প্রমাণ জোগাড় করতে হবে আমাদের। জানার চেষ্টা করবো, মেজর আর তার চেলারা কিসের পেছনে লেগেছে। রবিন, বেগুনী জলদস্যুর কথা লোকাল হিস্টরি কি বলে, জানার চেষ্টা করো। মুসা, তুমি পাইরেটস কোভের ইতিহাস জানবে। আর আমি জানবো, ক্যাপ্টেন ফিলিপের অতীত কি বলে। পিটার, তুমি কি চাও এই রহস্যের সমাধান হোক?'

'নিশ্চয়ই চাই,' আগ্রহের সঙ্গে বললো পিটার। 'আমাকে কি করতে হবে?'

'মাথা খাটাবে। তোমার বাবার অতীত জানার চেষ্টা করবে। মেজর নিরেক তাঁর ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড কেন, বোঝা দরকার। তোমাদের শেষ শো তো চারটেয়। আমাদের স্যালভিজ ইয়ার্ডে কখন দেখা করতে পারবে?'

'সাড়ে পাঁচটায়?'

'গুড। তোমরা?'

'আমি পারবো,' জবাব দিলো রবিন

'আমিও,' বললো মুসা।

'বেশ, কাজে নেমে পড়া যাক তাহলে। সাড়ে পাঁচটায় হেডকোয়ার্টারে দেখা করবো আমরা। আলোচনা করবো, এর পর কি করা যায়।'

দশ

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে পাঁচটায় পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে ঢুকলো পিটার। জঞ্জালের স্তূপের কাছে দাঁড়িয়ে তাকালো এদিক ওদিক। তিন গোয়েন্দার ছায়াও চোখে পড়লো না।

'এই ছেলে, কি চাও?' কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন হলো।

চমকে ফিরে তাকালো পিটার। একজন সুন্দরী মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন তার

পেছনে।

'আমি···আমি কিশোর, রবিন আর মুসাকে···'

'ও। আমি কিশোরের মা, মারিয়া পাশা।' বাইরের লোকের কাছে নিজেকে কিশোরের মা বলে পরিচয় দেন মেরিচাচী। 'ওদেরকে খুঁজছো?' হেসে হাত নাড়লেন তিনি। 'গায়েব। সারাটা দিন দেখা নেই। খানিক আগে যা-ও বা ছায়াটা দেখলাম, তারপরেই দেখি আবার গায়েব।'

'এখানে আছে?'

'ছিলো, পাঁচ মিনিট আগেও। জ্যান্ত রাডার একেকটা! আমি জানার আগেই কি করে জানি জেনে যায় কাজের জন্যে ডাকবো ওদের। নিজেদের ইচ্ছে হলে আমাকে কিছু বলতে হয় না, অসম্ভব খাটে। কিন্তু ইচ্ছে না হলে···' বাক্যটা শেষ না করে হাত নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন মেরিচাচী, ওরা কি করে। 'গত ক'দিন ধরে ভালোই ছিলো, কাজটাজ ঠিকমতো করছিলো। আজকেই বদলে গেছে। নিশ্চয় নতুন কেস পেয়েছে।···তা কি নাম তোমার?'

'পিটার ফিলিপ।'

'ও। তো পিটার, তুমি বরং আজ চলেই যাও। আরেকদিন এসো। ওরা আজ আর বেরোবে বলে মনে হয় না। জমানো কাজ যতোক্ষণ না অন্যকে দিয়ে শেষ করাচ্ছি, ওরা আর বেরোচ্ছে না···'

'কিন্তু আমাকে তো আসতে বলে দিয়েছে। আরেকটু থাকি?'

'থাকতে পারো। তোমার ইচ্ছে। ওই যে, ওটা কিশোরের ওয়ার্কশপ। ওখানে বেঞ্চ আছে, গিয়ে বসো। তবে ওদেরকে আজ আর পাবে বলে মনে হয় না।' হেসে, ইয়ার্ডের অফিসের দিকে রওনা হয়ে গেলেন মেরিচাচী।

সব চেয়ে বড় জঞ্জালের স্তূপটার পাশে ওয়ার্কশপ, সহজেই খুঁজে পেলো পিটার। সাইকেলটা বাইরে রেখে ঢুকলো ভেতরে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কানে এলো ডাক। ফিসফিসিয়ে ডাকলো তার নাম ধরে কেউ, 'পিটার!'

কেমন যেন কাঁপা শোনালো ডাকটা। ভীষণ চমকে গেল পিটার। চারপাশে তাকিয়ে কিছুই চোখে পড়লো না।

'আরে ওখানে না, এখানে!'

পিটারের মনে হলো, বিশাল জঞ্জালের স্তূপের ভেতর থেকেই আসছে কথা।

'মু-মু-মুসা!' তোতলাতে শুরু করলো পিটার। 'কি-কি-কি-কিশোর!'

'শ্‌শ্‌শ্‌!' আবার শোনা গেল ফিসফিসানি। 'আস্তে বলো! মেরিচাচী শুনলেই ধরে নিয়ে গিয়ে কাজে লাগিয়ে দেবে! কেসফেস সব শেষ হয়ে যাবে তাহলে।'

চারদিকে তাকালো আবার পিটার, ওপরে তাকালো, নিচে তাকালো। কাউকেই চোখে পড়লো না।

হেসে উঠলো অদৃশ্য কণ্ঠটা। 'বাইরে গিয়ে দেখে এসো, মেরিচাচী আছে কিনা। তারপর ঢুকে পড়ো এই পাইপটায়! জলদি করো!'

মোটা পাইপটার দিকে তাকালো পিটার। জঞ্জালের নিচে হারিয়ে গেছে ওটা, শুধু মুখ বেরিয়ে রয়েছে। চট করে গিয়ে দেখে এলো কেউ আছে কিনা। তারপর হাত-পায়ের ওপর ভর দিয়ে উবু হয়ে উঁকি দিলো পাইপের ভেতরে। আবছা আলোয় দেখলো মুসার মুখ। উপুড় হয়ে পাইপের ভেতরে শুয়ে আছে সে। চোখাচোখি হতেই হাসলো।

'এটার নাম দুই সুড়ঙ্গ,' বললো মুসা। 'হেড-কোয়ার্টারে ঢোকার আরও পথ আছে। তবে এটাই বেশি ব্যবহার করি আমরা।'

'হেডকোয়ার্টার! ওই মালপত্রের তলায় বসে কথা বলো তোমরা?'

'বলি,' হাসলো আবার মুসা। 'এসো।'

ঢুকে পড়লো পিটার। মুসার পিছে পিছে হামাগুড়ি দিয়ে এগোলো। মাথার ওপর দেখা গেল একটা চারকোণা ফোকর, আলো আসছে ওপথে। ওটা ট্র্যাপডোর, পরে বুঝলো সে। ওই পথে ঢুকলো একটা ঘরের মধ্যে। চেয়ার, টেবিল, ফাইলিং কেবিনেট আর আরও নানারকম জিনিস আর যন্ত্রপাতি রয়েছে ওই ঘরে। এমনকি একটা স্টাফ করা কাক পর্যন্ত সাজানো রয়েছে বুককেসের ওপর। তার দিকে তাকিয়ে হাসলো কিশোর আর রবিন।

'আশ্চর্য!' অবাক হয়ে দেখছে পিটার। 'এ-তো দেখি ঘর! আমি ভেবেছিলাম জঞ্জালের তলায় খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে নিয়েছো বুঝি।'

'এটা একটা ট্রেলার। তোমাদেরটার মতোই,' রবিন বললো। 'তবে ছোট।'

'আমরা এখানে থাকলে বাইরে কেউ দেখতে পায় না,' মুসা বললো। 'কিন্তু আমরা দেখি, এই পেরিস্কোপটা দিয়ে। এটার নাম দিয়েছি আমরা সর্ব-দর্শন, বাংলা নাম।'

'এখানে ঢুকে বসে থাকলে,' কিশোর বললো, 'কারো পক্ষে খুঁজে বের করাও কঠিন।'

'এমনকি মেরিচাচীর কাছ থেকেও নিরাপদ,' হেসে বললো মুসা। 'যেই দেখি বেশি কাজ, পালিয়ে আসি এখানে। হাহ্ হাহ্!'

তার সঙ্গে যোগ দিয়ে সবাই হাসলো। একটা চেয়ার দেখিয়ে পিটারকে বসতে ইশারা করলো কিশোর। বললো, 'তারপর, পিটার, তোমার বাবার অতীত কিছু জানতে পারলে?'

'কিচ্ছু না। সারাটা বিকেল ভেবেছি। যতোদূর মনে পড়ে আমার, রকি বীচেই বাস করছি। কখনও কোনো গোলমালে জড়ায়নি আব্বা, অপরাধ করেনি। আগে আমার আম্মাকে নিয়ে স্যান ফ্র্যানসিসকোয় থাকতো আব্বা, যখন নেভিতে চাকরি করতো। আম্মা মারা যাওয়ার পর আমাকে নিয়ে এখানে চলে এলো, তখনও আমি

কিছু বুঝি না। একটা মাছধরা জাহাজ কিছুদিন ভাড়া নিয়েছে আব্বা। তারপর ইভানসদের জায়গাটা লীজ নিয়ে এই বেগুনী জলদস্যুর ব্যবসা খুলেছে।'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'হ্যাঁ, ঠিক এসবই জেনেছি আমিও তোমার আব্বার সম্পর্কে। অস্বাভাবিক কিছুই নেই। রবিন, বেগুনী জলদস্যুর কথা তুমি কি জানলে?'

'বেশি কিছু না। প্রায় সবই তো তোমরা জেনেছো ক্যাপ্টেন ফিলিপের কাছে, শো-এর সময়। স্প্যানিশরা শিওর, উইলিয়াম ইভানসই বেগুনী জলদস্যু, কিন্তু কোনোদিন প্রমাণ করতে পারেনি সেটা। কয়েকবার তার টাওয়ারে তাকে আটক করেছে, কিন্তু ধরতে পারেনি। চেহারাও দেখেনি। শেষ বার আটকানোর পর সবার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেল, ফিরে এলো একজন সম্মানিত আমেরিকান নাগরিক হয়ে।'

মুসা বললো, 'পাইরেটস কোভের ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছি আমি। অনেক আর্টিক্যাল লেখা হয়েছে জায়গাটাকে নিয়ে, গোটা দুই আস্ত বইও আছে। বেগুনী জলদস্যু ছাড়াও আরও অনেকে জায়গাটাকে তাদের আস্তানা বানিয়েছিলো বিভিন্ন সময়। সবাই ওরা অপরাধী। চোরাচালানী, চোর-ডাকাত, খুনী, এসব ধরনের লোক। যতো রকমের অন্যায় কাজ হতে পারে, সব ঘটেছে ওখানে। তবে ফিলিপ কিংবা নিরেক নামের কেউ, এমনকি শুধু উইলিয়াম ইভানস ছাড়া ইভানস নামের আর কোনো অপরাধীও ছিলো না কখনো ওখানে।'

ভ্রূকুটি করলো কিশোর। 'হুঁ। বিশেষ কিছু জানা গেল না। সূত্র বলতে একটাই দেখতে পাচ্ছি, বেগুনী জলদস্যু। বুঝতে পারছি, মেজর নিরেক আর তাঁর চেলারা গিয়ে মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করছে কোনো কারণে। কিন্তু আড্ডার ওপর কেন চোখ রেখেছে বোঝা যাচ্ছে না। পিটারের আব্বার সঙ্গেই বা কেন দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেছে, সেটাও দুর্বোধ্য।'

'গুপ্তধন লুকানো নেই তো?' মুসার প্রশ্ন। 'জলদস্যুদের গুপ্তধন? ক্যাপ্টেন ফিলিপকে ভুলিয়ে ভালিয়ে সরিয়ে রেখে হয়তো সেসব খুঁজছে ওরা।'

'যাতে নিরাপদে নিয়ে পালাতে পারে,' মুসার কথার পিঠে বললো রবিন।

কথাটা ভেবে দেখলো কিশোর। 'অসম্ভব নয়। ক্যাপ্টেনের গল্প শোনার আরও কারণ থাকতে পারে। মেজর হয়তো ভেবেছেন, এমন কিছু জানেন ফিলিপ, যেটা জানা থাকলে ধনরত্ন খুঁজে বের করতে সুবিধে হবে।'

'তাহলে আব্বা খুঁজছে না কেন?' পিটার প্রশ্ন তুললো।

'হয়তো তিনি জানেনই না গুপ্তধনের কথা। কিন্তু মেজর জানেন। তোমার আব্বার গল্প শুনে আন্দাজ করতে পারবেন হয়তো, কোথায় রয়েছে ওগুলো। হয়তো সূত্র পাবেন। কারণ বেগুনী জলদস্যুর সম্পর্কে অনেকের চেয়ে অনেক বেশি জানেন তোমার আব্বা।'

'তাহলে হয়তো ইতিমধ্যেই মেজর সব জেনে ফেলেছে।'

'মনে হয় না। তাহলে ওই সাক্ষাৎকার বন্ধ হয়ে যেতো, এখনও চলতো না। আড্ডার ওপর ওভাবে চব্বিশ ঘন্টা নজর রাখারও ব্যবস্থা করতো না। জাস্ট তুলে নিয়ে চলে যেতো। সাক্ষাৎকারে কি কি বলেছেন ক্যাপ্টেন, সব আমাদের জানা দরকার।'

পিটার বললো, 'আমি সাহায্য করতে পারি। ছোট একটা টেপ রেকর্ডার নিয়ে যেতে পারি সঙ্গে করে, আব্বা যা যা বলে তুলে আনতে পারি।'

'হ্যাঁ, তা পারো,' পিটারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। 'কাল রাতেও তোমার আব্বার সঙ্গে গিয়েছিলে। সব সময়ই যাও।'

'হ্যাঁ, যাই,' কিশোরের কথায় অবাক হয়েছে পিটার। 'মেজরই যেতে বলে আমাকে। প্রায় জোরই করে। বলে, বছরের পর বছর আমাকে জলদস্যুদের গল্প শুনিয়েছে আমার আব্বা, অনেক কিছুই মনে আছে। এমন কিছু হয়তো বলে ফেলতে পারবো, যা আব্বা ভুলে বলেনি। মনে করিয়ে দিতে পারবো।'

উজ্জ্বল হলো কিশোরের চোখ। 'সন্ধ্যায় যখন সাক্ষাৎকার দিতে যাও, তখন কি মেজর থাকেন?'

মাথা নাড়লো পিটার। 'কখনও না। অন্য লোক থাকে। কথা রেকর্ড করে নেয়।'

'নোনতা জেসন কোথায় থাকে ওই সময়টায়?'

'রকি বীচে ঘর ভাড়া নিয়েছে। রাতে ওখানেই থাকে।'

'তুমি আর তোমার আব্বা ছাড়া আর কেউ থাকে আড্ডায়?'

'না। শুধু ভিকটর ইভানস।'

'আরেকটা কথা। কতোক্ষণ ধরে সাক্ষাৎকার চলে?'

'ন'টা থেকে এগারোটা।'

'ঠিক আছে। আজ রাতেও তো সাক্ষাৎকার দিতে যাবে। ঘরের এয়ারকুলারটা বন্ধ করে দেবে। যাতে লোকটা বুঝতে না পারে। আর একটা জানালা খুলে ফাঁক করে রাখবে। কি কি কথা হয়, শুনতে চাই।'

চোখে বিস্ময় নিয়ে তিনজনেই তাকিয়ে রইলো গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে।

'রহস্যটা বোধহয় আন্দাজ করে ফেলেছি,' আনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো একবার কিশোর। 'আশা করছি, আজ রাতেই সমাধান হয়ে যাবে।'

এগারো

সন্ধ্যা আটটায় আবার হেডকোয়ার্টারে মিলিত হলো তিন গোয়েন্দা।

কি করতে হবে বললো কিশোর। 'বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎকার দিতে যাবে পিটার। আমি যাবো ওখানে, ওদের কথা শুনতে। মুসা, তুমি গিয়ে আড্ডার ওপর

নজর রাখবে। আমাদের নতুন ওয়াকি-টকির রেঞ্জ তিন মাইল। কিন্তু ডি লা ভিনা থেকে পাইরেটস কোভ পাঁচ মাইল। কাজেই মাঝামাঝি জায়গায় একজনকে থাকতে হবে। রবিন থাকবে। মুসার মেসেজ আমাকে দেবে, আমার মেসেজ মুসাকে। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকালো দুই সহকারী গোয়েন্দা।

বেরিয়ে এলো ওরা। সাইকেল নিয়ে রওনা হয়ে গেল যার যার জায়গার দিকে।

পাইরেটস কোভের পথে যখন নামলো মুসা, অন্ধকার হয়ে গেছে তখন। সাইকেলের আলো জ্বেলে দিলো। আড্ডার গেটের কাছে এসে থামলো। আলো নিভিয়ে অপেক্ষা করলো কিছুক্ষণ, চোখে অন্ধকার সইয়ে নেয়ার জন্যে।

আগের জায়গায়ই ট্রী-সার্ভিস ট্রাকটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো সে। সিগারেটের আগুন দেখেই বুঝতে পারলো, ড্রাইভিং সীটে বসে আছে কেউ। নিশ্চয় নজর রাখছে।

ওয়াকি-টকি বের করলো মুসা। বললো, 'রবিন, কিশোরকে বলো, মেজরের সহকারী টনি এখনও চোখ রাখছে আড্ডার ওপর।'

প্রায় মাইল তিনেক দূরে, হাইওয়ের পাশে একটা ছোট টিলার ওপরে বসে আছে রবিন। ওয়াকি-টকিটা মুখের কাছে তুলে আনলো। অন্ধকার রাস্তার দিকে তাকিয়ে বললো, 'কিশোর, মুসা জানিয়েছে, এখনও আড্ডার ওপর চোখ রাখছে টনি।'

ওর কাছ থেকে মাইল দুয়েক দূরে, দোকানের জানালার নিচে একটা ঝোপের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে কিশোর। মেসেজের জবাব দিলো, 'মেজর নিরেক, রিগো, আর টাকমাথা লোকটা এখনও বসে আছে এখানে। কিছুই করছে না। মুসাকে বলো, কড়া নজর রাখতে। খুব সাবধান যেন থাকে।'

হুঁশিয়ারির প্রয়োজন ছিলো না। মাত্র কয়েকশো মিটার দূরে রয়েছে টনি। এই অবস্থায় সাবধান থাকতেই হবে, তা-ই রয়েছে মুসা। লুকিয়ে আছে গাছের ছায়ায়। এমন একটা জায়গায় গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসেছে, যেখান থেকে পার্কিং লট, গেট, টাওয়ারের ওপরের দুটো তলা আর ট্রী-সার্ভিস ট্রাকটা দেখা যায়।

আড্ডায় ঢোকার মুখে একটা খুঁটিতে আলো জ্বলছে। এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ হলো। গেট দিয়ে বেরিয়ে এসে থামলো একটা ভ্যান। দরজা খুলে লাফিয়ে নামলো পিটার। গেটটা লাগিয়ে দিয়ে এসে আবার গাড়িতে উঠলো।

চলে গেল ভ্যানটা। আবার ট্রাকের দিকে তাকালো মুসা। নড়লো না ওটা

তেমনি ভাবে বসে বসে সিগারেট টানছে টনি।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার মেসেজ পাঠালো মুসা, 'ক্যাপ্টেন ফিলিপ আর পিটার বেরিয়ে গেছে। টনি আগের মতোই বসে আছে। নজর রাখছে।'

মেসেজটা কিশোরের কাছে পাচার করলো রবিন। পথের দিকে চোখ। কয়েক মিনিট পরেই দেখতে পেলো, তার সামনে দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে পিটারদের ভ্যানটা।

মেসেজ শুনলো কিশোর। তাকিয়ে রয়েছে ঘরের দিকে। রবিনের কথা শেষ হতে না হতেই ঘড়ি দেখলেন মেজর। উঠে রওনা হলেন দরজার দিকে।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো বিশালদেহী রিগো। লাফিয়ে লাফিয়ে চললো মেজরের পেছনে। একভাবে বসে রইলো টাকমাথা লোকটা।

দ্রুত হামাগুড়ি দিয়ে দোকানের পাশে চলে এলো কিশোর। চত্বরের দিকে তাকালো। দোকান থেকে বেরিয়ে ভ্যানে গিয়ে উঠলেন মেজর আর রিগো, যেটাতে খোঁড়ার যন্ত্রপাতিগুলো রয়েছে।

চলে গেল গাড়িটা।

খবরটা রবিনকে জানালো কিশোর। তারপর ফিরে এলো আবার আগের জায়গায়। টেপ রেকর্ডারে ক্যাসেট ভরছে টাকমাথা লোকটা। দুটো চেয়ার সাজিয়ে রাখলো ডেস্কের সামনে। চত্বরে আরেকটা ভ্যান ঢোকার শব্দ হলো। একটু পরেই ঘরে এসে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন ফিলিপ, সঙ্গে পিটার। ঢুকেই জড়োসড়ো হয়ে গেল পিটার। এমন ভঙ্গি করতে লাগলো, যেন ভীষণ শীত করছে। এয়ারকুলার বন্ধ করে দিতে বললো। অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে গিয়ে সুইচ অফ করে দিলো লোকটা। মনে মনে হাসলো কিশোর, বুদ্ধি আছে ছেলেটার। শুধু তাই নয়, লোকটা যখন এয়ারকুলার বন্ধ করতে গেছে, সে এসে খুলে দিয়েছে জানালা। এক পলকের জন্যে কিশোরের মুখটা নজরে পড়েছে বোধহয়, কারণ হেসেছে এদিকে তাকিয়ে। তাড়াতাড়ি ফিরে গেছে আবার, টাকমাথা কিছু সন্দেহ করার আগেই।

'মিস্টার গুন,' ক্যাপ্টেন বললেন, 'এ'কদিন যা বলেছি, রেকর্ড তো করে রেখেছেন। আবার শুনতে চাই। দরকার আছে।'

'সরি, ক্যাপ্টেন,' জবাব দিলো গুন, 'এখানে নেই ওগুলো। মেজর সব নিয়ে গেছেন।'

'কেন?' জানতে চাইলো পিটার।

'বোধ হয় এডিট করবেন। তারপর আরও কপি করে পাঠিয়ে দেবেন সোসাইটির ডিরেকটরদের কাছে।... আসুন, কাজ শুরু করা যাক।'

রেকর্ডিঙের বোতাম টিপে যন্ত্রটা ক্যাপ্টেনের দিকে ঠেলে দিলো গুন। নিজে

গিয়ে বসলো দরজার কাছে। ক্যাপ্টেন গল্প শুরু করলেন। সে চুপচাপ কমিক পড়তে লাগলো।

জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। ভাবছে, মেজর আর রিগো কোথায় গেল? টনিকে বসিয়ে এসেছে আড্ডা পাহারা দিতে। গুনকে রেখে গেছে ক্যাপ্টেনের সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্যে। পঁচিশ ডলার করে ঘন্টায়। ফিলিপের টাকার টানাটানি চলছে। এই অবস্থায় এটা তাঁর জন্যে লোভনীয় কাজ। আন্তরিক ভাবে গল্প বলে যাবেন, যতো গল্প তাঁর জানা আছে। কিন্তু কেন এই কাজ করাচ্ছেন মেজর? আন্দাজ করতে পারছে গোয়েন্দাপ্রধান। আরও আন্দাজ করতে পারছে, কোথায় গেছেন মেজর নিরেক রিগোকে নিয়ে।

আড্ডার বাইরে খুঁটিতে ওই একটামাত্র আলোই জ্বলছে।
টিকেট বুদ আর তালা দেয়া গেটটা দেখা যাচ্ছে সেই আলোয়। খুব সামান্যই গিয়ে পড়েছে পার্কিং লটে, তবে ওই ম্লান আলোতেই নড়াচড়াটা চোখ এড়ালো না মুসার। ট্রাকের ভেতরে জ্বলছে সিগারেটের আগুন, একবার উজ্জ্বল হচ্ছে, টান দেয়ার সময়। টান ছেড়ে দিলেই আবার কমে যাচ্ছে। মাঝে মধ্যে পেছনের পথ দিয়ে চলে যাচ্ছে গাড়ি। মুসা আসার পর এয়ার ট্যাক্সি সার্ভিসের একটা বিমানও উড়ে গেছে।

তারপর, রকি বীচের দিক থেকে এলো একটা ভ্যান। পার্কিং লটে ঢুকলো। হেডলাইট নিভালো। গিয়ে থামলো বন্ধ গেটের সামনে। দরজা খুলে নেমে এলেন মেজর নিরেক আর রিগো।

'রবিন!' নিচু গলায় মেসেজ পাঠালো মুসা, 'মেজর আর রিগো ব্যাটা এসে গেছে!'

জানালার নিচে বসে মেসেজটা শুনলো কিশোর। উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বললো, 'এটাই আশা করেছিলাম, নথি। ক্যাপ্টেন ফিলিপ আর পিটারকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে আড্ডা থেকে, যাতে নিরাপদে খোঁড়ার কাজ চালিয়ে যেতে পারে মেজরের চেলারা। ওরা জানে কিংবা অনুমান করেছে কিছু একটা লুকানো রয়েছে ওখানে।

ওয়াকি-টকির খুদে মাইক্রোফোনে কড়কড় করে উঠলো রবিনের কণ্ঠ, 'মুসা বলেছে, মেজর আর রিগো গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিলো। টনি নেমে গেছে ওদের কাছে। গেটের তালা খুলে দিয়েছে। ভ্যান নিয়ে ভেতরে ঢুকেছে মেজর আর রিগো। যতোটা সম্ভব আস্তে আর নীরবে করেছে কাজটা। আলো জ্বালেনি। ওরা ঢুকে যেতেই আবার তালা লাগিয়ে ট্রাকে ফিরে এসেছে টনি। ভ্যানটা আর দেখতে পাচ্ছে না মুসা।'

নিচের ঠোঁট কামড়ালো কিশোর। 'রবিন, মুসাকে বলো ভ্যানের পিছু নিতে।

মেজর আর রিগো কি করছে জানা দরকার।'

অন্ধকারে নিজে নিজেই মাথা নাড়লো মুসা। 'গেটের ভেতরে ঢোকার উপায় নেই। এখন ট্রাকের হাইড্রলিক লিফটে চড়ে বসেছে টনি। আমি বেরোলেই আমাকে দেখে ফেলবে। বেড়ার কাছেও যেতে পারবো না, দেখে ফেলবে। আর গিয়ে লাভও নেই। এতো উঁচু বেড়া, ডিঙাতে পারবো না।'

'কিশোর বলেছে, যে ভাবেই হোক, ঢুকতে হবে তোমাকে। ওরা কি করছে, জানা দরকার। কোনো না কোনো উপায় নিশ্চয় আছে। খোঁজো।'

আরেকবার চোখ বোলালো মুসা। বললো, 'কারখানার ওদিক দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করতে পারি। বেড়া ওখানেও আছে। ডিঙানোর চেষ্টা করবো। না পারলে আরও এগিয়ে চলে যাবো। পিয়ারের কাছে। পিয়ার পার হয়ে পানিতে নেমে সাঁতরে ঢুকবো আড্ডার ভেতরে। তাহলেই আর টনি দেখতে পাবে না।'

রবিনের জবাবের অপেক্ষায় রইলো মুসা। কিশোরের সঙ্গে কথা বলবে রবিন, তারপর জবাব দেবে।

বেড়ার অন্যপাশে পথের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা। কোনো শব্দ নেই ওখানে। আলো নেই।

অবশেষে জবাব দিলো রবিন, 'ঠিক আছে, মুসা, যাও। তবে খুব সাবধান!'

বারো

কয়েকশো মিটার দূরে দৈত্যাকার ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে ট্রি-সার্ভিস ট্রাকটা। সিগারেটের আগুন জানিয়ে দিচ্ছে এখনও হাইড্রলিক লিফটের ওপরে রয়েছে টনি।

পথটা দেখলো মুসা। পার্কিং লটের দিকে তাকালো। নির্জন। টনির দিকে আরেক বার তাকিয়ে সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে উঠে পড়লো সে। ছায়ায় ছায়ায় দৌড়ে চলে এলো কারখানার কাছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক সেকেণ্ড। বোঝার চেষ্টা করলো, কারো চোখে পড়ে গেল কিনা। বোধহয় পড়েনি। দেয়ালের ধার ধরে ধরে চলে এলো শেষ মাথায়, যেখানে খাঁড়ির সঙ্গে মিশেছে ওটা। দেয়াল থেকে বেরিয়ে থাকা ইঁট আর কড়িকাঠ ধরে ওপরে উঠে পড়লো সে, তারপর দম বন্ধ করে লাফ দিলো। কাঠের পিয়ারে নিঃশব্দে পড়ার প্রশ্নই ওঠে না। থ্যাপ করে একটা শব্দ হলো। অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলো আরও কিছুক্ষণ। কারো সাড়া নেই দেখে হাঁটতে আরম্ভ করলো। এগোলো কিছুদূর। খানিক দূরে চকচক করছে খাঁড়ির কালো পানি। মিটার দশেক দূরে আবছাভাবে চোখে পড়ছে ঘরবাড়ি।

পানিতে না নেমে ওখানে পৌছানোর আর কোনো উপায় নেই। পিয়ারের ওপর হাতড়ে হাতড়ে একটা নৌকা বাঁধার দড়ি পেয়ে গেল। টেনে দেখলো,

একটা মাথা এখনও পিয়ারের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। ওটা ধরে ঝুলে পড়লো সে। নেমে এলো পানির কাছে। পা দিয়ে ছুঁয়ে দেখলো। কনকনে ঠাণ্ডা পানি। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত দ্বিধা করলো সে। তারপর হাত ছেড়ে দিলো।

পানি একেবারেই কম ওখানে, মাত্র গোড়ালি ডুবলো। দ্রুত একবার তাকালো এদিক ওদিক, কেউ দেখছে কিনা দেখলো। তারপর হেঁটে চললো পানির মধ্যে দিয়ে। সাঁতরাতে হলো না বলে খুশি।

ট্রেলারটার কাছে উঠে এলো সে। জীবনের কোনো চিহ্নই নেই কোথাও। সব কিছু চুপচাপ।

ডকে ভাসছে জাহাজটা, মাঝে মাঝে ঘষা লাগছে জেটির সঙ্গে, কচমচ আওয়াজ করছে। প্রমিনাডের দু'পাশের ঘরগুলো সব বন্ধ। কফি স্ট্যাণ্ড, মিউজিয়ম, সব। মেজরের গাড়িটা চোখে পড়লো না।

ঘুরে মিউজিয়মের পেছনে চলে এলো সে। অন্ধকার আকাশের পটভূমিকায় অনেক উঁচু লাগছে জাহাজের গলুইটা। সেদিকে একবার তাকিয়ে ওয়াকি-টকি তুলে আনলো মুখের কাছে। 'রবিন, ভেতরে ঢুকেছি। ট্রেলার, বাড়ি, জাহাজ, সব জায়গায় দেখলাম। মানুষজন চোখে পড়ছে না। মেজরের ভ্যানটাও না। কোথায় যে গায়েব হয়ে গেল, আল্লাহ্ মালুম!'

কিছুক্ষণ পর রবিনের কথা শোনা গেল, 'কিশোর বলছে, ওরা ওখানেই কোথাও আছে। খুঁজতে বলেছে।'

গুঙিয়ে উঠলো মুসা। তবে তর্ক করলো না। ঘুরে রওনা হলো ওকের জঙ্গলের দিকে। ঘন গাছপালার মধ্যে ঢুকে দাঁড়ালো। কান পাতলো শব্দ শোনার আশায়। কিছুই কানে এলো না, শুধু তীরে ঢেউ আছড়ে পড়ার মৃদু ছলাৎছল ছাড়া। আর আছে বাতাসের ফিসফাস কানাকানি। আড্ডার দিকে মুখ করে থাকা টাওয়ারের একটা জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে।

নিচু গলায় ওয়াকি-টকিতে কথা বললো মুসা, 'ভিকটর ইভানসের টাওয়ারে আলো দেখা যাচ্ছে। ভালো করে দেখতে যাচ্ছি আমি।'

বনের ভেতর থেকে সরাসরি না বেরিয়ে বেড়ার কাছে চলে এলো মুসা। বেড়ার ধার ঘেঁষে এগোলো, যাতে সহজে কারো চোখে না পড়ে। টাওয়ারের কাছাকাছি এসে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো মাটিতে। বুকে হেঁটে এগোলো। আলো-কিত জানালাটার কাছে এসে থেমে দম নিলো, তারপর আস্তে মাথা তুলে উঠে দাঁড়ালো।

ঘরের ভেতর ভিকটর একা। ইজি চেয়ারে শুয়ে পড়ছে। হঠাৎ কি মনে করে মাথা উঁচু করে কান পাতলো। যেন কোনো শব্দ কানে গেছে। সতর্ক হলো মুসা। সে কোনো আওয়াজ করে ফেললো না তো?

তাড়াতাড়ি জানালার কাছ থেকে সরে আসতে গেল সে। ফেলে দেয়া একটা খাবারের খালি টিনে পা বেধে ঠনঠন করে গড়িয়ে গেল ওটা। নীরব অন্ধকারে

মুসার মনে হলো টিনের শব্দ তো না, যেন বোমা ফেটেছে।

চোখের পলকে মাটিতে শুয়ে স্থির হয়ে গেল সে।

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল ঘরের দরজা। এক ফালি আলো এসে পড়লো বাইরে। আলোর দিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে আছে ভিকটর। হাতে পিস্তল।

কেঁপে উঠলো মুসা। নেমে এলেই লোকটা তাকে দেখে ফেলবে...

'মিআঁউউউ!'

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে ভিকটরের পায়ে গা ঘষতে আরম্ভ করলো একটা কালো বেড়াল। হেসে পিস্তলটা নামিয়ে ফেললো সে। 'তুই। আমি ভেবেছিলাম না জানি কে। আয়, ভেতরে আয়।'

বেড়ালটাকে তুলে নিয়ে ঘরে ঢুকে গেল ভিকটর।

কপালের ঘাম মুছলো মুসা। বেড়ালটা সময়মতো না বেরোলে...আর ভাবতে পারলো না সে। বুকে হেঁটে যতোটা তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে এলো আবার বেড়ার কাছে। উঠে একছুটে ঢুকে পড়লো ওকের জঙ্গলে।

জোরে জোরে দম নিলো কয়েকবার। তারপর ওয়াকি-টকি বের করে বললো, 'রবিন, কিশোরকে বলো, ঘরে রয়েছে ভিকটর। পড়ছে। মেজর নিরেক আর রিগোর চিহ্নও দেখলাম না। যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে!'

দোকানের পেছনে ঝোপের মধ্যে বসে অন্ধকারেই ভুরু কোঁচকালো কিশোর। বললো, 'ভ্যানটা ওখানেই কোথাও আছে।'

ঘড়ি দেখলো সে। এগারোটা প্রায় বাজে। রবিনের জবাব শোনা গেল, 'মুসা বলছে, পুরনো আস্তাবলগুলোর সব ক'টার ডবল দরজা। সহজেই ভ্যান ঢোকানো যাবে। তবে ভেতরে ঢুকতে চাইছে না মুসা, মেজরের চোখে পড়ে যাওয়ার ভয়ে।'

'এখনও আমরা কিছু জানতে পারিনি। ওরকম ঝুঁকি না নেয়াই ভালো। জিজ্ঞেস করো, আর কি করতে পারে সে?'

দোকানের ভেতরে একটা প্যাকেট খুলে কেক বের করে ক্যাপ্টেন আর পিটারকে দিলো গুন। মুসার কাছ থেকে রবিনের মুখে জবাব এলো ওয়াকি-টকিতে, 'একটা কাজই করতে পারে বলছে। গেটের কাছে লুকিয়ে থেকে দেখতে পারে, কোত্থেকে বেরোয় ভ্যানটা।'

আপনমনেই মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'এটাই একমাত্র বুদ্ধি...এই শোনো, ধরো, দেখি।' মাথা আরেকটু তুললো সে। 'রেকর্ডিং শেষ হয়েছে মনে হচ্ছে।...হ্যাঁ, উঠে দাঁড়িয়েছেন ক্যাপ্টেন আর পিটার। এগারোটা বাজে। বেরিয়ে যাবেন।'

সামনের গেটের কাছে, মিউজিয়মের কোনায় মাটিতে পেট দিয়ে শুয়ে আছে মুসা। তাকিয়ে রয়েছে প্রমিনাডের দিকে। ব্ল্যাক ভালচারের দানবীয় ছায়া ছায়া শরীরটা

চোখে পড়ছে। কানে আসছে শুধু বাতাসের ফিসফাস, ঢেউয়ের ছলছল, আর কাঠের জেটিতে জাহাজের ধাতব শরীর ঘষা লাগার বিচিত্র ক্যাঁচকোঁচ।

একভাবে শুয়ে থাকতে থাকতে ঘুম পেয়ে গেল মুসার। দুই চিবুকের ওপর থুতনি রেখে চোখ মিটমিট করে ঘুম তাড়ানোর চেষ্টা করলো সে। হঠাৎ করেই চোখে পড়লো ওটা। ভ্যান! হেডলাইট নেভানো। এগিয়ে আসছে গেটের দিকে। এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ শুনতে পায়নি সে। কোনদিক থেকে এলো, তা-ও বুঝতে পারেনি। ঘড়ি দেখলো সে। ঠিক ১১টা।

মাটিতে শরীর চেপে ধরলো মুসা, একেবারে মিশিয়ে ফেলতে চায় যেন। প্রায় নিঃশব্দে এসে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে গেল ভ্যান। গেট খোলার জন্যে নামলো রিগো। খুলে দিতে বেরিয়ে গেল গাড়িটা।

খানিকটা এগিয়ে আচমকা ব্রেক কষে দাঁড়ালো ভ্যান। ঝাঁকুনি লেগে হাঁ হয়ে খুলে গেল পেছনের দরজা। খুঁটির আলো গিয়ে পড়েছে ওটার গায়ে, ভেতরে কি আছে স্পষ্ট দেখতে পেলো মুসা। গাদা গাদা বস্তা সাজিয়ে রাখা হয়েছে, বোঝাই।

গাল দিয়ে উঠলেন ড্রাইভিং সীটে বসা মেজর, 'গাধা কোথাকার! তালা লাগায়নি! লাগিয়ে জলদি এসে ওঠো!'

মেজরের নির্দেশ পালন করতে ছুটলো রিগো। দরজাটা লাগিয়েই থেমে গেল। ফিরে তাকালো মুসা যেখানটায় শুয়ে আছে সেদিকে। দেখে ফেললো নাকি! জমে গেল মুসা।

'এই, কি হলো, বলদ! এতো দেরি কেন?' ধমক দিলেন মেজর।

মাথা চুলকালো রিগো। দ্বিধা করলো একবার। তারপর গিয়ে উঠলো সামনের সীটে। হেডলাইট জ্বালানো হলো এবার ভ্যানের। চলে গেল ওটা।

ওয়াকি-টকির ওপর ঝুঁকলো মুসা। 'রবিন, এইমাত্র বেরিয়ে গেল মেজর আর রিগো। কোথায় ছিলো ওরা, কোত্থেকে এলো, কিছুই বুঝতে পারিনি। তবে ভ্যানের পেছনে কি আছে দেখেছি। অনেক বস্তা বোঝাই করা!'

ক্যাপ্টেন ফিলিপ আর পিটারকে দোকান থেকে বেরিয়ে যেতে দেখলো কিশোর। ট্রাক চলে যাওয়ার শব্দ শুনলো। ওরা চলে যেতেই খোলা জানালাটা চোখে পড়লো গুনের। বিড়বিড় করে কি বলে এসে বন্ধ করে দিলো। এয়ারকুলার চালু করলো। তারপর গিয়ে বসলো টেপ রেকর্ডারের সামনে। টেপ রিওয়াইণ্ড করে মুছে ফেলতে শুরু করলো ক্যাপ্টেনের কথা। অযথাই বকবক করে গেছেন যেন ফিলিপ, কোনো মানেই নেই ওসবের।

এই সময় এলো রবিনের মেসেজ। ভ্যানের পেছনে বোঝাই বস্তার কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠলো। 'বোঝাই? যা-ই আছে, ওগুলোর জন্যেই গিয়েছিলো ওখানে ওরা! জিজ্ঞেস করো তো মুসাকে, কি আছে দেখতে পারবে কিনা?'

'পারবে না। ভ্যানটা চলে গেছে। এখনও পাহারা দিচ্ছে টনি। যে পথে

ঢুকেছিলো সেপথেই ফিরে আসছে মুসা। হেডকোয়ার্টারে দেখা করবে, পরে।'

'ঠিক আছে,' ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। 'তুমি জলদি চলে এসো এখানে।'

পনেরো মিনিটের মধ্যেই একটা ভ্যানের শব্দ শুনলো কিশোর। চত্বরে থামলো। খানিক পরে ঘরে এসে ঢুকলেন মেজর আর রিগো। গুনের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন তিনি, আর রিগো কেকের বাকিটা শেষ করায় মন দিলো। মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকাচ্ছে জানালার বাইরে। ঝোপের ভেতর গুটিয়ে গেল কিশোর। কথা শেষ করে রিগোকে ইশারা করলো গুন। নেহায়েতই অনিচ্ছা নিয়ে যেন তার পিছে পিছে চললো হাতির বাচ্চা। নিশ্চয় বেগুনী জলদস্যুর আড্ডায় পাহারা বদল করতে যাচ্ছে, কিশোর ভাবলো।

দেয়ালের পেছনে একটা খসখস কানে এলো তার। অন্ধকারে ঘুরে তাকালো সে।

রবিন এসেছে।

হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল কিশোর। ফিসফিস করে বললো, 'এসেছো। ভালো হয়েছে। আমার জায়গায় গিয়ে বসো। বস্তাগুলোয় কি আছে দেখতে যাচ্ছি আমি। আমাদের যন্ত্রটাও খুলে আনবো। মেজরকে বেরোতে দেখলেই আমাকে হুঁশিয়ার করবে।'

তাড়াতাড়িই ফিরে এলো কিশোর।

'দেখেছো?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'দেখেছি। দশটা বস্তায়ই। যন্ত্রটাও খুলে নিয়ে এসেছি। চলো, বাড়ি যাবো।'

'কি আছে?'

ততোক্ষণে চলতে আরম্ভ করেছে কিশোর। রবিনের কথার জবাব দিলো না। সাইকেল নিয়ে রওনা হলো দু'জনে।

ওরা ইয়ার্ডে আসার কিছুক্ষণ পর এলো মুসা।

নষ্ট হয়ে যাওয়া টেইলিং ডিভাইসটা টেবিলে ফেলে রেখেছে কিশোর। কিসের সঙ্গে যেন বাড়ি খেয়ে হয়েছে এই অবস্থা।

'গেল!' জোরে নিঃশ্বাস ফেলে বললো রবিন। 'ওই জিনিস আরেকটা কেনার পয়সাও নেই এখন আমাদের।'

'যাক,' হাত নাড়লো মুসা। 'পয়সা হলে কিনে নেবো আরেকটা। এই কিশোর, বস্তার ভেতর কি দেখলে?'

'মাটি।'

'মাটি!' মুসা আর রবিন দু'জনেই অবাক।

'মাটি আর পাথর,' আবার বললো কিশোর। 'দশ বস্তা বোঝাই খুব বাজে মাটি আর পাথর।'

'কিন্তু...কিছুই বুঝতে পারছি না!' হাত ওল্টালো মুসা।

'এটুকু বোঝা যাচ্ছে,' কিশোর বললো, 'মাটি খুঁড়েছে জলদস্যুর আড্ডাতেই। কাল আবার যাবো আমরা। ক্যাপ্টেন ফিলিপকে বলবো গল্প রেকর্ডিংটা স্রেফ একটা ধাপ্পাবাজি। তারপর খুঁজে বের করবো, কোন জায়গায় খুঁড়ছেন মেজর, এবং কেন।'

তের

পরদিন সকালে হেডকোয়ার্টারে রবিন দেখলো, রিসিভার ক্রেডলে নামিয়ে রাখছে কিশোর। 'মুসা আসছে না,' জানালো সে। 'বাড়ি থেকে কাজ চাপানো হয়েছে ওর ওপর। ওকে রেখেই যেতে হচ্ছে আমাদের। যতো তাড়াতাড়ি পারে কাজ শেষ করে আড্ডায় আমাদের সঙ্গে দেখা করবে বলেছে।'

হাসলো রবিন। 'মায়ের ওপর রেগে নিশ্চয় ভোম হয়ে আছে।'

'যা-ই হোক, অন্তত খুশি মনে হলো না। চলো। তিনটে ওয়াকি-টকিই নিয়ে নিচ্ছি। কাজে লাগতে পারে।'

যন্ত্রগুলো ব্যাগে ভরে নিলো রবিন।

সবুজ ফটক এক দিয়ে সাইকেল নিয়ে বেরোলো ওরা। চললো জলদস্যুর আড্ডার দিকে। কুয়াশা পড়েছে। হাইওয়ে দিয়ে সাবধানে সাইকেল চালালো দু'জনে।

পৌঁছে দেখলো নির্জন পাইরেটস কোভ-এর ওপরে নীরবে যেন ঝুলে রয়েছে ভারি কুয়াশার চাদর।

'পিটারকে ফোন করেছিলাম,' কিশোর জানালো। 'সে বলেছে, তার আব্বাকে বলেকয়ে রাজি করিয়ে রাখবে আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে।'

গেটের কাছে পৌঁছে নিচু গলায় বললো রবিন, 'আইস-ক্রীমের ভ্যানটা আছে রিগো কোথায় লুকিয়েছে কে জানে। হয়তো গাছের আড়ালে।'

রাস্তার দিকে তাকালো কিশোর। গাড়িটা দেখলো। গাছের জটলার দিকে তাকিয়ে হাসলো। 'হ্যাঁ, আছে। অতোবড় হাতির মতো দেহ লুকানো কি আর সহজ?'

গেটের ভেতরে ঢুকলো দু'জনে। ট্রেলারের কাছে এসে বেল বাজালো।

সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজা। পিটার বললো, 'এসো। তোমাদের জন্যেই বসে আছি।'

রান্নাঘরে টেবিলের সামনে বসে আছেন ক্যাপ্টেন ফিলিপ। সবে নাস্তা শেষ করেছেন। ছেলেদেরকে কফি খাবে কিনা জিজ্ঞেস করলেন। ভদ্রতার সঙ্গে বললো ওরা, খাবে না।

হাতের কাপটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বললেন তিনি, 'মেজর নিরেককে বিরক্ত করতে মানা করেছিলাম তোমাদেরকে।'

'মনে আছে,' স্বীকার করলো কিশোর। 'আমরা করিওনি। তদন্ত যে করছি

জানেনই না মেজর।'

'তাহলেই ভালো। শুনলাম, রহস্যের কিনারা নাকি করে ফেলেছো। খুলে বল তো সব।'

'পিটার বোধহয় বাড়িয়ে বলেছে,' নরম গলায় বললো কিশোর। 'রহস্যের সমাধান এখনও করতে পারিনি, তবে শিওর হয়ে গেছি, রহস্য একটা সত্যিই আছে।' আগের দিন রাতে যা যা ঘটেছে বলতে লাগলো সে।

আরেক কাপ কফি ঢাললেন ক্যাপ্টেন। কিশোরের কথা শেষ হলে বললেন, 'তাহলে তোমার বিশ্বাস, পুরো ব্যাপারটাই একটা ফাঁকিবাজি। গল্প বলানোর ছুতোয় আমাদেরকে সরিয়ে দিচ্ছে মেজর, যাতে নিরাপদে মাটি খুঁড়তে পারে।'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'কিন্তু কেন? আর এতো পাহারার ব্যবস্থাই বা কেন করেছে?'

'এখনও জানি না। তবে অনুমান করতে পারি। বেগুনী জলদস্যুর গুপ্তধন আছে হয়তো এখানে, আর সেটা জানা আছে মেজর আর তাঁর চেলাদের। ম্যাপও আছে একটা।' টেবিলে ম্যাপ বিছিয়ে যে দেখেছিলেন মেজর, সেকথা জানালো কিশোর।

সন্দেহ যাচ্ছে না ক্যাপ্টেনের। 'পাইরেটস কোভে গুপ্তধন আছে, একথা কারো কাছে শুনিনি। কোনো গুজব নেই। তবে উইলিয়াম ইভানস ফিরে এসে মারা যাওয়ার পর লোকে ভাবতে শুরু করেছিলো, সে গুপ্তধন লুকিয়ে রেখে গেছে। খোঁজাখুঁজিও করেছে। কেউ কিছু পায়নি। তারপর আর ওসব নিয়ে মাথা ঘামায়নি কেউ।'

'গুপ্তধন না-ও হতে পারে। তবে মাটি যে খোঁড়া হচ্ছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কোন জায়গায় খুঁজছে, এখন গিয়ে সেটা বের করা দরকার।'

'পাওয়া যাবে!' উত্তেজনায় চকচক করছে পিটারের চোখ। 'তিন দিন ধরে খুঁড়ছে, নিশ্চয় বেশ বড় গর্ত!'

'তাহলে পাওয়া সহজই হবে,' ক্যাপ্টেন বললেন।

'আমার তা মনে হয় না,' সন্দেহ রয়েছে কিশোরের। 'মাটি খুঁড়ে বস্তায় ভরে নিয়ে যাচ্ছে, এটা অতি সাবধানতা। যাতে সহজে কারো চোখে না পড়ে।'

'আলাদা আলাদা হয়ে খুঁজতে বেরোই আমরা, কি বলো?' রবিন বললো। 'তুমি ক্যাপ্টেনকে নিয়ে যাও। আমি আর পিটার যাচ্ছি। দু'দিকে যাবো। দু'জনেই এলাকা চেনেন, অসুবিধে হবে না।'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর।

ঠিক হলো দু'দিক থেকে খুঁজে এসে জাহাজটার কাছে মিলিত হবে ওরা।

কফি স্ট্যাণ্ডের পেছন দিকটায় খুঁজতে চললো কিশোর আর ক্যাপ্টেন। কুয়াশা এখনও কাটেনি। মাথার ওপরে কুণ্ডলী পাকিয়ে উড়ছে, হালকা মেঘের মতো।

'এটা আর মিউজিয়ম করা হয়েছে যে বাড়িটায়,' ক্যাপ্টেন বললেন, 'আগে

আস্তাবল ছিলো। ওদিকে ওই গাছপালাগুলো দেখছো, ওখানে আরেকটা বাড়ি ছিলো। কোস্ট রোড তৈরি হওয়ার আগে।'

ঘরের ভেতরেও মাটি খোঁড়া হয়ে থাকতে পারে, সন্দেহ করে একটা আস্তাবলের দরজা খুললেন তিনি। কোমল পানীয় আর টিনজাত খাবারের বাক্সে ঘরটা বোঝাই। তবে ভ্যান রাখার জায়গা রয়েছে। মাটিতে টায়ারের কোনো চিহ্ন দেখা গেল না, গর্তটর্তও খোঁড়া হয়নি। কিছুই পাওয়া গেল না। বাইরে বেরিয়ে আশেপাশে খুঁজলো কিছুদূর। তারপর নিরাশ হয়ে এসে দাঁড়ালো ব্ল্যাক ভালচারের কাছে।

রবিন আর পিটারও ফিরে এলো।

'পাইনি,' হতাশ কণ্ঠে জানালো রবিন। 'একটা ইঞ্চি জায়গাও বাদ দিইনি।'

ঘড়ি দেখলেন ক্যাপ্টেন। 'শো-এর সময় হয়ে যাচ্ছে। নোনতা তো এখনও এলো না। আসেই কিনা কে জানে! মাঝে মাঝেই এরকম করে। একা মারিয়া সামলাতে পারবে না। লোক যদি বেশি হয়ে যায়, তোমরা কি সাহায্য করতে পারবে?'

উজ্জ্বল হয়ে উঠলো কিশোরের চোখ। 'নিশ্চয় পারবো, স্যার। অভিনয়ও করতাম একসময়। জলদস্যুর অভিনয় ভালোই পারবো। প্রয়োজন হলেই বলবেন। আমরা আছি।'

'এক কাজে দুই কাজ হয়ে যাবে,' প্রস্তাবটা রবিনেরও মনে ধরেছে। 'কাজও করবো, ওদিকে খোঁজাও হয়ে যাবে, গর্তটা। মিউজিয়মের চাবিটা দিন।'

পকেট থেকে চাবি বের করে দিলেন ক্যাপ্টেন। ছেলেকে নিয়ে চলে গেলেন, শো-এর জন্যে তৈরি হতে। তালা খুলে মিউজিয়মের ভেতরে ঢুকলো কিশোর আর রবিন।

কিশোর বললো, 'দেখ, মাটিতে চাকার দাগ আছে কিনা?'

প্রথম ঘরটায় কোনো দাগ পাওয়া গেল না। মাটি খোঁড়ার চিহ্নও নেই। পরের ঘরটায়ও দাগটাগ মিললো না। বেরোনোর জন্যে পা বাড়িয়েই থেমে গেল রবিন। হাত তুলে হুঁশিয়ার করলো কিশোরকে।

বাইরে কুয়াশার মধ্যে নড়ছে কিছু। শব্দ শুনতে পেয়েছে সে।

দরজার দিকেই এগিয়ে আসছে শব্দটা।

চোদ্দ

'কুইক!' ফিসফিসিয়ে বললো কিশোর। 'দরজার পেছনে!'

কিন্তু লুকানোর আগেই দরজায় দেখা দিলো একটা ছায়া। কুয়াশার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো।

'অ, তুমি! আমরা তো ভেবেছিলাম কে জানি!' মুসাকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো রবিন।

'কি করে বুঝলে এখানে আছি?' কিশোর জিজ্ঞেস করলো। 'পিটারকে জিজ্ঞেস করেছো নাকি?'

'নাহ্, দেখাই হয়নি। ভেতরে শব্দ শুনলাম, দরজাও খোলা। ভাবলাম, দেখি তো কে?·কোথায় খুঁড়েছে দেখেছো?'

মাথা নাড়লো কিশোর। 'না। তবে এ-বাড়ির একটা ঘর এখনও বাকি।'

শেষ ঘরটারও তালা খুলে দেখলো ওরা। কিছু পেলো না।

বাইরে হালকা হয়ে এসেছে কুয়াশা। মিউজিয়ম বিল্ডিং আর ওকের জটলার মাঝের জায়গায় ছড়িয়ে পড়লো তিন গোয়েন্দা। কয়েকজন দর্শককে দেখতে পেলো, ব্ল্যাক ভালচারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কফি স্ট্যাণ্ডটা খোলা হয়েছে, কাউন্টারের পেছনে বসেছেন ক্যাপ্টেন। সাগরের কিনার, বেড়া আর ওকের সারির মাঝের জায়গা তন্ন তন্ন করে খুঁজলো ছেলেরা।

'খোঁড়ার কোনো লক্ষণই তো দেখছি না,' রবিন বললো হতাশ কণ্ঠে।

'হয়তো খুঁড়েছিলো,' মুসা বললো। 'কালরাতে এসে আবার ভরে দিয়ে গেছে।'

'তাহলে পরিষ্কার বোঝা যেতো,' বললো কিশোর। 'সবখানেই তো খুঁজলাম…'

বাধা দিলো রবিন, 'না, সবখানে নয়! টাওয়ার আর বোটহাউসের ভেতরটা এখনও বাকি!'

বাঁকাচোরা পুরনো ওকের ভেতর দিয়ে তাকালো ওরা টাওয়ারের দিকে। পানির কিনারে কাত হয়ে থাকা বোট-হাউসটা দেখলো। গাছপালার ভেতর দিয়ে ভ্যান চালিয়ে যাওয়ার মতো যথেষ্ট ফাঁক রয়েছে।

'কিন্তু পাথরের টাওয়ারের ভেতরে খুঁড়বে কি করে?' প্রশ্ন তুললো মুসা। 'বোটহাউসে পারা যাবে না। একটায় পাথর, আরেকটায় পানি।'

'তবে বোটহাউসে ভ্যান লুকানো সম্ভব,' কিশোর বললো। 'রবিন ঠিকই বলেছে। দেখা দরকার।'

'দাঁড়াও,' আবার বাধা দিলো রবিন। 'ভিকটর লোকটার মাথায় ছিট আছে। কাল আমাকে যেরকম করে ধরেছিলো! ক্যাপ্টেনকে নিয়ে আসা উচিত আমাদের।'

ফোঁস করে নিশ্বাস ফেললো কিশোর। 'তা-ও বটে।'

'ভিকটর এখন টাওয়ারে নেই,' মুসা বললো। 'আমি ঢোকার সময় দেখলাম পার্কিং লট থেকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।'

'চলো তাহলে,' তুড়ি বাজালো কিশোর। 'এটাই সুযোগ।'

হালকা বনের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পেলো ওরা, জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে আছেন ক্যাপ্টেন ফিলিপ। কয়েকজন দর্শকের সঙ্গে কথা বলছেন। ঘড়ি দেখলেন একবার। গেটের কাছে টিকেট বুদটা খোলা রেখেছে এখনও মারিয়া। প্রথমে বোটহাউসের দিকে এগোলো ওরা। ডাঙার দিকের দরজাটা বেশ

বড়, তালা নেই। দরজার ঠিক ভেতরেই কাঠের মেঝে, ভ্যান রাখা সম্ভব ওখানে। তবে টায়ারের চিহ্ন কিংবা তেলটেল পড়ে নেই। কালো পানির ওপর যেন ঠেলে বেরিয়ে আছে ডক, নৌকা বাঁধার জায়গা রয়েছে দু'পাশে। একটা নৌকাও নেই। শেষ মাথায় দরজা ছিলো একসময় নৌকা ঢোকানোর জন্যে, তবে এখন এমনভাবে বসে গেছে পানিতে, ঢোকানোর আর উপায় নেই। ডকের ওপরে ছাতের কাছে পাল রাখার জায়গা। ওখানে এখনও বেশ কিছু পাল, মাস্তুল আর দড়ি রয়েছে। ডকের নিচে কাঠের গায়ে ঢেউ ভাঙছে। সব কিছুই খুব স্বাভাবিক, মাটি খোঁড়ার চিহ্নই নেই।

টাওয়ারে যাওয়ার পথেও কোথাও খোঁড়ার চিহ্ন দেখা গেল না।

'মুসা,' কিশোর বললো, 'বনের ভেতর গিয়ে পাহারা দাও।' ওয়াকি-টকি বের করে দিলো। 'নাও। ভিকটরকে আসতে দেখলেই হুঁশিয়ার করবে। সারাক্ষণ অন করে রাখবো আমাদের যন্ত্র।'

টাওয়ারের দিকে তাকিয়ে হাঁটছে কিশোর। একতলায় দুটো দরজা আর কয়েকটা জানালা। দোতলা-তিনতলায় একটা করে খুদে জানালা। আর চারতলার প্রায় পুরোটাই কাঁচের, লাইটহাউসের মতো। জানালার মাঝে দেয়ালের গা থেকে বেরিয়ে আছে ইঁটের ধাপ, মইয়ের মতো অনেকটা, উঠে গেছে একেবারে চ্যাপ্টা ছাত পর্যন্ত।

সামনের একটা দরজায় ঠেলা দিলো কিশোর। তালা নেই। খুলে গেল। ছোট একটা লিভিং রুম দেখা গেল, গোল, ছাতটা উঠে গেছে গম্বুজের মতো গোল হয়ে। ডানে ওই একই আকারের বেডরুম, বাঁয়ে রান্নাঘর। ওখান থেকে বেরোনোর আরেকটা দরজা আছে, ভেতর থেকে ছিটকানি লাগানো। একটা কাঠের সিঁড়ি নেমে গেছে মাটিরতলার ঘরে, একপাশের দেয়ালে তার দরজা। আরেক পাশের দেয়ালে আরেকটা দরজা, সেখানে একটা মোটা পাইপের মতো দেখা গেল, সিমেন্টের তৈরি। ভেতর দিয়ে লোহার মই। উঠে গেছে ওটা।

'আগে নিচে নামি,' কিশোর বললো।

রবিন কিছু বললো না। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো গাঢ় অন্ধকার সেলারে। হাতড়ে হাতড়ে সুইচবোর্ড বের করলো কিশোর।

একটা মাত্র বাল্ব ঝোলানো রয়েছে ছাতে, অল্প পাওয়ারের। আলো খুব সামান্য। তবে তাতে দেখতে অসুবিধে হয় না। নিচু ছাতওয়ালা একটা ঘরে ঢুকেছে ওরা। পাথরের দেয়াল। মেঝেটা কাঁচা, কিন্তু সিমেন্টের মেঝের চেয়ে কম শক্ত না। মসৃণ। দেয়ালে ধুলো জমে রয়েছে কতো বছর ধরে, বলার জো নেই।

'এখানেও কেউ খোঁড়েনি,' রবিন বললো।

'তাই তো মনে হচ্ছে।' বার বার নিরাশ হতে ভালো লাগছে না কিশোরের।

দেয়ালের ওপাশে আরেকটা ঘর আছে। স্টোররুম। তাতে পড়ে আছে জমকালো সব আসবাবপত্র, ধুলোয় মাখামাখি। জানে পাবে না, তবু ওগুলোর

তলায় উঁকি দিয়ে দেখলো দু'জনে, খোঁড়ার চিহ্ন আছে কিনা।

'কেউ আসেনি এখানে,' রবিন বললো।

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললো।

পেছনে বিকট চিৎকার শুনে চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরলো দু'জনে।

দাঁড়িয়ে রয়েছে বেগুনী জলদস্যু। হাতে ভোজালি।

'মিস্টার জেসন,' রবিন বললো, 'আমরা।'

কথা বললো না বেগুনী জলদস্যু। বেগুনী মুখোশের ফুটো দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে জ্বলন্ত চোখে। নাকের নিচে পুরু গোঁফ।

'আপনি মিস্টার জেসন না?' সন্দেহ হলো কিশোরের।

জবাবে ভোজালি উঁচিয়ে ছুটে এলো লোকটা। লাফ দিয়ে পাশের একটা মস্ত আলমারির ওপর গিয়ে পড়লো রবিন। কিশোর পড়লো কয়েকটা চেয়ারের ওপর। রবিনের পায়ে পা বেধে হুমড়ি খেয়ে লম্বা এক টেবিলের ওপর গিয়ে পড়লো জলদস্যু। পিছলে চলে গেল পেছনের দেয়ালের কাছে।

একটা মুহূর্ত নষ্ট করলো না দুই গোয়েন্দা। লাফ দিয়ে উঠে দিলো দৌড়। পেছনে তাকালো না একবারও, সিঁড়ি বেয়ে উঠে চলে এলো ওপরে। রান্নাঘরে ঢুকতেই কানে এলো মুসার কণ্ঠ, 'শুনছো! ভিকটর! এই শুনছো? ভিকটর এসেছে!'

চোখের পলকে গিয়ে পেছনের দরজাটার ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লো কিশোর। দেখলো, ছিটকানি তো আছেই, তালাও লাগানো। নিচে সেলারে পায়ের আওয়াজ হচ্ছে। নিশ্চয় সিঁড়ির দিকে আসছে লোকটা। বাইরে, সামনে দিয়ে আসছে ভিকটর ইভানস।

আটকা পড়েছে দুই গোয়েন্দা। পালানোর পথ নেই।

পনের

আরও হালকা হয়ে এসেছে কুয়াশা। বনের মধ্যে বসে আছে মুসা। ওয়াকি-টকি মুখের কাছে ধরা। আবার বললো সে, 'হুঁশিয়ার! ভিকটর আসছে! বেরিয়ে এসো!'

জবাব এলো না।

ভিকটরের দিকে ফিরে তাকালো সে। গেট দিয়ে ঢুকে হেঁটে আসছে বনের দিকে। এখন না বেরোলে আর ভিকটরের চোখ এড়িয়ে বেরোতে পারবে না কিশোর আর রবিন। করছে কি ওরা?

'রবিন! কিশোর! হুঁশিয়ার!' আবার সতর্ক করলো মুসা। 'জলদি বেরিয়ে এসো!'

সামনের দরজাটা খুলতে আরম্ভ করলো। কিন্তু কেউ বেরোলো না। চোখ মিটমিট করতে লাগলো মুসা। তাহলে আপনাআপনিই খুলেছে, বাতাসে? না, বাতাস নয়। দরজা ফাঁক করে বেরিয়ে আসছে কালো একটা বেড়াল। বেরিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে আসতে লাগলো। রবিন আর কিশোর বেরোলো না।

মরিয়া হয়ে উঠলো মুসা। প্রায় চেঁচাতে শুরু করলো, 'রবিন! কিশোর! ভিকটর...'

'এই, কি করেছে ভিকটর!'

মুখ ফেরাতেই একেবারে লোকটার মুখোমুখি হয়ে গেল মুসা।

'আবার ঢুকেছো চুরি করে! কার সঙ্গে কথা বলছো?' ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলো ভিকটর।

ঢোক গিললো মুসা। 'কোথায় খোঁড়া হয়েছে, বের করার চেষ্টা করছি আমরা, স্যার। আমাদের ধারণা, এখানে কোথাও গুপ্তধন লুকানো রয়েছে। রবিন আর কিশোর গেছে আপনার টাওয়ারের ভেতরে খুঁজতে। আমি...আমি...'

চট করে খোলা দরজার দিকে তাকালো ভিকটর। 'কে খুঁড়ছে?'

'ওরা!'

'ওরা কারা?'

'যারা গুপ্তধন খুঁজছে।'

'কারা খুঁজছে, সেটাই তো জিজ্ঞেস করছি!' রেগে গেল ভিকটর।

'মেজর নিরেক আর তার চেলারা। টনি, রিগো, গুন--সেই টাকমাথা লোকটা।'

বিস্ময় ফুটলো ভিকটরের চোখে। আবার তাকালো টাওয়ারের দরজার দিকে। 'কোথায় খুঁড়ছে, দেখেছো?'

'না। সব জায়গায় খুঁজেছি আমরা, শুধু...'

হঠাৎ যেন হাঁপাতে শুরু করলো মুসার ওয়াকি-টকি। এটা এক ধরনের সংকেত, কিশোর পাঠাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলো, 'কি, কিশোর?'

নিচু গলায় জবাব এলো, 'টাওয়ারে একটা লোক ঢুকেছে, মুসা। আমাদের হামলা করেছে। সেলার থেকে উঠে এসেছি আমরা, কিন্তু ঘর থেকে বেরোতে পারছি না। পেছনের দরজায় তালা। সামনে দিয়ে বেরোতে গেলে ভিকটর দেখে ফেলবে। একটা কাজই করার আছে আমাদের, ওপরে চলে যাওয়া...' থেমে গেল হঠাৎ কিশোর। পরক্ষণেই শোনা গেল তার উদ্বিগ্ন কণ্ঠ, 'আসছে লোকটা! আমরা চলে যাই...'

নীরব হয়ে গেল ওয়াকি-টকি।

টাওয়ারের দোতলায় উঠে গেছে কিশোর আর রবিন। রান্নাঘর থেকে মই বেয়ে ওঠার শব্দ শুনতে পাচ্ছে ওরা। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে লোকটা।

'জলদি,' কিশোর বললো।

ছোট একটা জানালা দিয়ে ম্লান আলো আসছে। সেই আলোয় দেখে দেখে মই বেয়ে নিঃশব্দে তেতলায় উঠে এলো দু'জনে। আলো এখানেও খুব কম। পুরনো কয়েকটা পিপা আর কাঠের বাক্স পড়ে আছে, ধুলোয় মাখামাখি। দেখে মনে হয়

শত বছর ধরে ওভাবেই আছে ওগুলো ওখানে। দুটো বাক্সের ওপর বসলো ওরা। নিচে, দোতলায় ভারি পায়ের শব্দ হচ্ছে, নিশ্চয় ওদেরকে খুঁজে বেড়াচ্ছে লোকটা।

'ও কে, কিশোর?' ফিসফিসিয়ে বললো রবিন। 'নোনতা জেসন?'

'নোনতা জেসন আমাদের আক্রমণ করবে কেন?'

'তা-ও তো কথা।'

কান পেতে শুনতে শুনতে হঠাৎ কিশোর বলে উঠলো, 'রবিন, আমার মনে হয় না আমাদেরকে খুঁজছে ও! আমাদের পিছুও নেয়নি। অন্য কিছু খুঁজছে সে।'

'কিন্তু সেলারে তো হামলা চালালো?'

'চালিয়েছে। তবে আমাদের পিছু নিয়ে যায়নি। এখনও আমাদের পেছনে লাগেনি সে। ও হয়তো ভাবছেই না আমরা আছি এখানে। ভেবেছে, বেরিয়ে চলে গেছি।'

'মেজর নিরেক নয় তো?'

মাথা নাড়লো কিশোর। 'না, মেজরের শরীর আরও ছোট। আর রিগো অনেক বড়। তবে অন্য দু'জনের একজন হতে পারে, টনি কিংবা গুন আর ভিকটর ইভানস যে নয়, সে তো জানিই। কারণ সে বাইরে রয়েছে।'

'কিশোর! ওপরে আসছে!'

মই বেয়ে চারতলায় উঠতে শুরু করলো দু'জনে। মইটা শেষ হয়েছে একটা ট্র্যাপডোরের কাছে। ঠেলা দিতেই ওপরে উঠে গেল ওটা। ওরা বেরিয়ে এলো উজ্জ্বল রোদে। চারতলার এই ঘরটা ছোট, চারপাশে অসংখ্য জানালা। তাড়াতাড়ি ট্র্যাপডোর বন্ধ করে দিয়ে জানালার কাছে চলে এলো ওরা। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে খাঁড়িটা। ঘাটে বাঁধা রয়েছে ব্ল্যাক ভালচার। প্রথম শো শুরু হতে বেশি দেরি নেই।

'কিশোর, এখানেও যদি আসে?'

জানালার অনেক নিচে মাটি। টাওয়ার থেকে নেমে যাওয়ার আর কোনো পথও নেই। ঘরটায় আসবাব নেই, লুকানোর কোনো জায়গাই নেই।

'কিছু একটা করতেই হবে আমাদের।' ভয় ফুটলো কিশোরের কণ্ঠে।

'আসছে! ও আসছে!'

বনের মধ্যে বসে টাওয়ারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা আর ভিকটর। ওয়াকি-টকিতে কিশোরের মেসেজের অপেক্ষা করছে।

'গিয়ে দেখা দরকার,' মুসা বললো।

'নাম কি তোমার?' শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো ভিকটর।

'মুসা। মুসা আমান।'

'মুসা, আমরা জানি না টাওয়ারে কে ঢুকেছে। ক'জন ঢুকেছে। গিয়ে হয়তো তোমার বন্ধুদেরকে আরও বিপদে ফেলে দেবো।'

'আ-আপনি বোধহয় ঠিকই বলেছেন। কিন্তু...'

'মুসা,' টাওয়ারের দিকে হাত তুললো ভিকটর, 'ওই দেখো!'

দেখলো মুসাও। টাওয়ারের ওপরতলার জানালা দিয়ে মুখ বের করেছে কিশোর আর রবিন। লাফিয়ে উঠে দৌড় দিতে গেল সে। খপ করে হাত চেপে ধরলো ভিকটর, টেনে থামালো। 'থামো! বিপদে ফেলে দেবে ওদেরকে। তোমাকে দেখলেই বেফাঁস কিছু করে বসতে পারে ওরা।'

বুঝলো মুসা। মাথা ঝাঁকালো। ঢোক গিললো। জানালা থেকে সরে গেছে কিশোর আর রবিন। আবার জানালার দিকে হাত তুলে দেখালো ভিকটর, মুসাকে ছাড়েনি। মুসা দেখলো, জানালায় দেখা যাচ্ছে এখন বেগুনী জলদস্যুর মুখ। বেগুনী মুখোশ, কালো গোঁফ, পালক লাগানো বেগুনী হ্যাট, সোনালি কাজ করা বেগুনী কোট।

'কো-কোথায় লুকালো ওরা!' জোরে বলতে ভয় পাচ্ছে যেন মুসা।

মাথা নাড়লো ভিকটর। 'কোথাও না, মুসা! ওখানে আলমারি-টালমারি কিচ্ছু নেই, লুকানোর কোনো জায়গাই নেই! আটকা পড়েছে ছেলে দুটো!'

ষোল

নীরব টাওয়ারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে দু'জনে। জানালা থেকে অদৃশ্য হয়েছে বেগুনী জলদস্যুর মুখ। রোদ চমকাচ্ছে কাঁচের পাল্লায়।

'নিশ্চয় ওদেরকে ধরে ফেলেছে!' জোরে কথা ভিকটরও বলছে না

'বাঁচাতে হবে ওদের!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।

'আস্তে, আস্তে কথা বলো! বোকামি করে বিপদ বাড়াবে...'

'মুসা! লোকটা কি চলে গেছে?' আচমকা ওয়াকি-টকিতে ভেসে এলো যেন বিদেশী কারো কণ্ঠস্বর, মুসার সে-রকমই মনে হলো। 'ওকে দেখেছো?'

'কিশোর! কোথায় তুমি?'

'টাওয়ারের ওপরে। কেন, দেখতে পাচ্ছো না?

ওপর দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা আর ভিকটর। অবাক। কাউকে দেখতে পাচ্ছে না।'

'কই, কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

হাসলো কিশোর। 'আরও ওপরে, মুসা। জানালার ওপরে।'

এই বার দেখতে পেলো মুসা। রবিন আর কিশোর দুজনেই হাসছে। জানালার ওপরে বেরিয়ে থাকা কার্নিশে উঠে গেছে ওরা।

'উঠলে কি করে ওখানে!'

'ভয় পেয়ে কতো কিছুই তো করে বসে মানুষ,' কিশোর জবাব দিলো। 'কথা সেটা না। ওঠার সময় তো উঠেছি, এখন নামি কি করে?'

মাটি থেকে চারতলা ওপরে, ছাতের কাছাকাছি উঠে আছে কিশোর আর

রবিন। ওখান থেকে পড়লে…নিজের অজান্তেই একটা গোঙানি বেরিয়ে এলো মুসার মুখ থেকে।

'মুসা,' রবিনের কণ্ঠ, 'তোমার সঙ্গে আরেকজন কে?'

'মিস্টার ভিকটর ইভানস। তিনি ভালো মানুষ, ভয়ের কিছু নেই।'

ওয়াকি-টকিতে জানালো ভিকটর, 'তোমরা কি করছো, সব বলেছে আমাকে মুসা। অবশ্যই আমি সাহায্য করবো তোমাদেরকে। লোকটা কি চলে গেছে?'

'তিনতলায় নামতে তো শুনলাম,' রবিন বললো। 'একেবারে নিচে নামলো কিনা বুঝতে পারছি না।'

'ঠিক আছে, দেখছি আমরা। তোমরা যেভাবে আছো, থাকো।'

সাবধানে টাওয়ারের সামনের দরজার দিকে এগোলো ভিকটর আর মুসা। কোনো শব্দ নেই। পেছনের দরজাটা তেমনি ছিটকানি লাগানো রয়েছে। সামনের দরজা দিয়ে লোকটা বেরোলে ওদের চোখে পড়তোই। সেলার, দোতলা আর তিনতলায় খুঁজে দেখা হলো। নেই লোকটা। ওপর তলায় উঠে এসে দেখলো, পেছনের একটা জানালা বেয়ে সবে নেমেছে কিশোর আর রবিন। মুসাকে দেখে হাসলো।

'উঠলে কি করে ওখানে?' জিজ্ঞেস করলো ভিকটর।

'আসুন, দেখাচ্ছি,' ডেকে একটা জানালার কাছে তাকে নিয়ে গেল রবিন। জানালার বাইরেটা দেখিয়ে বললো, 'ওগুলো বেয়ে।'

মুসা আর ভিকটর, দু'জনেই গলা বাড়িয়ে দিলো। দেয়ালের গায়ে জানালার লাগোয়া কতগুলো পাথর এমনভাবে বের করা, মইয়ের মতো ওগুলো বেয়ে উঠে যাওয়া যায়।

'নিশ্চয় ছাতে যাওয়ার পথ ওটা,' কিশোর বললো। 'আপনার পূর্বপুরুষরা বানিয়ে রেখে গেছেন, ইচ্ছে করেই। যাতে সময়ে কাজে লাগে।'

'হুঁ,' মাথা দোলালো ভিকটর, 'তোমাদের যেমন লাগলো।'

'যদি পড়ে যেতে!' অনেক নিচে মাটির দিকে তাকিয়ে এখনও ভয় পাচ্ছে মুসা।

'তখন কি আর অতো কথা মনে ছিলো,' রবিন বললো। 'লোকটা উঠে আসছে। লুকানোর কোনো পথ দেখছি না। খুঁজতে খুঁজতে কিশোরের চোখে পড়লো প্রথমে ওই মই। আর কি, উঠে গেলাম। ওই সময় তুমি হলেও পারতে।'

'তা ঠিক।'

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে কিশোর। খাঁড়ির দিকে চোখ। রওনা হয়ে গেছে ব্ল্যাক ভালচার। প্রথম শো, কিন্তু শুরু হয়েছে অনেক দেরিতে। অন্য দিনের চেয়ে আজ যাত্রী বেশি, তার কারণ বোধহয় দুটো শো-এর লোক একবারে উঠেছে। জেসন এসেছে। পিটার আর সে জলদস্যু সেজে আক্রমণের পাঁয়তারা করছে।

হঠাৎ ফিরে তাকালো সে। 'কাউকে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলে?'

'শুধু বেড়ালটাকে,' মুসা জানালো।

'সে-জন্যেই আমাদের বেগুনী সাহেব ভেবেছেন, সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছি আমরা। বেরোতে দেখেনি তো, তাই। ভেবেছে, ভয়ে লেজ তুলে পালিয়েছি আমরা। এবং তাতেই সে খুশি।'

'শুধু কি আমাদের তাড়িয়েই সে খুশি?' রবিনের প্রশ্ন।

'তাছাড়া আর কি? মারতে নিশ্চয় চায়নি।'

'লোকটা কে, চিনেছো?' জিজ্ঞেস করলো ভিকটর।

'না, স্যার। মেজর নিরেক নয়। রিগোও নয়। গায়ে-গতরে আপনার সমান, কিন্তু আপনি তো ছিলেন মুসার সঙ্গে। তারমানে আপনিও নন।'

'ভাগ্য ভালো, ছিলাম,' হাসলো ভিকটর। 'নইলে আমাকেই সন্দেহ করে বসতে।'

'তা করতাম।'

'শুধু কি তোমাদের তাড়াতেই এসেছিলো সে?'

'মনে হয়, এসেছিলো অন্য উদ্দেশ্যে। আমাদের দেখে তাড়া করেছে আরকি। আমার ধারণা, কিছু লুকানো রয়েছে টাওয়ারে, সেটা খুঁজতেই এসেছিলো।'

'কি লুকানো আছে, কিশোর?' রবিনের জিজ্ঞাসা। 'মাটি খুঁড়ে গুপ্তধন খোঁজার কথা বলছিলে...'

'কি জিনিস, জানি না,' বাধা দিয়ে বললো কিশোর। 'তবে এখন মনে হচ্ছে, যা-ই থাকুক, মাটির তলায় নয় সেটা। লুকানো রয়েছে অন্য কোথাও।'

'তাহলে মাটি খুঁড়লো কেন?' মুসার প্রশ্ন।

'সেলারে গেলেই বোধহয় তার জবাব মিলবে। চলো, দেখিগে।'

সতের

বদ্ধ জায়গায় কাঠের সিঁড়িতে ওদের পায়ের শব্দ বড় বেশি হয়ে কানে বাজলো।

'নথি,' কিশোর বললো, 'লোকটার আসার শব্দ আমরা কখন পেয়েছি মনে আছে?'

'নিশ্চয়ই। তখন স্টোররুমে ছিলাম। ঠিক পেছনেই গর্জে উঠলো লোকটা। মুখ ফিরিয়েই দেখি, প্রায় গায়ের ওপর এসে পড়েছে।'

'ঠিক। তাহলে প্রথম আমরা শুনলাম গর্জন, স্টোররুমে, আমাদের পেছনে। এই যে এখন আমরা নামছি, কতো জোরে শব্দ হচ্ছে। অথচ লোকটার পায়ের আওয়াজ কেন শুনতে পেলাম না?'

'হয়তো পা টিপে টিপে এসেছিলো।'

'অসম্ভব। ধাপগুলো নড়বড়ে, একটা চাপ লাগলেই ক্যাঁচক্যাঁচ করে ওঠে।

আরেকটা প্রশ্ন। মুসা, লোকটা যে ঢুকলো টাওয়ারে, কেন আমাদের হুঁশিয়ার করলে না?'

'দেখিইনি, সাবধান করবো কি?'

'ঠিক,' আবার বললো কিশোর। 'তাহলে তুমি কাউকে টাওয়ারে ঢুকতে দেখোনি। আমি আর রবিন তার আসার শব্দ শুনিনি। রান্নাঘরের দরজা ভেতর থেকে ছিটকানি লাগানো।'

'তাতে কি?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'তাতে? লোকটা রান্নাঘর থেকে সিঁড়ি বেয়ে সেলারে নামেনি। টাওয়ারের সামনে-পেছনের কোনো দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকেনি।'

'কিন্তু সেলারে ঢোকার তো আর কোনো পথও নেই,' রবিন বললো।

'থাকতে বাধ্য,' দৃঢ়কণ্ঠে যেন ঘোষণা করলো কিশোর। 'অন্তত এখন। ছিলো না বলেই মাটি খুঁড়তে হয়েছে মেজরের চেলাদেরকে।'

'সুড়ঙ্গ কেটে ঢুকেছে!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো রবিন।

'না, সম্ভবত কাটেনি, পরিষ্কার করেছে,' শুধরে দিলো কিশোর। 'অনেক বছর আগে দুর্গ থেকে বার বার পালিয়েছে বেগুনী জলদস্যু, মনে নেই? কেউ টাওয়ার থেকে তাকে বেরোতে দেখেনি, নিশ্চয় গোপন কোনো পথে পালিয়েছে। এবং সেটা সুড়ঙ্গ ছাড়া আর কিছু না।'

এতোক্ষণে মুখ খুললো ভিকটর,' কিশোর ঠিকই বলেছে। পুরনো একটা সুড়ঙ্গ আছে টাওয়ার থেকে বেরোনোর। অনেক আগেই ধসে পড়েছিলো, হয়তো নতুন করে খুঁড়ে নেয়া হয়েছে। আমি শুনেছি, আছে, কিন্তু ঠিক কোথায়, জানি না।'

'খুঁজে বের করে ফেলা যাক,' চঞ্চল হয়ে উঠলো মুসা। 'তাহলেই জেনে যাবো।'

সেলারের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ে খুঁজতে আরম্ভ করলো চারজনে। স্টোররুমে পাইপ আর শিক পাওয়া গেল। ওগুলো দিয়ে দেয়ালে, মেঝেতে বাড়ি মেরে আর খুঁচিয়ে দেখতে লাগলো ওরা। আলগা পাথর কিংবা যা-ই পড়ে থাকতে দেখছে, সরিয়ে ফেলছে।

'মেঝেতে পায়ের ছাপ খোঁজো,' পরামর্শ দিলো কিশোর।

কিন্তু মেঝের মাটি এতো শক্ত, পায়ের ছাপ পড়েই না।

'এই যে!' হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো ভিকটর।

হুড়াহুড়ি করে এলো ছেলেরা। শিক দিয়ে বাড়ি মারলো আবার সে। ফাঁপা আওয়াজ বেরোলো দেয়ালের গা থেকে। কিছু পাথর পড়ে আছে জায়গাটার নিচে। সেলারের ম্লান আলোয় পরীক্ষা করে দেখলো কিশোর। কিন্তু দেয়ালে কোনো দরজা কিংবা আলগা পাথর বসানো দেখলো না।

'সুড়ঙ্গটা গোপন রাখা হয়েছে,' বললো সে, 'তারমানে মুখটাও গোপন। দরজা-টরজা যদি থাকে, এপাশ থেকে খোলার ব্যবস্থা থাকবে। এবং সেটা খুব দ্রুত আর সহজে খুলবে, নইলে বেরোতে পারতো না বেগুনী জলদস্যু। রান্নাঘর

থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে দ্রুত খুলেছে। সিঁড়িটার কাছে দেখা দরকার।'

সিঁড়ির প্রতিটি ধাপ, ওপর-নিচের জায়গা ভালো করে দেখা হলো। জিনিসটা প্রথমে চোখে পড়লো মুসার। অর্ধেক সিঁড়ি নিচে একটা ধাপের তলায় ছোট একটা লোহার আঙটা। ওটা ধরে টান দিতেই দেয়ালের গা থেকে খুলে এলো একটা চ্যাপ্টা পাথর। তার পেছনে দেখা গেল একটা লোহার লিভার, ভালোমতো তেল দেয়া। চাপ দিলো সে। নিঃশব্দে ফাঁক হয়ে গেল সিঁড়ির কাছে দেয়ালের একাংশ।

'বাহ্, চমৎকার,' কিছুটা বিরক্ত হয়েই বললো ভিকটর। 'এখানে একেবারে আমার নাকের ডগায় আলি-বাবার সিসেম ফাঁক রয়েছে, আর আমি গর্দভ কিচ্ছু জানি না।'

স্টোররুম থেকে একটা টর্চ নিয়ে এলো সে। আগে আগে ঢুকে পড়লো সুড়ঙ্গে। পেছনে চললো তিন গোয়েন্দা। যেমন সরু দেয়াল, তেমনি নিচু ছাত। ওদের মধ্যে মুসাই সব চেয়ে লম্বা, সে কোনোমতে সোজা হতে পারে। দু'জন মানুষ পাশাপাশি চলতে পারে না, শুধু একজনের জায়গা হয়। সুড়ঙ্গমুখের সামান্য ভেতরেই আরেকটা লিভার।

'ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করার জন্যে নিশ্চয়,' কিশোর বললো।

সুড়ঙ্গর ছাত আর দেয়াল পাথরের, তবে পায়ের তলায় মাটি। সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে দেয়াল আর ছাত থেকে খসে পড়া পাথর। মিটার বিশেক পরেই ধসে পড়েছে সুড়ঙ্গটা।

'বাবার কাছে শুনেছি,' ভিকটর বললো, 'আমার জন্মের আগেই নাকি ভেঙেছে ওটা। ভূমিকম্পে।'

তবে ধসে পড়লেও এখন আর বন্ধ নয়, পথ করা হয়েছে। মোটা একজন মানুষও ওই ফোকর গলে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে পারে। মাটি আর পাথর সরিয়ে পথটা করা হয়েছে। তাতে ঢুকে পড়লো চারজনেই, একজনের পেছনে একজন। হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলো অন্যপাশে। তারপর আবার উঠে দাঁড়ালো। পায়ের তলায় পাথরের ছড়াছড়ি। আরও মিটার বিশেক পরে শেষ হলো সুড়ঙ্গ। চারটে ভারি তক্তার ওপর লোহার দণ্ড আড়াআড়ি লাগিয়ে পাল্লামতো তৈরি করা হয়েছে। কজা লাগানো রয়েছে। ঠেলা দিতেই ঝটকা দিয়ে নেমে গেল পাল্লাটা। পুরোটা নামলো না, ঝুলে থাকলো মাঝপথে, দুপাশের দুটো শেকলের ওপর। হেঁটে ওটার ওপর উঠে এলো ওরা। নিচে দেখা যাচ্ছে কালো পানি। সামনে কাঠের দেয়াল, কাঠের ছাত।

'বোটহাউসে ঢুকেছি আমরা!' চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর। 'পিয়ারের নিচে!'

'ঠিকই বলেছো!' ঘাড় নাড়লো ভিকটর।

'ওপাশে যেতে হলে সাঁতরাতে হবে,' রবিন আন্দাজ করলো।

'না-ও লাগতে পারে,' বললো মুসা। পিয়ারের নিচে রাতের বেলা পানিতে নামার কথা মনে পড়েছে তার। 'হয়তো খুব কম। তাহলে হেঁটেই যাওয়া যাবে।'

মুসার কথাই ঠিক। নিচে পানি খুব কম। পাল্লাটা আবার আগের মতো করে সুড়ঙ্গের মুখে লাগিয়ে দু'পাশের ফাঁকে দুটো কাঠের গোঁজ লাগিয়ে দেয়া হলো। লাগানো ছিলো ওভাবেই।

পানি মাড়িয়ে হেঁটে এসে পিয়ারের ওপর উঠলো ওরা। আলো বেশি নেই। একমাত্র ছোট জানালাটা আর তক্তার ফাঁক দিয়ে যা আলো আসছে। তাতে এতোবড় বোটহাউসের অন্ধকার কাটছে না।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে পেছনে ফিরে তাকালো কিশোর। চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'জানা না থাকলে বোটহাউসে ঢুকে ওই সুড়ঙ্গ খুঁজে বের করা কঠিন। বোঝাই যায় না। মেজর নিরেকের নিশ্চয় জানা ছিলো।'

'দোকানে একটা নকশা দেখছিলো, মনে আছে?' রবিন বললো। 'মনে হয় ওটাতেই রয়েছে সুড়ঙ্গের নির্দেশ।'

'হতে পারে,' একমত হলো কিশোর।

বনের ভেতর দিয়ে জেটিতে চলে এলো ওরা। প্রথম অভিযান শেষ করে ফিরে এসেছে ব্ল্যাক ভালচার। যাত্রীরা নেমে গেছে, তবে ক্যাপ্টেন ফিলিপ, পিটার আর জেসন এখনও রয়েছে ডেকে। তিন গোয়েন্দার সঙ্গে ভিকটরকে দেখে ভয় পেয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। বলে উঠলেন, 'এই, তোমাদেরকে না বলেছিলাম...'

হেসে অভয় দিলো ভিকটর, 'হয়েছে হয়েছে, ধমকাতে হবে না। ওরা কি করছে, জানি আমি। এখন আমিও চাই রহস্যটার সমাধান হোক। কি যেন নাম বললে? মেজর... মেজর...'

'মেজর নিরেক,' ধরিয়ে দিলো কিশোর। ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করলো, 'শো কখন শুরু করেছিলেন, স্যার?'

'পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে।' নোনতা জেসনের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন। দূরে তাকিয়ে রয়েছে লোকটা। 'দেরিটা হলো ওর জন্যে। ওকে বাদ দিয়েই শুরু করে দিয়েছিলাম আমরা। তবে শেষ মুহূর্তে এসে হাজির হলো, আমরা তখন প্রথম দ্বীপটার কাছে চলে গেছি।'

খবরটা আর চেপে রাখতে পারলো না মুসা। 'কোথায় খোঁড়া হয়েছে, দেখে ফেলেছি, স্যার। আপনাকে আর পিটারকে কেন সরিয়ে রাখতে চেয়েছে, তা-ও বোঝা গেছে। বোটহাউস থেকে টাওয়ারে ঢোকার একটা সুড়ঙ্গ আছে। ওটার ভেতরেই খুঁড়েছে ওরা, মাটি আর পাথর পরিষ্কার করেছে।'

টাওয়ারে ঢোকার পর থেকে কি কি ঘটেছে খুলে বললো ছেলেরা।

জেসনের দিকে তাকালো কিশোর। 'আপনার এতো দেরি হলো যে আজ?'

'গাড়িটা ট্রাবল দিচ্ছিলো,' বলেই মুখ কালো করে কিশোরের মুখোমুখি হলো নোনতা জেসন। 'তাতে তোমার কি?'

তার কথার জবাব না দিয়ে ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর, 'বেগুনী জলদস্যুর পোশাকটা কোথায় রাখেন, স্যার?'

দ্বীপে। একটা ছাউনিতে। কাজের সময় হাতের কাছে পেয়ে যায় ওরা।'

'তালা দেয়া থাকে?'

'নাহ্।'

'তারমানে যে খুশি গিয়ে পরতে পারে?'

'পারে।'

নিরাশ মনে হলো কিশোরকে। পরক্ষণেই উজ্জ্বল হলো আবার চেহারা। 'যা-ই হোক, এখন আমরা জানি, কোথায় খুঁড়ছেন মেজর। কি খুঁজছেন জানি না। টাওয়ারে হয়তো লুকানো আছে কিছু। সুড়ঙ্গেও থাকতে পারে। মিস্টার ইভানস, আপনি কিছু জানেন?'

শ্রাগ করলো ভিকটর। মুখ বাঁকালো। মাথা নেড়ে বললো, 'না।'

'আপনি?' ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'বেগুনী জলদস্যুর রেখে যাওয়া কোনো জিনিস হয়তো খুঁজছে। লোকে তো ঘাঁটাঘাঁটি কম করেনি একশো বছর আগে। উপদ্বীপের কোথাও খোঁজা বাদ রাখেনি।'

'তার রেখে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। পরে অবশ্য অনেক চোর-ডাকাত আস্তানা গেড়েছিলো এখানে। তারাও রেখে যেতে পারে কিছু।'

রবিন বললো, 'যা-ই রেখে যাক, এখনও নিশ্চয় আছে। কারণ খোঁজাখুঁজি চলছেই।'

'হ্যাঁ,' কিশোর বললো, 'কাল রাতেও এসেছিলেন মেজর। মুসা, দেখগে তো পাহারা এখনও চলছে কিনা?'

মাথা ঝাঁকিয়ে দ্রুতপায়ে গেটের দিকে রওনা হয়ে গেল গোয়েন্দা সহকারী। ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকালো ভিকটর। 'পাহারা? কিসের পাহারা?'

'পাহারা দেয়ার লোক রেখে গেছেন মেজর নিরেক,' জানালো রবিন। 'দিন-রাত পাহারা দেয় বেগুনী জলদস্যুর আড্ডা। কখনও একজন, কখনও দু'জন, থাকেই। চোখ রাখে।'

চোয়াল ডললো ভিকটর। 'সারাক্ষণই?'

'এই আরেকটা ব্যাপার,' জবাব দিলো কিশোর, 'আমাকে অবাক করেছে। মেজরের যেন ভয়, এখান থেকে লুকানো জিনিস নিয়ে বেরিয়ে যাবে কেউ। হতে পারে, অন্য কেউও ওই জিনিসের পেছনে লেগেছে। ভয়টা হয়তো সেকারণেই পাচ্ছেন।'

'বেগুনী জলদস্যুর পোশাক পরা লোকটা না তো?' রবিন বললো।

ফিরে এলো মুসা। 'আইসক্রীম ভ্যানটা আছে।'

'আজ রাতে আবার গল্প শোনাতে যাবেন, স্যার?' ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'নিশ্চয় যাবো,' বাবার হয়ে আগ বাড়িয়ে জবাবটা দিলো পিটার।

'তাহলে,' বেশ জোর দিয়ে বললো কিশোর, 'আজ রাতে আবার আসতে হবে আমাদের। সারাটা রাতই জেগে থাকতে হতে পারে। বাড়ি গিয়ে এখন কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেয়া দরকার।'

ভিকটর আর জেসনের দিকে তাকালো সে। 'আপনাদেরকে একটা অনুরোধ করবো। আজ রাতে আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে আপনাদের। মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে পরিস্থিতি। তখন সাহায্য লাগবে। একা হয়তো কুলিয়ে উঠতে পারবো না আমরা।'

আঠার

আবার বেগুনী জলদস্যুর আড্ডায় এসে ঢুকলো তিন গোয়েন্দা। টর্চ আর ওয়াকি-টকি নিয়ে এসেছে। ওরা এসে দেখলো, শেষ শো-এর দর্শকরা বেরিয়ে যাচ্ছে।

ঘন্টাখানেক পর নোনতা জেসন এসে ঢুকলো ট্রেলারে।

নির্দিষ্ট সময়ে গল্প রেকর্ড করার জন্যে ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন ফিলিপ।

'সময় হয়েছে,' শান্তকণ্ঠে বললো কিশোর।

ট্রেলার থেকে বেরিয়ে ছায়ায় ছায়ায় এগোলো ওরা। কালো কাপড় পরে এসেছে, প্রহরীর চোখে পড়বে না সহজে।

বোটহাউসে এসে ঢুকলো চারজনে, তিন গোয়েন্দা আর নোনতা জেসন। মই বেয়ে পাল রাখার তাকে উঠে পড়লো রবিন, মুসা আর জেসন। কিশোর নেমে পড়লো পিয়ারের নিচের পানিতে। সুড়ঙ্গমুখের তক্তা সরিয়ে ভেতরে ঢুকলো। দ্রুত চলে এলো শেষ মাথায়। লিভার চেপে গোপন দরজা খুলে ঢুকলো টাওয়ারের সেলারে। ওখানে তার জন্যে অপেক্ষা করছে ভিকটর ইভানস।

তাকের ওপরে ঘাপটি মেরে রয়েছে মুসা, রবিন আর জেসন। জুনের ঠাণ্ডা রাত। বাইরের রাস্তায় গাড়ি চলাচলের শব্দ হচ্ছে। গাঁয়ের ভেতরে একটা কুকুর ডাকলো। পানির কিনারে দূরে কে যেন গান গাইছে চড়া বেসুরো গলায়। একটা বিমান উড়লো। একটা ভ্যানের দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ হলো। শব্দটা এলো গেটের কাছ থেকে।

খানিক পরে শোনা গেল এঞ্জিনের চাপা গুঞ্জন। স্নায়ু টানটান হয়ে গেল রবিন আর মুসার। দম বন্ধ করে ফেললো ওরা। বোটহাউসের বাইরে থামলো গাড়িটা। দরজা খুলে দেয়া হলো, বোটহাউসের ভেতরে ঢুকে পড়লো ওটা। ওপরে নিথর হয়ে আছে তিনজনে। ওয়াকি-টকি নাকের কাছে এনে জোরে জোরে তিনবার নিঃশ্বাস ফেললো রবিন। কিশোরের জন্যে মেসেজ।

জবাবে তিনবার টোকার শব্দ হলো। নিজের ওয়াকি-টকির গায়ে টোকা দিয়েছে কিশোর।

দরজা খুলে ভ্যান থেকে নামলেন মেজর নিরেক আর রিগো। টর্চ জেলে নেমে

পড়লেন পানিতে। হেঁটে চললেন সুড়ঙ্গের দিকে।

হঠাৎ দড়াম করে গড়িয়ে পড়লো একটা মাস্তুল। এতো জোরে চমকে উঠলো মুসা আর রবিন, মনে হলো ওদের কানের কাছে বোমা ফেটেছে। মুখ খিস্তি করে গাল দিয়ে উঠলো জেসন। বোধহয় সরতে গিয়েছিলো, নাড়া লেগে পড়ে গেছে মাস্তুলটা।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে টনি, তার টর্চের আলো এসে পড়লো সোজা রবিন আর মুসার ওপর। মেজর আর রিগোর টর্চও ঘুরে গেল এদিকে। একমুহূর্ত থেমে দাঁড়িয়ে দেখলো দুজনে চুপচাপ। তারপর আবার এসে উঠলো পিয়ারে।

'নামো!' টর্চের আলো নাচিয়ে আদেশ দিলো টনি।

নেমে এলো মুসা আর রবিন।

'এই, কোথায় যেন দেখেছি তোমাদের?' মেজর বললেন। 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তোমরাই সেদিন আমাকে বাঁচিয়েছিলে। গল্প শোনাতে এসেছিলে। এখানে কি করছো? আরেকটা ছেলে কই? তিনজন এসেছিলে, মনে আছে।'

'আ-আ-আমরা...' তোতলাতে লাগলো রবিন।

ওপরে আর কেউ আছে কিনা দেখার জন্যে উঠে গিয়েছিলো রিগো, চেঁচিয়ে বললো, 'আর কেউ নেই, বস।'

অবাক হলো তিন গোয়েন্দা। জেসন গেল কোথায়?

'গাধা কোথাকার!' ধমক দিয়ে বললেন মেজর, 'ভালো করে দেখো। নিশ্চয় আছে আরেকজন।' মুসা আর রবিনের দিকে ফিরে বললেন, 'এবার বলো, এখানে কি করছো।'

'এমনি,' জবাব দিলো রবিন। 'শো দেখতে এসেছিলাম। বোটহাউসটা চোখে পড়লো। কৌতূহল হওয়ায় দেখতে এসেছিলাম। ওই তাকে উঠেছি দেখার জন্যে। টায়ার্ড লাগছিলো। বিশ্রাম নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি।'

'ঠিক,' তাড়াতাড়ি বললো মুসা, 'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম!'

মই বেয়ে নেমে আসছে রিগো। শেষ কয়েকটা ধাপ নামার আগেই হাত পিছলালো। পুরো বোটহাউসটা কাঁপিয়ে দিয়ে ধুড়ুম করে পড়লো হাত-পা ছড়িয়ে। ধাক্কা লেগে চিত হয়ে পড়ে গেল মুসা।

'এতোবড় অপদার্থ জীবনে দেখিনি!' রাগে চেঁচিয়ে উঠলেন মেজর।

হাস্যকর ভঙ্গিতে উঠে বসলো রিগো। ঘাড় ফিরিয়ে মুসার দিকে তাকালো। সে এখনও উঠতে পারেনি। তাকে টেনে তুলে মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। তারপর চিৎকার করে বললো, 'বঅস, চিনেছি! বলেছিলাম না কাল রাতে চোখ রেখেছিলো? এই ছেলেটাই!'

'তাই নাকি?' চিন্তিত মনে হলো মেজরকে। 'পকেট-টকেট ঘেঁটে দেখো কি আছে?'

বেরোলো তিন গোয়েন্দার কার্ড, টর্চ আর ওয়াকি-টকি। টনি বের করলো

ওগুলো।

কার্ডটা পড়লেন মেজর। 'গোয়েন্দা! হুঁম্‌ম্‌! এ-জন্যেই আমাদের পেছনে লেগেছো। তোমাদের আরেক সঙ্গী কাছাকাছিই আছে, তোমাদের মেসেজের অপেক্ষায়।' একটা ওয়াকি-টকি তুলে নিলো সে। মুখের কাছে এনে কিশোরের উদ্দেশ্যে বললো, 'যেখানেই থাকো, মন দিয়ে শোনো। তোমার দুই দোস্তকে ধরেছি। কোনো চালাকির চেষ্টা করবে না। আমাদের কাজে বিঘ্ন ঘটাবে না। তাহলে তোমার বন্ধুরা মরবে, বিশ্বাস করো কথাটা—মরবে।'

উনিশ

লিভিং রুমে বসে ওয়াকি-টকিতে বোটহাউসের সমস্ত কথাই শুনলো কিশোর আর ভিকটর। পরিষ্কার দেখতে পেলো যেন দৃশ্যটা।

ওয়াকি-টকির সুইচ অফ করে দিয়ে কিশোর বললো, 'ধরে ফেললো!'

'শান্ত হও,' ভিকটর বললো।

'কিছু একটা করা দরকার।'

'কি করবো? হয়তো...'

ঘন ঘন করাঘাতের শব্দ হলো সামনের দরজায়। একটানে পকেট থেকে পিস্তল বের করে সেদিকে এগোলো ভিকটর। হ্যাঁচকা টান দিয়ে খুলে ফেললো পাল্লা।

জেসন দাঁড়িয়ে রয়েছে। পা ভেজা। দ্রুত এসে ঘরে ঢুকলো সে। একবার কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে বন্ধ করে দিলো দরজাটা। বললো, 'মেজরের লোকেরা ধরে ফেলেছে ছেলেদুটোকে!'

'জানি। তুমি পালিয়ে এলে কি করে?'

'জানালার কাছে বসেছিলাম। তাক থেকে ওটা গলে বেরিয়ে পড়েছি, ব্যাটাদের চোখ এড়িয়ে। পানি ভেঙে পাড়ে উঠেছি।'

'কপাল ভালো তোমার। যাক, তুমি আসায় ভালোই হলো। একটা উপায় বোধহয় করতে পারবো।'

'কি করতে চাইছেন, স্যার?' কিশোর জিজ্ঞেস করলো।

'চলো, জলদি সেলারে চলো!'

তাড়াহুড়ো করে সেলারে নেমে এলো ওরা। সিঁড়ির আড়ালে জেসনকে লুকিয়ে থাকতে বললো ভিকটর।

'আপনার প্ল্যানটা কি?' জানতে চাইলো জেসন।

'হ্যাঁ, কি করতে চান?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'একটা কথা বলা দরকার,' ভিকটর বললো। 'স্বীকারই করে ফেলি। আমি...'

'গুপ্তধন পেয়ে গেছেন!' চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর। 'পাইরেটস কোভে এসেছেনই আপনি সেজন্যে! জানেন, আছে!'

'হ্যাঁ, কিশোর, জানতাম। ঠিকই বুঝেছো। সাতদিন আগেই বের করে ফেলেছি আমি।'

'তার মানে টাওয়ারেই ছিলো?'

মাথা ঝাঁকালো ভিকটর। 'ছিলো। এই স্টোররুমেই। পুরনো একটা চীনা আলমারিতে। অনেক আগে বাবার মুখে শুনেছিলাম গল্পটা। বেগুনী জলদস্যু লুকিয়ে রেখে গিয়েছিলো। এতোদিন নানা কাজে ব্যস্ত ছিলাম বিদেশে, এশিয়ায়। ওখান থেকে ফিরেই চলে এসেছি টাওয়ারে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর গত হপ্তায় পেয়েছি ওগুলো।'

'তাহলে কাউকে বললেন না কেন?'

'সত্যি বলতে কি, আমি এখনও জানি না, আইনত ওগুলো কার প্রাপ্য। যতোদিন সেটা না জানবো, গোপনই রাখতে চাই খবরটা।'

'এতোদিন পর যার হাতে পড়বে তারই হওয়ার কথা। আর আপনার তো বিশেষ অধিকার রয়েছে। জিনিসগুলো আপনার পূর্বপুরুষের।'

'চোর-ডাকাত যারই হাতে পড়বে, তার?' জেসনের প্রশ্ন।

'জানি না,' ভিকটর বললো। 'সে-জন্যেই আর কারও হাতে পড়তে দিতে চাই না। অন্তত মেজরের হাতে তো নয়ই।'

'এখন প্ল্যানটা কি বলে ফেলুন,' তাড়া দিলো কিশোর। 'সময় বেশি নেই।'

'সেলারেই ঢুকবে মেজর, কোনো সন্দেহ নেই। খালি হাতে নিশ্চয় আসেনি, পিস্তল-টিস্তল থাকবে। এখানে এসে তোমাকে দেখলে অবাক হবে না। কিন্তু জেসন আছে, কল্পনাই করবে না। সে-জন্যেই ওকে সিঁড়ির আড়ালে লুকাতে বলছি। মেজরকে বলবো আমি গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছি। সেগুলো বের করে দিতে বাধ্য করবে আমাকে সে। দেখাতে নিয়ে যাবো। ওই সময়টায় তোমার কথাও হয়তো ভুলে যাবে সে। ওই সুযোগে তুমি বেরিয়ে যাবে স্টোররুম থেকে। বাইরে থেকে তুমি আর জেসন মিলে দরজাটা লাগিয়ে দেবে। আর তুমি যদি বেরোতে না পারো, জেসন একাই লাগাবে।'

'কিন্তু আপনি তো ওদের সঙ্গে ভেতরে আটকা পড়বেন।'

'আমার কাছে পিস্তল আছে।' স্টোররুম থেকে বিরাট একটা পুরনো তালা এনে জেসনের হাতে দিলো ভিকটর। 'একেবারে তালা লাগিয়ে দেবে। আমার জন্যে ভেবো না। ওদেরকে ঠিকই আটক করতে পারবো আমি। আটকে রাখবো। তোমরা তখন গিয়ে মুসা আর রবিনকে মুক্ত করবে। ওরা গিয়ে পুলিস নিয়ে আসবে।'

'ওই যে, আসছে,' ফিসফিস করে বললো জেসন।

'যাও, সিঁড়ির নিচে লুকাও গিয়ে। কিশোর, তুমি আমার পেছনে থাকো।'

ঘরের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়ালো ভিকটর। খুলতে আরম্ভ করেছে সুড়ঙ্গের দরজা।

পিস্তল হাতে ঘরে ঢুকলেন মেজর আর টনি। ভিকটর আর কিশোরকে দেখেছেন।

'তিন নম্বর গোয়েন্দা তাহলে এখানে,' মেজর বললেন। 'গুড। মিস্টার ইভানসও আছেন। আগেই আন্দাজ করা উচিত ছিলো আমার। যাকগে, খারাপ হয়নি। মিস্টার ইভানস, কোনো চালাকি চাই না। মালগুলো আপনি পেয়ে গেছেন জানি। নইলে আমি পেতাম। বলুন, কোথায় সরিয়েছেন?'

শ্রাগ করলেন ভিকটর। যেন হাল ছেড়ে দিয়েছেন, এমন ভঙ্গিতে বললেন, 'ঠিক আছে, কি আর করা! ছেলেগুলোর ক্ষতি হোক, এটা চাই না। স্টোররুমে পেছনের দেয়ালের কাছে একটা আলমারি আছে, তার মধ্যে।'

উত্তেজনায় হুঁশ হারিয়ে ফেললো টনি। সোজা দৌড় দিলো আলমারির দিকে। বলতে না বলতেই যে এতো সহজে রাজি হয়ে গেছে ভিকটর, কেন হলো, ভাবলো না একবারও। পিস্তল ঢুকিয়ে ফেলেছে হোলস্টারে।

কিন্তু মেজরের মাথা এতোটা ফাঁকা নয়। 'টনি!' বলে চিৎকার করে উঠলেন তিনি। মাঝপথে থমকে দাঁড়ালো টনি। ভিকটরের দিকে পিস্তল নাচালেন তিনি। 'আপনি আগে যান, মিস্টার ইভানস। হাঁটুন।'

ঘুরে দাঁড়ালো ভিকটর। ঠিক পেছনেই রইলো টনি আর মেজর। একবারের জন্যেও তার চওড়া কাঁধ থেকে চোখ সরালেন না মেজর। কিশোরের দিকে নজরই নেই দু'জনের কারো।

নিঃশব্দে বেরিয়ে চলে এলো কিশোর। সিঁড়ির আড়াল থেকে বেরোলো জেসন। দু'জনে মিলে ঠেলে বন্ধ করে দিলো ভারি পাল্লাটা। তালা লাগিয়ে দিলো।

দরজা যে বন্ধ হয়ে গেছে, সেটা বুঝতেও দেরি করে ফেললেন মেজর। তারপর শুরু হলো ভেতরে চেঁচামেচি, হট্টগোল। দরজায় জোর ধাক্কা পড়লো।

তার পর শোনা গেল ভিকটর ইভানসের কঠোর কণ্ঠ, 'খবরদার! পিস্তল ফেলো! নইলে খুলি ছাতু করে দেবো!'

'চলুন!' জেসনকে বলেই আর দাঁড়ালো না কিশোর। সিঁড়ির দিকে ছুটলো।

বিশ

ভ্যানের ভেতরে পড়ে রয়েছে রবিন আর মুসা। হাত-পা বাঁধা। ওদেরকে পাহারা দিচ্ছে রিগো। সে নিজেই অস্বস্তিতে ভুগছে, বন্দি পাহারা দেবে কি। তার হাতের টর্চের কাঁপুনি দেখেই বোঝা যায়। মাঝে মাঝেই কিছু না করার জন্যে হুঁশিয়ার করছে বন্দিদের। শেষে একটা খচমচ আওয়াজ শুনে আর থাকতে না পেরে উঠে চলে গেল, বোটহাউসের বাইরে কেউ আছে কিনা দেখার জন্যে।

ফিসফিস করে উঠলো রবিনের ওয়াকি-টকি।

'নথি,' নিচু গলায় বললো মুসা, কিশোর! 'দেখো, সুইচটা অন করতে পারো কিনা। তাহলে ট্র্যান্সমিট করতে পারবে।'

হাত-পা বাঁধার আগে ওদের যার যার জিনিস আবার ফেরত দিয়েছে রিগো।

শরীর অনেক মুচড়ে-টুচড়ে, হাতের আঙুল কোনোমতে সুইচের কাছে নিয়ে যেতে সক্ষম হলো রবিন। কাপড়ের ওপর দিয়েই সুইচ টিপে দিলো। বললো, 'রবিন বলছি!'

'রিগো আছে?' ভেসে এলো কিশোরের কণ্ঠ।

'বাইরে গেছে। কেউ আসছে কিনা দেখতে।'

'ওকে বলো, মেজর কথা বলতে চায়।'

'কিন্তু মেজরের কাছে তো ওয়াকি-টকি নেই। ও জানে।'

'বলো, আমারটা কেড়ে নিয়েছে।'

মুসা ডাকলো, 'রিগো? মেজর ডাকছেন!'

দুপদাপ করে ছুটে এসে ভ্যানে ঢুকলো হাতির বাচ্চা। 'কী?'

'মেজর আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান,' রবিন বললো।

'কথা?' চারপাশে তাকালো রিগো। মেজরকে দেখতে পেলো না।

'ওয়াকি-টকিতে বলবেন,' মুসা বুঝিয়ে দিলো।

'ওহ্!' শরীর ঢিল করলো রিগো। 'কিন্তু তিনি ওয়াকি-টকি পেলেন কোথায়?'

'আমাদের আরেক বন্ধু আছে না, তারটা কেড়ে নিয়েছেন। সে-ও ধরা পড়েছে আমাদের মতোই।'

'ভালো হয়েছে…'

হঠাৎ শোনা গেল ভারি কণ্ঠ, 'এই বলদ, এতো কথা বলছো কেন? কথা বলতে বলেছি, বলো?'

অবাক হলো না মুসা আর রবিন। কিশোরের অভিনয় ক্ষমতার কথা জানা আছে ওদের। তবে রিগো চমকে গেল। 'ব-বলুন, বস্!'

'তোতলাচ্ছো কেন, রামছাগল! শোনো, ছেলেদুটোকে আরও শক্ত করে বাঁধো। ওদের ওয়াকি-টকিগুলো কেড়ে নিয়ে চলে এসো আমাদের কাছে, সুড়ঙ্গ দিয়ে। এখুনি। গাধামি করবে না।'

'না, বস। এখুনি আসছি,' বলতে বলতেই রবিনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলো রিগো।

তাড়াহুড়োয় রবিন আর মুসাকে 'আরও শক্ত করে' বাঁধার কথাও ভুলে গেল সে। ওয়াকি-টকিদুটো বের করে নিয়েই বেরিয়ে গেল ভ্যান থেকে। মুহূর্ত পরেই পানিতে শোনা গেল তার ভারি পায়ের আওয়াজ।

রিগো বেরিয়ে যাওয়ার মিনিটখানেক পরেই খুলে গেল বোটহাউসের দরজা। ভ্যানে এসে ঢুকলো জেসন। মুসা আর রবিনের বাঁধন খুলে দিলো দ্রুতহাতে। হেসে জানালো, মেজর আর টনিকে কিভাবে স্টোররুমে আটক করেছে।

'গুপ্তধন পেয়ে গেছেন মিস্টার ইভানস?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'পেয়ে গেছেন। আমিও খোঁজা শুরু করার আগেই।'

'আপনিই তাহলে বেগুনী জলদস্যু সেজে এসেছিলেন সেদিন। আমাদের ভয় দেখিয়েছেন,' মুসা বললো।

'একটা জিনিস ফেলে গিয়েছিলাম,' আরেক দিকে তাকিয়ে বললো জেসন। 'সেটা নিতে এসেছিলাম আড্ডায়, রাতের বেলা। বোটহাউস থেকে বেরোতে দেখলাম কয়েকজন লোককে। সন্দেহ হলো। খোঁজাখুঁজি শুরু করলাম। সুড়ঙ্গমুখটা খুঁজে বের করতে দু'দিন লেগেছে। লুকিয়ে থেকে শুনে বুঝলাম, কোনো মূল্যবান জিনিস খুঁজছে ওরা। আমিও ওই কাজে লেগে পড়লাম। তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বিশ্বাস করো, কোনো ক্ষতি করতে চাইনি।'

'বাদ দিন ওসব কথা,' রবিন বললো। 'তাড়াতাড়ি বেরোনো দরকার। রিগো ফিরে আসতে পারে।'

টাওয়ারের কাছে অন্ধকারে অপেক্ষা করছে কিশোর। ওদেরকে আসতে দেখেই ওয়াকি-টকির ওপর ঝুঁকলো। 'এই গাধা, শুনছো? বোটহাউসে ফিরে যাও। তোমার আসার আর দরকার নেই। গিয়ে পাহারা দাও ওদের। যদি ওরা পালায়, পিঠের ছাল তুলবো আমি তোমার! জলদি যাও!' বলে আপনমনেই নীরবে হাসলো গোয়েন্দাপ্রধান।

কিশোরের কথা মুসার কানেও গেছে। কাছে এসে হাসলো সে। 'আহারে, বেচারার জন্যে কষ্টই লাগছে আমার!'

'এখন কি করবো?' রবিন জিজ্ঞেস করলো।

'পুলিসের কাছে যেতে হবে,' কিশোর জবাব দিলো।

পুলিস এসে আটক করলো মেজর নিরেক আর টনিকে। পাহারা দিচ্ছিলো আড্ডার বাইরে গুন, তাকেও ধরলো। কিন্তু রিগোকে ধরতে পারলো না। যেই এসে সে দেখেছে, মুসা আর রবিন নেই, আর দেরি করেনি। ভ্যান নিয়ে পালিয়েছে মেজরের ভয়ে। বোটহাউসের দরজা লাগানো ছিলো, সেটা খোলার প্রয়োজন মনে করেনি। গাড়ি দিয়ে গুঁতো মেরে দরজা ভেঙেইপালিয়েছে।

আলমারি থেকে কালো একটা বাক্স বের করলো ভিকটর। ডালার ওপরে তামার পাত বসিয়ে নাম লেখা রয়েছেঃ লেফটেন্যান্ট উইলিয়াম ইভানস। একটা টেবিলে বাক্সটা রেখে ডালা তুললো সে।

'খাইছে!' বলে উঠলো মুসা।

গলা বাড়িয়ে এগিয়ে এলো পিটার, ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে।

সোনা আর রূপার নানারকম মূল্যবান অলংকার আর তৈজসপত্রে বাক্সটা বোঝাই। ঝকঝক করছে ঘরের ম্লান আলোয়।

একটা আঙটি তুলে নিলো কিশোর। বাক্সের গায়ে আঙুল বুলিয়ে দেখলো।

'কয়েক লাখ ডলারের জিনিস,' বিড়বিড় করলো রবিন।

পুলিসের সঙ্গে ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারও এসেছেন। বললেন, 'আপনি যখন পেয়েছেন, আপনারই থাকবে জিনিসগুলো। হারানোর ভয় নেই। কারণ আপনি উইলিয়াম ইভানসের বংশধর। তবে সেটা প্রমাণ করতে হবে আপনাকে কোর্টে। ভালো দেখে একজন উকিল রাখবেন, হয়ে যাবে।'

'আপনার পরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ,' বললো বটে ভিকটর, কিন্তু অস্বস্তি গেল না তার।

বন্দিদেরকে নিয়ে বেরিয়ে গেল পুলিস। ক্যাপ্টেন রইলেন শুধু। তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'আরেকটা রহস্যের সমাধান করলে। তোমাদের নিয়ে গর্বই হয় আমার। বাড়ি যাবার সময় হয়েছে নিশ্চয়। যাবে না? লিফট দিতে পারি।'

'আমার তরফ থেকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি ওদের,' ভিকটর বললো। 'চোরগুলোকে ধরিয়ে দেয়ার জন্যে। কাল আসবে নাকি তোমরা? আমাকে সাহায্য করতে? বাক্সটা সরিয়ে ফেলা দরকার। চোরগুলো জামিনে মুক্তি পেয়েই আবার এগুলো কেড়ে নিতে আসবে।'

'কাল দুপুরের আগে জামিন পাচ্ছে না ওরা,' চীফ বললেন। 'ততোক্ষণে বাক্সটা সরিয়ে ফেলতে পারবেন। কোনো ব্যাংকে নিয়ে গিয়ে রেখে দিলেই হলো।'

'কিন্তু রিগো? সে তো ছাড়া রয়েছে। যদি আসে?'

'ও আসবে না। যা ভীতু লোক। আশা করছি, ওকেও খুব শীঘ্রি ধরে ফেলতে পারবো। আপনার ভয় নেই।'

'আমরা কি সাহায্য করতে পারি?' কিশোর জিজ্ঞেস করলো।

'জিনিসগুলোর একটা তালিকা করবো,' ভিকটর বললো। 'তোমরা সাহায্য করলে তাড়াতাড়ি হবে।'

'তা করতে পারি।'

'আমিও করবো!' বলে উঠলো পিটার। 'জলদস্যুর লুটের মাল! ঘাঁটতেও ভালো লাগবে আমার!'

পিটারের উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো ভিকটর। 'বেশ, করবে সাহায্য। আমার আপত্তি নেই। বেশি লোক পেলে বরং ভালোই হয়।' তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরলো সে। 'তোমাদেরকে একটা করে পুরস্কার দিতে চাই। নেবে তো?' বলে জবাবের অপেক্ষা না করেই বাক্স থেকে একটা দামী আংটি বের করে দিলো মুসাকে।

দ্বিধা করলো মুসা। এভাবে জিনিস নিতে ভালো লাগে না তার। কিশোরের দিকে তাকালো পরামর্শের আশায়। মাথা ঝাঁকালো কিশোর। আংটিটা নিলো মুসা। রবিন আর কিশোরকেও একটা করে আংটি দিলো ভিকটর।

একুশ

পরদিন সকাল আটটায় লাফিয়ে উঠে বসলো মুসা। কানে আসছে আঁচড়ানোর শব্দ। বিছানায় থেকেই ভালো করে চেয়ে দেখলো, জানালার কাঁচে ঘষা লাগছে একটা ডাল। হেসে আবার শুয়ে পড়লো। ঘুম যায়নি। কিন্তু পরক্ষণেই আবার লাফ দিয়ে উঠলো। তার জানালার কাছে তো কোনো গাছ নেই! বিছানা থেকে নেমে দৌড়ে এলো জানালার ধারে।

বাইরে ধূসর হয়ে আছে সকালটা। বিষণ্ন। কুয়াশার জন্যে সূর্য উঠতে পারেনি। দেখলো, লম্বা একটা লাঠিতে ডালটা বেঁধে জানালার কাঁচে ঘষছে কিশোর। রবিন দাঁড়িয়ে রয়েছে পাশে। বুঝলো, এরকম কেন করছে। তাকে যেতে বলছে। তার আম্মা দেখে যদি কাজ করার জন্যে আবার তাকে আটকে দেন, সে-জন্যে ঘরে ঢোকেনি ওরা। টেলিফোন করারও সাহস পায়নি।

চুলোয় যাক কাজ! নাস্তা খাওয়ারও দরকার নেই বাড়িতে। বাইরে কোনোখানে খেয়ে নিলেই হবে। তাড়াতাড়ি কাপড় পরে জানালা খুললো মুসা। সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে মায়ের চোখে পড়ার ঝুঁকি নিতে চায় না। জানালা গলে বেরিয়ে পাইপ বেয়ে নেমে এলো মাটিতে।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'কিশোর বলছে, ভিকটর ইভানসের কিছু হয়েছে,' রবিন জবাব দিলো।

'খাইছে! কি হয়েছে?'

'সাইকেল বের করে নিয়ে এসো,' কিশোর বললো। 'এখানে দাঁড়িয়ে কথা বললে ধরা পড়বে। চলো, ভাগি।'

হাইওয়েতে ওঠার আগে কথা বললো না কিশোর। তারপর বললো, 'সকালে পিটার ফোন করলো। ভোরে উঠেই নাকি চলে গিয়েছিলো টাওয়ারে, ভিকটরের মালের তালিকা করতে। উত্তেজনায় সারারাত ঘুমায়নি সে। গিয়ে দেখে ভিকটর নেই। বাক্সটাও নেই। তার পর আমিও চেষ্টা করেছি, ফোনের জবাবই দিলো না কেউ টাওয়ার থেকে।'

'পালালো নাকি?'

'না গিয়ে বলতে পারবো না।'

বেগুনী জলদস্যুর আড্ডায় পৌঁছে সাইকেল গেটের বাইরে রাখলো ওরা। পিটার ওদের অপেক্ষাতেই ছিলো। দেখেই দৌড়ে এলো। চারজনে মিলে চলে এলো টাওয়ারে। সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডাকলো কিশোর, 'মিস্টার ইভানস!' 'মিস্টার ইভানস!'

সাড়া এলো না।

এরপর মুসা ডাক দিলো। ঠেলা দিলো দরজায়। পাল্লা ফাঁক হতেই মিয়াও

করে বেরিয়ে এলো কালো বেড়ালটা।

'ভিকটর নেই ভেতরে,' বেড়ালটার দিকে তাকিয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো কিশোর। 'চলো, ঢুকে দেখি।'

সারা টাওয়ারে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাকে পাওয়া গেল না। গুপ্তধনের বাক্সটাও উধাও।

'পালিয়েছে!' পিটার বললো।

'কাল রাতেই সন্দেহ হয়েছিলো আমার,' আনমনে বললো কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো একবার। ভিকটরের স্টাডিতে দাঁড়িয়ে আছে।

মাঝারি আকারের একটা ঘর। চারপাশে সাজানো বুককেসে অসংখ্য বই। ঘরের মাঝখানে বড় একটা কাউচ, বসে আরাম করে পড়ার জন্যে। একপাশের দেয়াল ঘেঁষে একটা লেখার টেবিল। তাতে টেলিফোন আছে। এগিয়ে গেল কিশোর। টেলিফোন সেটটার পাশেই পড়ে আছে একটা প্যাড। তাতে একটা বিচিত্র নকশা। সেটার দিকে দীর্ঘ এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো সে। হঠাৎ বলে উঠলো, 'সী-প্লেন!'

'কি বললে! মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি তোমার!' মুসা কিছু বুঝতে পারছে না।

'এটা কি?' প্যাডে টোকা দিয়ে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'মনে তো হচ্ছে একটা সী-প্লেনের ছবি,' পিটার বললো। 'নামার জন্যে পনটুন খুঁজছে, এরকম আঁকতে পারলে ভালো হতো।'

'ভালো আর্টিস্ট হলে সেটা পারতো। ভিকটর তা নয়।'

'কি বলতে চাইছো?' রবিনও বুঝতে পারছে না কিশোরের কথা।

'আমি শিওর, যাবার আগে টেলিফোন করেছিলো ভিকটর,' কিশোর বুঝিয়ে দিলো। 'লাইন পেতে দেরি হয়েছিলো হয়তো, কিংবা অন্য কোনো কারণ ছিলো। যাই হোক, আঁকার যথেষ্ট সময় পেয়েছে সে।'

'এয়ার ট্যাক্সি সার্ভিস!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। 'ফোন করেছিলো ওখানেই! সে-জন্যেই প্লেনের ছবি।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয় প্লেনে করে পালিয়েছে ভিকটর। পিটার, তোমার আব্বা কোথায়?'

'ঘরেই।'

'জলদি চলো। কুইক!'

এতো সকালে গোয়েন্দাদের দেখে অবাক হলেন ক্যাপ্টেন ফিলিপ। ভিকটরের নিখোঁজ হওয়ার কথা পিটার তাঁকে কিছু বলেনি। নেই দেখেই সোজা কিশোরকে ফোন করেছে।

সব শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি।

'এয়ার ট্যাক্সি সার্ভিস কটায় খোলে?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'আটটা চল্লিশে। কেন?'
'আটটা পঁয়তাল্লিশ বাজে! এখনও হয়তো সময় আছে। জলদি একটা ফোন করুন ওদেরকে। বলুন, ডেঞ্জারাস একটা ক্রিমিন্যাল ওদের প্লেনে করে পালাচ্ছে!'
টেলিফোন বুক খুললেন ক্যাপ্টেন। নম্বর বের করে ফোন করলেন। বললেন, একটা সাংঘাতিক অপরাধী পালাচ্ছে। ভিকটরের চেহারার বর্ণনাও দিলেন।
লোকটা জানালো, হ্যাঁ, ওরকম চেহারার একজন লোক বিমান ভাড়া করেছে। নাম, ভিকটর ইভানস। প্লেনে উঠে পড়েছে।
'জলদি ঠেকান ওকে! থামান!' টেলিফোনেই চেঁচিয়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন। 'পাইলটকে বলুন, যাতে না ওড়ে।'
'দাঁড়ান দেখছি,' জবাব এলো অন্যপাশ থেকে। কিছুক্ষণ পর লোকটা জানালো, জবাব দিচ্ছে না পাইলট। বোধহয় পিস্তল দেখিয়ে মুখ বন্ধ করে রেখেছে ভিকটর।
পুলিসকে ফোন করবে বলে লাইন কেটে দিলো ট্যাক্সি সার্ভিসের কর্মচারি।
একটা বিমানের শব্দ শোনা গেল। ডক থেকে ওড়ার পাঁয়তারা করছে বিমানটা। ট্রেলার থেকে ছুটে বেরোলো তিন গোয়েন্দা আর পিটার। পেছনে বেরোলেন ক্যাপ্টেন ফিলিপ।
ওড়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে ছোট একটা সী-প্লেন।
'আহ্‌হা, দেরি হয়ে গেল!' হতাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়লো কিশোর। 'আর ঠেকানো গেল না ওকে!'
সেদিকে তাকিয়ে থেকে কি ভাবছেন ক্যাপ্টেন। তারপর বলে উঠলেন, 'পারবো! এসো!' বলেই দৌড় দিলেন জেটির দিকে।

বাইশ

ব্ল্যাক ভালচারের হুইল ধরেছেন ক্যাপ্টেন ফিলিপ। এগিয়ে চলেছে জাহাজ। জোর বাতাস উড়িয়ে নিয়ে গেছে পাতলা কুয়াশা। মাস্তুলের ওপরের ক্রো-নেস্টে উঠে বসেছে নোনতা জেসন। ওখান থেকে যা যা দেখবে, চেঁচিয়ে জানাবে ক্যাপ্টেনকে। জাহাজের গলুইয়ের কাছে রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়েছে তিন গোয়েন্দা আর পিটার।
'বিমানটা কোন দিকে গেছে?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
'মেইন চ্যানেল ধরে সোজা চলে যাবে সাগরের দিকে,' পিটার জানালো। 'ওই লাল আর কালো বয়াগুলোর মাঝ দিয়ে। সাগরের দিক থেকে আসা বাতাসকে কাজে লাগাবে।'
ক্রো-নেস্ট থেকে চেঁচিয়ে উঠলো নোনতা জেসন, 'ডক ছেড়েছে, ক্যাপ্টেন! গতি বাড়িয়েছে!'
দূরে দেখা যাচ্ছে সী-প্লেনটা। দমে গেল ছেলেরা। ধরার আশা কম।

'পারবো না।' নিরাশ হয়ে বললো মুসা। 'আমরা যাওয়ার আগেই উড়ে যাবে।'

'পারবো!' রবিন বললো। 'এঞ্জিনের শক্তি বাড়াতে সময় লাগবে।'

'ধরা কঠিন হবে।'

গুঙিয়ে উঠলো কিশোর। 'ধরতে না পারলে আমাদের ওপর দিয়েই উড়ে যাবে, বুড়ো আঙুল দেখিয়ে!'

এঞ্জিনের সমস্ত শক্তি নিংড়ে ছুটেছে জাহাজ। বয়ার লম্বা সারির মুখে চলে গেছে বিমানটা। একমাত্র প্রপেলারটা ঘুরতে আরম্ভ করেছে।

'পাইলটকে দেখতে পাচ্ছি,' কিশোর বললো। 'পাশের লোকটা...ভিকটর, কোনো সন্দেহ নেই...'

প্রতি মুহূর্তে বিমানটার কাছাকাছি চলে যাচ্ছে জাহাজ।

লাল বয়াগুলোর ভেতরে বিমান প্রবেশের মানে হচ্ছে ওড়ার জন্যে অর্ধেক প্রস্তুত ওটা।

লাল বয়ার সারি পেরিয়ে কালোগুলোতে যখন ঢুকলো বিমান, জাহাজ ঢুকে পড়লো চ্যানেলের মধ্যে।

জাহাজে সবাই দম বন্ধ করে ফেলেছে।

পাইলটের শাদা মুখ হাঁ হয়ে গেছে। জানালার কাছে ঝুঁকে রয়েছে ভিকটর, হাতে পিস্তল। জাহাজটা আরো এগিয়ে যেতেই এদিকে সই করে পিস্তল তুললো সে।

'শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো সবাই!' চিৎকার করে বললেন ক্যাপ্টেন।

গুলি করলো ভিকটর...একবার...দু'বার...

একটা মুহূর্তের জন্যে যেন স্তব্ধ হয়ে গেল সময়। কিন্তু জাহাজ থেমে নেই। এগিয়ে যাচ্ছে বিমানটার দিকে, যেন মুখোমুখি ধাক্কা লাগানোর ইচ্ছে।

হঠাৎ শাঁই করে একপাশে ঘুরে গেল বিমান, একটা কালো বয়ায় লেগে ছিঁড়ে গেল একটা ডানা। কাত হয়ে গেল একপাশে।

পানিতে লাফিয়ে পড়েছে পাইলট। সাঁতরে সরে যেতে চায় যতো দ্রুত সম্ভব।

পানি ঢুকছে বিমানে। কাত হয়ে ভাসছে এখন। এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে। ওটার কাছাকাছি এসে গতি কমালো জাহাজ। দড়ি ছুঁড়ে দিলো পিটার। ওটা ধরলো পাইলট।

ভিকটরকে দেখা গেল আরেক দিকে সাঁতরাচ্ছে। দুটো লাইফ বেল্ট বেঁধে নিয়েছে। কালো বাক্সটা ঠেলে নিয়ে সাঁতরাচ্ছে।

দড়ি বেয়ে ডেকে উঠে ধপাস করে গড়িয়ে পড়লো পাইলট। পানি গড়াচ্ছে কাপড় থেকে। কয়েকবার জোরে জোরে দম নিয়ে বললো, 'তোমরা আমার প্রাণ বাঁচালে! ওই পাগলটার কাছে পিস্তল আছে। প্লেন চালাতে বাধ্য করেছে ও আমাকে। ধাক্কা লেগে কাত হয়ে না পড়লে কি হতো জানি না!' জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লেগে বিমান চুরমার হয়ে যাওয়ার কথা কল্পনা করে শিউরে উঠলো সে। 'কে লোকটা? ডাকাত-টাকাত?'

'ডাকাতই,' পানির দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো কিশোর। ভিকটরের দিকে এগোচ্ছে জাহাজ।

এখনও পালানোর চেষ্টা করছে ভিকটর। কিন্তু বাক্সটা বেশি ভারি। ওটা নিয়ে এগোতে পারছে না তেমন। জ্বলন্ত চোখে ফিরে তাকালো একবার জাহাজের দিকে। বুঝলো, বাক্সটা নিয়ে পালানো অসম্ভব। শেষে ওটা ছেড়ে দিয়ে সাঁতরাতে শুরু করলো।

কিন্তু জাহাজের সঙ্গে সাঁতরে আর কতোক্ষণ? হাল তাকে ছাড়তেই হলো। ক্রো-নেস্ট থেকে নেমে এসেছে নোনতা জেসন। পানিতে ঝাঁপ দিতে তৈরি হচ্ছে। তার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়লো মুসা। তারপর জেসন। শেষে একে একে রবিন, পিটার আর পাইলট। সবাই মিলে ধরে ফেললো ভিকটরকে।

দড়ি নামিয়ে দেয়া হলো। তাতে বাক্সটা বেঁধে দিলো মুসা। কিশোর আর ক্যাপ্টেন মিলে টেনে তুললেন ওটা ডেকে।

ভিকটরকেও তোলা হলো।

'দেখাবো, মজা দেখাবো সব ক'টাকে!' নিষ্ফল হুমকি দেয়া শুরু করলো সে।

পাত্তাই দিলো না তাকে কেউ। তবে চারপাশ থেকে ঘিরে রাখলো, যাতে আবার গিয়ে পানিতে পড়তে না পারে।

জাহাজের মুখ ঘোরালেন ক্যাপ্টেন। বললেন, 'কিশোর, বলে ফেলো তো এবার সব। এই ভিকটর লোকটা আসলে কে?'

'আমার ধারণা, চোর,' গম্ভীর হয়ে বললো কিশোর। 'মেজর নিরেকের দলের লোক।'

'কি করে বুঝলে?' পিটার অবাক।

'গুপ্তধনগুলো জলদস্যুদের লুটের মাল নয়। আধুনিক চোরের চোরাই মাল।'

'কি বলছো?' বিশ্বাস করতে পারছেন না ক্যাপ্টেন।

'ঠিকই বলছি। একটা ব্যাপার প্রথমে বুঝতে পারছিলাম না, আপনাকে আর পিটারকে সরিয়ে দেয়ার পরেও চব্বিশ ঘন্টা কেন আড্ডার ওপর নজর রাখছিলো মেজরের লোক। এখন জানি। ভিকটরের ওপর নজর রাখা হচ্ছিলো।'

'ভিকটর!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। 'ভিকটরকে পাহারা দিচ্ছিলো?'

'হ্যাঁ, তাই। তবে ভিকটর আমাদেরকে মালগুলো দেখানোর আগে পর্যন্ত সেটা বুঝতে পারিনি।'

'পরে কি করে বুঝলে?' জানতে চাইলো মুসা।

'খুব সহজ। বাক্সটা দেখেই বুঝে ফেলেছি। ওটার ওপরে তামা দিয়ে লেখা রয়েছে নাম। অনেক পুরনো হলে ময়লা হয়ে যায় তামা, রঙ বদলে যায়, সবুজ দাগ পড়ে। অথচ এটা একেবারে নতুন, চকচক করছে। আর বাক্সটাও তৈরি হয়েছে প্লাইউড দিয়ে, আগের দিনের মতো ভারি কাঠ নয়। তার ওপর রঙ করেছে। বেশি কাঁচা কাজ করে বসেছে ভিকটর।'

'বাক্সটা নতুন বলেই যে মালও নতুন, তা কি করে বুঝলে?' ক্যাপ্টেনের প্রশ্ন। 'নতুন বাক্সে কি পুরনো মাল রাখা যায় না?'

'যায়। তবে এক্ষেত্রে তা করা হয়নি। আমাকে একটা আঙটি দিয়েছিলো ভিকটর। সেটা আমি জুয়েলারির দোকানে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছি। নতুন। মাত্র কয়েক বছর আগে বানানো হয়েছে। তাতেই বুঝলাম, ভেতরের সব মালই নতুন। জলদস্যুর গুপ্তধন নয়।'

'কিন্তু কিশোর,' রবিন বললো, 'যদি ওরা জানেই ওগুলো গুপ্তধন নয়, তাহলে…'

'হ্যাঁ, রবিন,' মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললো কিশোর, 'ঠিকই ধরেছো। কেন তাহলে বিনা প্রতিবাদে জেলে চলে গেল চোরের দল? পুলিসকে কিছুই বললো না? এই তো? কেন ভিকটরকে মাল নিয়ে পালাতে দিলো, এটাও নিশ্চয় তোমার প্রশ্ন। সহজ জবাব, চোরাই মাল। পুলিশে জেনে গেলেই সব খোয়াতে হতো। তাই চুপ করে গিয়েছিলো মেজর। আর তখনই পুরো সত্যটা বুঝে গেছি আমি।'

ভিকটরের হাত দড়ি দিয়ে বাঁধা। সেই অবস্থায়ই ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল কিশোরের ওপর। তাকে যখন আটকে ফেলা হলো, গালাগাল করতে লাগলো। চেঁচিয়ে বললো, 'বিশ্বাস করো না ওর কথা! ওটা একটা মিথ্যুক! সব বানিয়ে বলছে!'

কেউ কান দিলো না তার কথায়।

'সত্যটা কি, কিশোর?' জিজ্ঞেস করলো পিটার।

'মেজর নিরেক আর তার চেলারা জানে যে মালগুলো চোরাই। কারণ ওরাই চুরি করে জমিয়েছে ওগুলো। ভিকটরও জানে। কারণ সে-ও একই দলের লোক। মাল নিয়ে পালিয়েছিলো ভিকটর, সেগুলো খুঁজতেই এসেছে মেজর আর তার চেলারা। আবার না ওগুলো বের করে নিয়ে ভিকটর পালিয়ে যায়, সেজন্যই দিন-রাত তার ওপর চোখ রাখা হতো। আসলে, সমস্ত মাল হাতিয়ে নিয়ে টাওয়ারে এসে লুকিয়েছিলো সে। তার জানা ছিলো, লুকানোর চমৎকার জায়গা ওটা।'

তীরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারকে। দলবল নিয়ে পৌঁছে গেছেন তিনি।

সেদিকে তাকিয়ে আরেকবার নিষ্ফল আক্রোশে ফুঁসে উঠলো ভিকটর। চোখ পাকিয়ে কিশোরকে বললো, 'তোমাকে…তোমাকে দেখে নেবো আমি…'

কয়েক দিন পর। বিখ্যাত চিত্র পরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে এসেছে তিন গোয়েন্দা, বেগুনী জলদস্যুর কেসের রিপোর্ট নিয়ে।

মন দিয়ে ফাইলটা পড়লেন পরিচালক। তারপর মুখ তুললেন। 'বুঝলাম। র একটা কথা এখানে লেখোনি। কি দেখছিলো সেদিন মেজর? নকশা?'

'ম্যাপ, স্যার,' জবাব দিলো কিশোর। 'পাইরেটস কোভের। ওতে অবশ্য

সুড়ঙ্গটা দেখানো নেই।'

'কিন্তু রিপোর্টে বলেছো, জানা না থাকলে ওই সুড়ঙ্গ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। মেজর নিরেক কি করে পেলো?'

হাসলো কিশোর। 'কয়েক বছর আগে একথা ভিকটরই জানিয়েছিলো মেজরকে। পুলিসের ভয়ে পালিয়ে আত্ম-গোপন করে আছে তখন ওরা। ভিকটর অবশ্য তখনও জানতো না, সুড়ঙ্গটা ঠিক কোথায় আছে। গল্প করতে করতে এমনি বলেছিলো আরকি মেজরকে, পূর্বপুরুষের কাহিনী বলতে গিয়ে। তারপর একদিন মাল হাতিয়ে নিয়ে পালালো ভিকটর। মেজর জানতো না, টাওয়ারটা কোথায়। তবে খুঁজে খুঁজে বের করে ফেললো। অনেক দিন লেগেছে খুঁজে বের করতে। এসে দেখলো, সত্যি, টাওয়ারেই এসে উঠেছে ভিকটর। বুঝতে অসুবিধে হলো না, মালগুলো টাওয়ারেই লুকিয়েছে ভিকটর। তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলো না মেজর। কারণ তাহলে অন্য জায়গায় মাল সরিয়ে ফেলতে পারে। বোটহাউসে ঢুকে বের করলো সুড়ঙ্গমুখ। মাটি কেটে সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে টাওয়ারে ঢোকার পথ করে নিলো।'

'তারপর?'

'ওরা মালগুলো পাওয়ার আগেই টের পেয়ে গেল ভিকটর,' জবাব দিলো এবার রবিন। 'সতর্ক হয়ে গেল। শেষে মাল নেয়ার জন্যে শেষবার যখন ঢুকলো মেজর আর নিরেক, তখন জেসন আর কিশোরকে নিয়ে তৈরি হয়ে আছে সে, বাধা দেয়ার জন্যে।'

'মেজর আর রিগোকে ঠেকালো বটে ভিকটর,' রবিনের কথার খেই ধরলো কিশোর, 'কিন্তু আমরা তখন জেনে গেছি। বুঝলো, শেষ রক্ষা করতে হলে একটাই উপায়, পুলিসের হাতে ধরা দেয়া। ভিকটরকে মালগুলো নিয়ে পালাতে দেয়া। তাহলে শেষমেষ ভাগ একটা পাবার আশা আছে। সেরকমই চুক্তি হয়েছে ওদের মধ্যে, স্টোররুমে।'

'ওই চুক্তির কোনো অর্থ নেই,' মাথা নাড়লেন পরিচালক। 'ভিকটরকে বিশ্বাস করা যায় না।'

'না, তা যায় না,' এতোক্ষণে মুখ খুললো মুসা। 'তবে এছাড়া আর কিছু করারও ছিলো না ওদের। ভিকটর নিয়ে পালালে পাওয়ার কিছুটা অন্তত আশা আছে। কিন্তু পুলিসের হাতে পড়লে একেবারেই নেই। তাই ওই বুদ্ধি করেছিলো।'

'হুঁ।' একমুহূর্ত চুপ করে রইলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'তাহলে বেগুনী জলদস্যুর গুপ্তধন আসলেই নেই?'

'আপাতত তো পেলাম না,' মুচকি হাসলো কিশোর। 'তবে তদন্ত আমী চালিয়ে যাবো ভাবছি। বলা যায় না, কিছু বেরিয়েও যেতে পারে।'

—ঃ শেষ ঃ—